অনীশ দেব



# প্রতিঘাত

# প্রতিঘাত

সম্পূর্ণ

অনীশ দেব

# প্রতিঘাত

সম্পূর্ণ



পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

**প্রথম প্রকাশ** নভেম্বর ২০১৯
**দ্বিতীয় মুদ্রণ** মার্চ ২০২০

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

**প্রচ্ছদ ও অলংকরণ** রঞ্জন দত্ত
**নামাঙ্কন** অনীশ দেব



PROTIGHAT SOMPURNO
*by* Anish Deb
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700009
Phones +91-33-22411175, 9433075550, 9830806799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-591-8

সুহৃদ
নুরজামান শাহ
প্রীতিভাজনেষু

## লেখকের অন্যান্য বই

ডট কম রহস্য
আগুন রঙের বুলেট
ভূতনাথের ডায়েরি
অনীশের সেরা ১০১
অশরীরী ভয়ংকর
ভয়পাতাল
দুঃখী রাজকুমার
দেখা যায় না, শোনা যায়
ভৌতিক অলৌকিক
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র
পাই নিয়ে রূপকথা
রোমাঞ্চকর ধূমকেতু
সহজ কথায় রোবট
সহজ কথায় ইন্টারনেট
সহজ কথায় টেলিভিশন
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
বিজ্ঞানের হরেকরকম
বারোটি রহস্য উপন্যাস
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
বিশ্বের সেরা ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প

# এক মিনিট, আপনাকে বলছি

'প্রতিঘাত' উপন্যাসের প্রথম পর্ব 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার ২০১৬ সালের পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্ব প্রকাশিত হওয়ার কারণ লেখাটি আমি শেষ করতে পারিনি। এরকম 'দুর্ঘটনা' আগেও কয়েকবার ঘটেছে—এবং এই 'কিশোর ভারতী' পত্রিকাতেই। এর জন্য দায়ী আমি। কারণ, গল্প বা উপন্যাসের প্লট আমার মাথায় আসে দেরিতে এবং আমার লেখার গতির এমনই হাল যে, তাকে গতি না বলে 'দুর্গতি' বললেই ভালো মানায়।

এই আংশিক উপন্যাস প্রকাশের ব্যাপারে 'কিশোর ভারতী'-র সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় যে-দুঃসাহস দেখিয়েছেন তার কোনও তুলনা হয় না। তাঁকে সেলাম জানাই। সেইসঙ্গে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতাও। বারবার এভাবে লেখা প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য।

২০১৬-তে প্রথম পর্ব প্রকাশের পর ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে 'কিশোর ভারতী'-র পাতায় 'প্রতিঘাত'-এর বাকি অংশের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়। ২৮টি কিস্তিতে লেখাটি শেষ হয় ২০১৯ সালের, মানে এবছরের, সেপ্টেম্বর মাসে। বই প্রকাশের সময় উপন্যাসটির নামকরণ করা হয় 'প্রতিঘাত সম্পূর্ণ'—এটা বোঝানোর জন্য যে বইটি 'প্রতিঘাত' উপন্যাসের আংশিক প্রথম খণ্ড নয়, সম্পূর্ণ উপন্যাসটিই বই হয়ে বেরিয়েছে। এবং বই হয়ে বেরোনোর আগে আমি সাধ্যমতো ঘষামাজা করেছি।

'প্রতিঘাত সম্পূর্ণ' এখন আপনার হাতে। পাঠক হিসেবে আপনার বিচারই হল শেষ বিচার। সেই বিচারের অপেক্ষায় রইলাম। ইতি—

অনীশ দেব

৭ অক্টোবর, ২০১৯
ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি
কলকাতা ৭০০১২৬

## লেখকের সম্পাদিত বই

রক্ত ফোঁটা ফোঁটা
সেরা ১০১ ভৌতিক অলৌকিক
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ২
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ৩
রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প

ধুলো উড়িয়ে বাসটা একটা স্টপেজে এসে দাঁড়াল। বিকেলটা তখন মসৃণভাবে সন্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কন্ডাক্টর জোরে-জোরে দুবার হাঁক দিল, 'বটতলা। বটতলা!'

কত যে 'বটতলা' আছে এ-রাজ্যে! গ্রাম, টাউন, শহর—কোথাও 'বটতলা'-র কমতি নেই। রোশন ভাবল।

একটানা ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আসার পর এই মিনিট-কুড়ি-পঁচিশ আগে ও একটা বসার জায়গা পেয়েছে। বলতে গেলে সেই হাওড়া থেকেই বাসে ঠাসা ভিড়—সবসময় যেমনটা হয়।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রোশনের খারাপ লাগল না। গাছপালা, দূরের ছোট-ছোট দু-চারটে ঘরবাড়ি আর বিস্তীর্ণ চাষের জমিতে কেমন একটা প্রশান্তি ছেয়ে আছে।

'এই জায়গাটার নাম কী, কাকু?' পাশে বসা রোগামতন প্রৌঢ় মানুষটিকে জিগ্যেস করল রোশন।

ভদ্রলোক বোধহয় লজেন্স চুষছিলেন, কারণ ওঁর ডানদিকের গালটা ফুলে ছিল। অবশ্য মাড়ির সমস্যাও হতে পারে।

রোশনের প্রশ্নে গালফোলাটা কমে গেল। মানে, মাড়ি নয়—লজেন্স।

তারপর জবাব দিলেন, 'আহাউর।'

রোশন একটু ঘাবড়ে গেল। এরকম নাম আবার হয় না কি! ও অবাক চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী বললেন?'

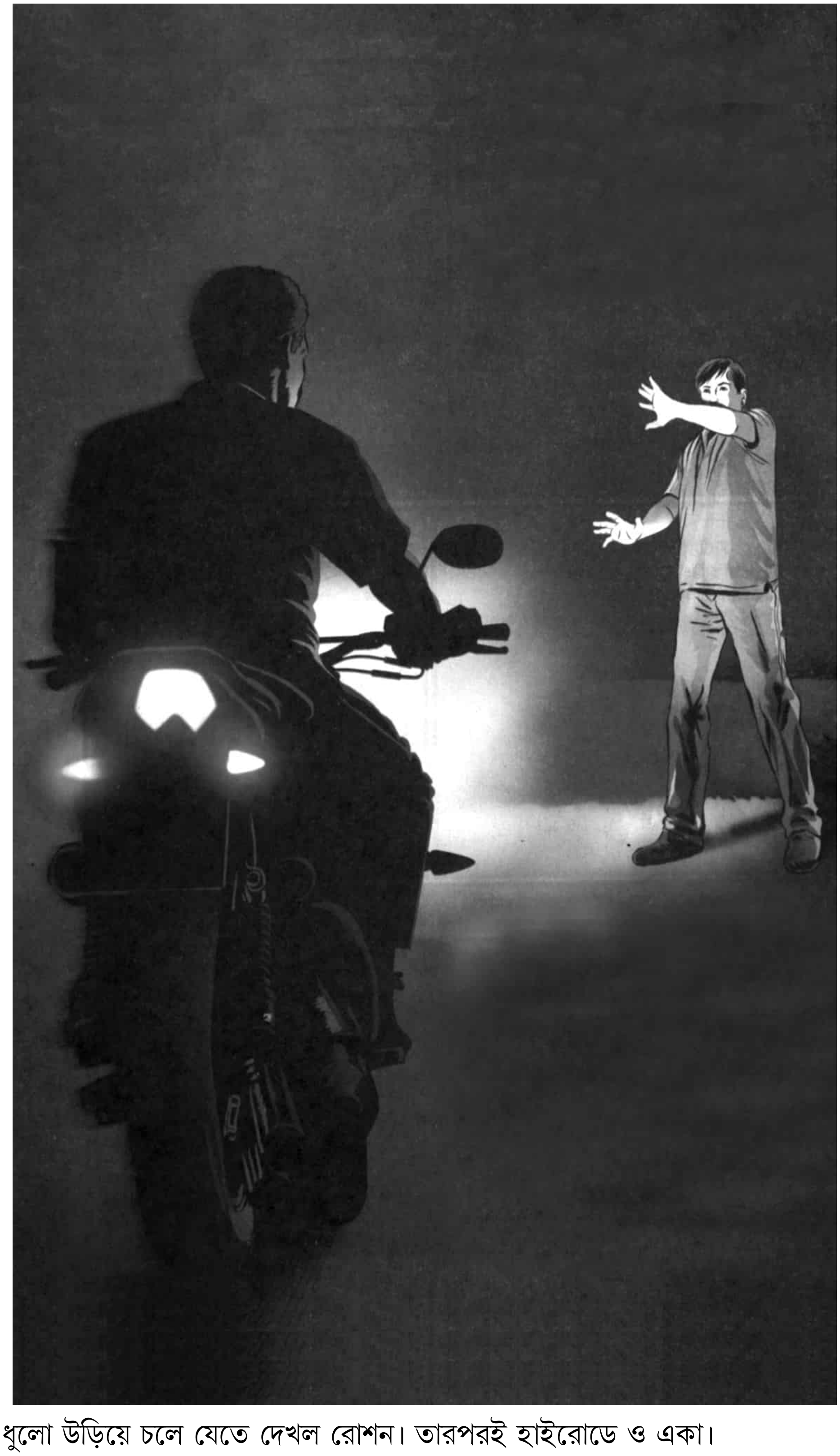
প্রৌঢ় লজেন্সটাকে মুখে নাড়াচাড়া দিয়ে সাইড করলেন। তারপর বললেন, 'বললাম তো, আশাপুর—।'

আশাপুর! নামটার মধ্যে কেমন যেন একটা টান আছে।

কোলে রাখা কালো রঙের ব্যাকপ্যাকটা হাতে নিয়ে সিট ছেড়ে উঠে পড়ল রোশন। ভিড় ঠেলে এগোতে-এগোতে চেঁচিয়ে বলল, 'বেঁধে! বেঁধে! কন্ডাক্টরভাই, নামব। বটতলায় নামব...।'

বাসের চাকা গড়াতে শুরু করেও আবার থমকে দাঁড়াল। অধৈর্য ড্রাইভার দুবার 'প্যাঁ—প্যাঁ—' করে হর্ন বাজাল।

দরজার কাছাকাছি এসে বাড়তি ভিড় ঠেলেঠুলে অবশেষে রোশন নামতে পারল। ওর গায়ে তখন বিচিত্র ঘামের গন্ধ। কারণ, ওর নিজের ঘামের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে অন্যান্য মানুষের ঘামের গন্ধ।



বাসটাকে ধুলো উড়িয়ে চলে যেতে দেখল রোশন। তারপরই হাইরোডে ও একা। এবার চোখ মেলে আশাপুরকে দেখল।

সামনে সবুজ ধানখেত। তার মধ্যে কয়েকটা বড়-বড় গাছ ডালপালা শূন্যে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে তাকালে চোখে পড়ছে রংচঙে আকাশ। সেই রঙিন পটভূমিতে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আশাপুরে রোশনের দেখা প্রথম সূর্যাস্ত।

সূর্য যখন অস্ত যায় তখন রোশনের মনে ভয় হয়—যদি পরদিন না ওঠে! কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে কোনও হেরফের হয় না। সূর্য ঠিক সময়মতো উঠে পড়ে পরদিন।

অথচ মানুষ? মানুষ যখন বিছানায় অস্ত যায় তখন? পরদিন কি সে নিয়ম করে আবার উঠে বসে বিছানায়? মোটেই না।

মায়ের কথা মনে পড়ল রোশনের। মা বড় করুণভাবে অস্ত গিয়েছিল। তখন রোশন মায়ের পাশে থাকতে পারেনি। অথচ রোশন ছাড়া মায়ের আর কোনও কাছের মানুষ ছিল না।

রোশন মায়ের পাশে থাকতে পারেনি, কারণ, রোশন তখন জেলে বন্দি ছিল। বিনা দোষে।

মায়ের কথা মনে পড়তেই চারপাশে এক অদ্ভুত শূন্যতা টের পেল। এবং সেই শূন্যতার সঙ্গে একটা ভয়। একা হয়ে যাওয়ার অচেনা ভয়। সেই অচেনা ভয় শীতের চাদরের মতো ওকে আদর করে জড়িয়ে ধরে। যেন সে কোনও পরম বন্ধু, কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

রোশন চুপচাপ দাঁড়িয়ে সূর্যের মৃত্যু দেখল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুকের ভেতর থেকে।

বেলাশেষের আলোয় ও দেখল, ধানখেতের দূরের সীমানায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু গাছপালা। তার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে কয়েকটা ছোট-বড় ঘর। সেগুলো পেরিয়ে দু-চারটে পাকাবাড়ি। সেইসব বাড়ির মাথায় ডিশ অ্যান্টেনা দেখা যাচ্ছে।

হাইরোড দিয়ে কয়েকটা লরি, ট্রাক আর প্রাইভেট কার ছুটে গেল। রোশন সেগুলোকে যেন দেখেও দেখতে পেল না।

'যেদিকে দু-চোখ যায়' এ-কথা ভেবেই কলকাতা ছেড়েছিল ও। কারণ, ও ভুলতে চেয়েছে মায়ের শোক আর জেলের জঘন্য এপিসোড। এখন দেখা যাক, আশাপুর ওর মন ভোলাতে পারে কি না। না হলে কাল সকালে আবার 'যেদিকে দু-চোখ যায়'।

বটতলা বাস স্টপেজে সত্যি-সত্যিই বটগাছ রয়েছে। তাও আবার একটা নয়, দুটো। একটা রোশন রাস্তার যেদিকে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে, আর-একটা উলটোদিকে—কিছুটা বাঁ-দিকে সরে গিয়ে।

সেই বটগাছটার গা ঘেঁষে একটা চায়ের দোকান—চাটাই আর বাঁশের খুঁটি দিয়ে তৈরি।

রোশন দু-দিকে একবার করে দেখে নিয়ে হাইরোড পার হল। তারপর পায়ে-পায়ে এগোল চায়ের দোকানের দিকে।

দোকানের তিন-চার হাতের মধ্যেই একটা ঢালু পিচ রাস্তা ঢুকে গেছে আশাপুরের দিকে। রাস্তাটার বাঁ-দিক ঘেঁষে পরপর তিনটে পাকা দোকানঘর। প্রথমটা টায়ারের দোকান। দোকানের বাইরে পুরোনো টায়ারের ডাঁই—বাসের টায়ার আর সাইকেলের টায়ার। তার পাশে টায়ার সারানোর সরঞ্জাম।

টায়ারের দোকানের পাশের দুটো দোকান এখন বন্ধ। তবে সাইনবোর্ড দেখে বোঝা যায়, একটা সেলুন, আর একটা মোবিল, গিয়ার অয়েল ইত্যাদি বিক্রির দোকান।

রোশন চায়ের দোকানের বেঞ্চে গিয়ে বসল। ব্যাকপ্যাকটা পিঠ থেকে খুলে পাশে রাখল। এক গ্লাস চা আর দুটো বিস্কুট চাইল।

অন্য আর-একটা বেঞ্চে আরও দুজন খদ্দের বসে ছিলেন। তাঁদের হাতে চায়ের গ্লাস—মাঝে-মাঝে চুমুক দিচ্ছেন। দেখে বোঝা যায়, লোকাল লোক। দোকানি ভদ্রলোক তাঁদের সঙ্গে টুকটাক কথা বলছিলেন।

রোশন বেঞ্চে বসতেই দোকানি ওর দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। রোশন চা-বিস্কুটের অর্ডার দিতে তিনি বললেন, 'এখনই দিচ্ছি।' তারপর দু-চার সেকেন্ড সময় নিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কোত্থেকে? কলকাতা থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ—।' রোশন জানে, ওর পোশাক-আশাক আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে শহুরে ছাপ স্পষ্ট।

ও দোকান আর দোকানিকে খুঁটিয়ে দেখছিল।

দোকান এবং দোকানি দুজনেরই বয়েস হয়েছে। ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় দোকানের চাটাইয়ের দেওয়াল, সিলিং সব কালো হয়ে গেছে। নানান কোণে ঝুল জমেছে। দোকানের ভেতরে-বাইরে খদ্দেরদের জন্য কয়েকটা বেঞ্চ পাতা রয়েছে। এ ছাড়া দোকানের ভেতরে ছোট মাপের দুটো খাটো টেবিল। একটা লাট খাওয়া খবরের কাগজ দুটো টেবিলে তিন-চারভাগে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

দোকানের বাইরের দিকে পাতা উনুন। উনুন থেকে খানিকটা দূরে চাটাইয়ের দেওয়ালে দুটো কাঠের তাক। সেখানে বিস্কুটের বোয়েম সাজানো। আর তার নীচের তাকে অল্পবিস্তর সিগারেট, বিড়ি আর দেশলাইয়ের আয়োজন।

দোকানির মাথায় টাক, রোগা চেহারা, গালে খোঁচা-খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি, গায়ের রং তামাটে। চোখে চশমা। পোশাক রঙিন চেক লুঙ্গি আর হাতাওয়ালা গেঞ্জি। গেঞ্জির বগলের কাছে বেশ কয়েকটা ছোট-বড় ফুটো।

দোকানি দুটো বিস্কুট রোশনের হাতে দিলেন। তারপর চায়ের গ্লাসে চিনি দিয়ে চামচ নাড়তে-নাড়তে জিগ্যেস করলেন, 'তা এই আশাপুরে কী জন্যে? কোনও কাজে এলেন?'

এ-প্রশ্নটা যে ওকে কেউ না কেউ করবেই এটা রোশন জানত। তাই উত্তর ভাবাই ছিল মনে-মনে। ও জানে যে, ও যদি বলে, বাসের জানলা দিয়ে জায়গাটা দেখে ওর ভালো লেগে গেছে, তাই ও আশাপুরে নেমে পড়েছে, তা হলে কেউই ওর কথা বিশ্বাস করবে না। বরং ওকে সন্দেহের চোখে দেখবে।

আসলে জায়গাটার নাম হতাশাপুর হলেও রোশন নেমে পড়ত। জায়গাটা চোখে ধরেছে বলে।

'হ্যাঁ—একটা কাজ নিয়েই এসেছি। আমি ''সুপ্রভাত'' খবরের কাগজের রিপোর্টার।' কথা বলতে-বলতে হাত বাড়িয়ে চায়ের গ্লাসটা নিল : 'পশ্চিমবঙ্গের বারোটা জায়গা আমি বেছে নিয়েছি। সেইসব জায়গায় বিখ্যাত যেসব জিনিস আছে—মানে, স্পেশাল যেসব জিনিস আছে—সেগুলো নিয়ে আমি একটা লেখা তৈরি করছি। সামনের মাস থেকে ওটা প্রতি সপ্তাহে ধারাবাহিকভাবে বেরোবে।' চায়ে দুবার চুমুক দিয়ে 'আ—আঃ!' করে আরামের শব্দ করল। তারপর বলল, 'কাকু, চা-টা হেবি হয়েছে। আচ্ছা, আপনার দোকানে কি ''সুপ্রভাত'' কাগজ রাখেন?'

'না, রাখি না।'

উত্তরটা রোশন জানত, কারণ, টেবিলে পড়ে থাকা কাগজের নামটা ও আগেই লক্ষ করেছে।

রোশন যখন কথা বলছিল তখন বাকি দুজন খদ্দের ওর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিল। ও বিস্কুটে কামড় দিল, চায়ে চুমুক দিল কয়েকবার। তারপর দোকানদারকে জিগ্যেস করল, 'এখানে স্পেশাল সেরকম কিছু আছে নাকি?'

দোকানদার ভদ্রলোক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই একজন খদ্দের বলে উঠলেন, 'আশাপুরে বিখ্যাত কালীমন্দির আছে—জগন্ময়ী কালীমন্দির। একশো উনত্রিশ বছরের পুরোনো।'

রোশন ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। মুখে-চোখে সাংবাদিকের আগ্রহ ফুটিয়ে তুলে বলল, 'তাই নাকি? একশো উনত্রিশ বছরের পুরোনো! এটার খবর তো কেউ জানেই না! অন্তত আমি তো কখনও শুনিনি! এটার কথা তো লিখতেই হবে! কীভাবে ওই মন্দিরে যেতে হয় একটু বলুন না...।'

তখন খদ্দের দুজন ভাগাভাগি করে মন্দিরের পথের হদিশ বলতে লাগল।

ব্যাকপ্যাকের চেন খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল রোশন। একটা প্যাড আর পেন বের করে নিল। এবং চায়ের গ্লাস বেঞ্চে নামিয়ে রেখে জগন্ময়ী কালীমন্দিরের ডিরেকশন নোট করে নিতে লাগল।

আলো ক্রমে কমে আসছিল। দোকানদার সুইচ টিপে দোকানের আলো জ্বেলে দিল। দুটো সাধারণ বালব। তবে এইটুকু দোকানের পক্ষে যথেষ্ট।

দোকানদার ধূপকাঠি জ্বেলে ঠাকুরের আসনের সামনে কয়েকবার ঘুরিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে চাটাইয়ের দেওয়ালে গুঁজে দিল।

একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল আকাশপথে। বেঞ্চে বসেই প্লেনের রঙিন আলোগুলো দেখতে পেল রোশন। আকাশের দিকে তাকিয়ে ও ভাবতে লাগল। এখন ও কী করবে? মন্দিরের ডিরেকশন লিখে নেওয়ার কাজ শেষ। অর্থাৎ, সাংবাদিকের অভিনয়ের পালা আপাতত শেষ। এবার হোটেল-ফোটেলের খোঁজ করা দরকার। কারণ, রাতটা তো কাটাতে হবে! শুধু একটা রাত নয়, হয়তো পরপর বেশ কয়েকটা রাত। অন্তত যতদিন আশাপুরে ওর থাকতে ভালো লাগে, যতদিন মন টিকে যায় এখানে।

চারপাশে ছাই রঙের অন্ধকার। হাইরোড ধরে যেসব গাড়ি এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করছে তাদের হেডলাইটের আলোর পিছনে ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। মাঝে-মাঝে দু-একটা সাইকেল, গাড়ি, মোটরবাইক অথবা সাইকেল-রিকশা চায়ের দোকানের পাশের রাস্তাটা দিয়ে আশাপুরের দিকে চলে যাচ্ছে, কিংবা বেরিয়ে আসছে হাইরোডের দিকে। আর থেকে-থেকে নানারকম হর্নের শব্দ।

রোশন চায়ের দোকানির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের আশাপুর বেশ ব্যস্ত জায়গা দেখছি—।'

দোকানদার ভদ্রলোক কখন যেন একটা টুলের ওপর বসে পড়েছিলেন এবং একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেলেছিলেন। বিড়িতে আয়েস করে একজোড়া টান দিয়ে 'খকখক' করে কয়েকবার কাশলেন। তারপর বললেন, 'আশাপুরকে আপনি কি গ্রাম-টাম ভাবলেন নাকি? এটা টাউনের চেয়েও বেশি কিছু। এখানে অনেক ঘরে ছোট-ছোট লেদ কারখানা আছে। একটা সুতোকল আছে। জলের ট্যাঙ্কি তৈরির ফ্যাক্টরি আছে। আরও ছোট-ছোট কত কিছু!'

'তা হলে তো ছোট-বড় গোলমালও লেগে আছে...।'

'আছে—তাতে কী! আমরা বেশ আছি...।' কথাটা শেষ করেই দোকানি কেমন যেন একটা ইশারা করলেন রোশনকে। একটা চোখও টিপলেন—তবে খদ্দের দুজনকে আড়াল করে। দুবার কেশে নিয়ে বললেন, 'আপনি তো হালকা মনে ঘুরতে বেরিয়েছেন—তেমন কোনও তাড়া নেই। তা আরও এক-দু-কাপ চা-টা খান—আপনাকে আরও অনেক গল্প শোনাব...।'

রোশন আর-এক গ্লাস চায়ের অর্ডার দিল। মনে-মনে ভাবল, এই দোকানদার ভদ্রলোকের কাছ থেকেই না হয় থাকার হোটেলের হদিশ জেনে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া এই ভদ্রলোক রোশনকে আরও অনেক গল্প শোনাতে চান। রোশন সেসব গল্প শোনার জন্য তৈরি। ও এখন এলোমেলো ভবঘুরে—তাই এলোমেলো গল্প শোনাটাই ওর জীবন। যে-জীবনটার এখন কারও কাছে কোনও মূল্য নেই। এমনকী ওর নিজের কাছেও।

আরে, কী সুন্দর একটা চাঁদ উঠেছে!

হঠাৎই আকাশের দিকে নজর চলে গেছে রোশনের। সেখানে একটা ফাটাফাটি আধখানা চাঁদ। আধখানা, তাও কী সুন্দর! তা হলে অর্ধেক জীবনও তো একটা সুন্দর জীবন হতে পারে।

রোশন কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

দোকানদার 'কাকু'-র কথা কানে আসতেই ও আবার চায়ের দোকানে ফিরে এল।

খদ্দের দুজন তখন বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। একজন বাঁ-হাতে বাঁধা ঘড়ি দেখল। তারপর অপরজনকে বলল, 'না, ভাই, চলো—উঠি। আরও বসলে দেরি হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, সাতটা পেরিয়ে গেলে রতনমোহনকে আর পাওয়া যাবে নাকো...।'

ওরা দুজন চলে গেল।

এবার দোকানদার ভদ্রলোক টুল ছেড়ে রোশনের কাছাকাছি এসে বসলেন। হাতের বিড়িতে শেষ কয়েকটা মরণ টান দিয়ে বললেন, 'তখন লোকজন ছিল বলে বলতে পারিনি। মানে...।' ভদ্রলোক ইতস্তত করতে লাগলেন। কয়েকবার মাথাও চুলকোলেন। বিড়ির ছোট হয়ে যাওয়া টুকরোটা হাইরোডের দিকে ছুড়ে ফেললেন।

রোশনের কপালে ভাঁজ পড়ল। ভদ্রলোক কি টাকা-ফাকা ধার চাইবেন নাকি? এরকম দোনামনা করছেন কেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, 'কী বলবেন, কাকু, বলুন না...।'

'জগন্ময়ী কালীমন্দির ছাড়াও আমাদের এই আশাপুরে দেখবার মতো আরও একটা জিনিস আছে। মানে, বেশ অদ্ভুত টাইপের জিনিস। আর কোথাও এরকম হয়-টয় বলে মনে-টনে হয় না...।'

'কী জিনিস?' রোশনের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'লড়াই।' চাপা গলায় দোকানকাকু বললেন, 'এরকম লড়াই আপনি আগে কখনও দেখেননি। ব্যাপারটা নিয়ে খুব চাপাচাপি। এটার কথা সবাই জানে, তবে কেউ নাম মুখে নেয় না। দারুণ খেলা। লড়াইয়ের খেলা। বাজি ধরে লড়াই। মানে, লড়াইয়ের বাজি...।'

'কোথায় হয় সেটা?' কৌতূহল ফুটে উঠল রোশনের গলায়। বাজি ধরে লড়াই তো অনেক জায়গাতেই হয়! সেটাকে অদ্ভুত টাইপের বলার তো কোনও মানে হয় না!

দোকানদার ভদ্রলোক সতর্ক নজরে এদিক-ওদিক একবার দেখে নিলেন। তারপর একইরকম চাপা গলায় বললেন, 'আপনি রিপোর্টার—তাই বলছি...। তবে দেখবেন, আমার নাম কোথাও যেন ফাঁস না হয়...।'

রোশন আশ্বাস দিল যে, ভদ্রলোকের নাম কোথাও ও জড়াবে না। কারণ, এটাই রিপোর্টারদের নীতি : খবরের সোর্সের নাম-ধাম কখনও তারা ফাঁস করে না। তা ছাড়া রোশন ওই জগন্ময়ী কালীমন্দির ছাড়া আশাপুরের আর কোনও ব্যাপার নিয়ে 'সুপ্রভাত'-এ লিখবে না।

তখন দোকানদার ভদ্রলোক ওকে 'অকুস্থল'-এর হদিশ দিলেন।

মেন রোড দিয়ে ঢুকে খানিকটা পথ গেলে বাঁ-দিকে একটা পিচরাস্তা পাওয়া যাবে। ভীষণ আঁকাবাঁকা রাস্তা। তবে কলাবতী নদীর কথা বললে সবাই পথ দেখিয়ে দেবে। কারণ, আশাপুরের গা ঘেঁষেই বয়ে চলেছে কলাবতী নদী। সেখানে নৌকো চলে, জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরে। তো লড়াইয়ের জায়গাটা হচ্ছে ওই কলাবতী নদীর ধারে—একটা মেগা সাইজের টিনের চালার ভেতরে। বাইরে থেকে মাঝে-মাঝে চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যায়।

'প্রতি শনিবার রাতে লড়াইয়ের আসর বসে। যারা লড়াই দেখতে ভেতরে ঢোকে তাদের জন্যে বিশ টাকা করে টিকিট। আর যারা লড়াইয়ে নাম লেখায় তাদের কোনও পয়সা লাগে না—ফ্রি।' কথাগুলো বলতে-বলতে দোকানদার 'কাকু'-র চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গেল। তারপরই তিনি দু-চোখ সরু করে গলা নামিয়ে বললেন, 'ভাই, আজ তো শনিবার—যদি রাতে সময় থাকে তো দেখে আসুন! একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবেন—।'

রোশনের মনে হল, এরকম একটা জিনিস না দেখলে ও মিস করবে। তা ছাড়া ওর হাতে এখন অঢেল সময়। না, এখন বলতে শুধু আজ নয়—আগামী একশো বছর। কারণ, কারও সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও পিছুটান নেই। কোনও দায়দায়িত্ব নেই।

প্রথম ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল ওর একমাত্র ছোটভাই কুশান। কী একটা আড়াইদিনের জ্বরে কুশান মারা গিয়েছিল। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা কিছু ধরতেই পারেননি। সেখানে বেডে শুয়ে বারো-সাড়ে বারো বছরের রোগা ছেলেটা করুণ চোখে তাকিয়ে ছিল মায়ের দিকে, বাবার দিকে, আর ওর দাদার দিকে। বারবার জিগ্যেস করেছিল, 'আমি কবে ভালো হব? কবে বাড়ি যাব?'

না, ওর আর বাড়ি ফেরা হয়নি।

তারপর এল বাবার পালা।

আর সবশেষে মা চলে গেল। তারপর...।

তারপর থেকে একা।

রোশন ছোট করে বলল, 'ঠিক আছে, দেখি—।' তারপর চা-বিস্কুটের দাম মিটিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল : 'রাতে থাকার জন্যে একটা হোটেল বা গেস্টহাউসের নাম বলতে পারেন?'

'কেন পারব না! আশাপুর লজ—চৌরাস্তার মোড়ের কাছে। স্বামী বিবেকানন্দের একটা পাথরের মূর্তি আছে—সাদা রঙের। সেখানে গেলেই আশাপুর লজ দেখতে পাবেন। এই রাস্তা ধরে দু-পা গেলেই রিকশো স্ট্যান্ড। রিকশো ধরে নিন—পনেরো টাকা ভাড়া নেবে। লজের মালিক বিশ্বরূপবাবু। লজে গিয়ে বিশ্ববাবুকে বলবেন, হাইরোডের চায়ের দোকান থেকে যোগেনদা পাঠিয়েছে...।'

'ধন্যবাদ—' বলে রোশন দোকানের বাইরে বেরিয়ে এল।

'আশাপুর লজ'। চৌরাস্তা। বিবেকানন্দের মূর্তি।

তারপর কলাবতীর তীর। বিশ টাকার টিকিট। অদ্ভুত লড়াই।

রাস্তায় পা দিয়েই রোশন আকাশের দিকে তাকাল। চাঁদটা এখনও আগের মতোই বিউটিফুল।

□

রোশন যখন কলাবতীর তীরে এসে দাঁড়াল তখন বাঁকা চাঁদ আকাশে অনেকটা গড়িয়ে গেছে। রাতের অন্ধকার ডুবিয়ে দিয়েছে চারপাশ। তবে চাঁদ তার সান্ত ক্ষমতা নিয়ে অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আর খানিকটা দূরে বাঁশের ডগায় দুটো মলিন বালব জ্বলছে।

কলাবতীর তীরে এসে পৌঁছোনোমাত্রই বাতাসের উষ্ণতা হঠাৎ করে দু-ডিগ্রি কমে গেল। রোশন বুঝল ও নদীর খুব কাছে এসে গেছে।

কলাবতী খুব বড় নদী নয়, আর তাতে জলও তেমন নেই। ডানদিকে পাড়ের অনেকটা কাদা পেরিয়ে খেয়াঘাটে পৌঁছোতে হয়। সেই কাদায় নানানজনের পায়ের চাপে তৈরি হওয়া গর্ত। ঘাটে ঢালু করে কাঠের তক্তা পাতা রয়েছে। তারপর নৌকো।

কাঠের তক্তার দুপাশে দুটো লম্বা-লম্বা বাঁশ কাদার মধ্যে পোঁতা রয়েছে। বাঁশ দুটো 'ওয়াই'-এর বাহুর মতো দু-দিকে খানিকটা করে হেলে আছে। তাদের মাথায় দুটো বালব জ্বলছে। সেই আলোয় কাদার গর্তগুলোয় গভীর ছায়া তৈরি হয়েছে।

ঘাটে কোনও লোকজন নেই—এ সময়ে থাকার কথাও নয়। তবে একটা বড় গাছের আড়ালে তিনটে খালি নৌকো ঘাটে বাঁধা রয়েছে। ছায়া-ছায়া দু-তিনটে মানুষ তার ওপরে বসে রয়েছে, গল্প করছে। তাদের বিড়ি অথবা সিগারেটের আগুন স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

বাঁ-দিকটায় তাকাল রোশন।

কতকগুলো ছোট-ছোট ঘর চোখে পড়ল। সেগুলোর জানলা অথবা দরজা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ঘরগুলোর আশেপাশে এলোমেলো গাছপালা। সেখানে এতই অন্ধকার যে, গাছগুলোর মাথা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

ঘরগুলোর পর অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তার পর রয়েছে একটা বড় মাপের টিনের চালে ছাওয়া ঘর। দেখতে অনেকটা গোডাউনের মতো। তার দেওয়ালগুলো ইটের গাঁথনি। দেখে বোঝা যায়, বেশ পুরোনো কনস্ট্রাকশন। সেই দেওয়ালে অনেকটা ওপর দিকে সারি-সারি অনেকগুলো ছোটমাপের খুপরি জানলা। সেইসব জানলা দিয়ে আলো ঠিকরে আসছে। গোডাউনটার একপাশে দাঁড় করানো রয়েছে অনেকগুলো মোটরবাইক আর সাইকেল।

চায়ের দোকানের যোগেনদা ঠিক এইরকম একটা ঘরের কথাই যেন বলেছিলেন! আরও বলেছিলেন, বাইরে থেকে চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যায়। কিন্তু কই, কিছুই তো শোনা যাচ্ছে না!

রোশন অবাক হয়ে চারপাশটা দেখছিল। কী অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ! কোথাও কোনও শব্দ নেই। এমনকী কলাবতী ছোট নদী হওয়ায় তার ছলাৎ-ছলাৎ শব্দও তেমনভাবে শোনা যাচ্ছে না।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনও মানুষজনও দেখতে পেল না ও।

কী করবে ভাবছে, এমন সময় একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল। 'হুঃ', 'হুঃ' শব্দ করে কেউ যেন ডাকছে। কোনও মানুষ যদি ঠোঁট ছুঁচলো করে শব্দ ছুড়ে দেয় তা হলে অনেকটা এরকম আওয়াজ হতে পারে।

শব্দটা বোধহয় অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছিল, কিন্তু রোশন সেটা খেয়াল করেনি। আর খেয়াল করলেও সেটাকে প্যাঁচা কিংবা কোনও নিশাচর প্রাণীর ডাক বলে ভেবেছে।

এখন মনোযোগ দিয়ে ডাকটা কয়েকবার শোনার পর ওর মনে হল, এটা কোনও মানুষেরই আওয়াজ।

কিন্তু একটা মানুষ বারবার এরকম অদ্ভুত আওয়াজ করবে কেন?

রোশন তাড়াতাড়ি পা চালাল সেই টিনের চালার দিকে।

যতই ও এগোতে লাগল, 'হুঃ', 'হুঃ' ডাকটা ততই জোরালো হতে লাগল।

একটু পরেই ও গোডাউনটার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দরজায় দুটো পাল্লা—কাঠের ফ্রেমে করোগেটেড টিনের শিট লাগিয়ে তৈরি। পাল্লা দুটো ভেজানো, তবে পাল্লার টিনের চাদরে জায়গায়-জায়গায় ফুটো।

একটা পাল্লা আস্তে করে ঠেলতেই খানিকটা খুলে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে চৌকো চোয়াল, বড়সড় থ্যাবড়া মুখ, কালো মতন একটা লোক উঁকি মারল। রোশন পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে লোকটার হাতে দিল। লোকটা টাকাটা নিয়েই রোশনকে হাত ধরে টেনে গোডাউনের ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে চুপ করে থাকার জন্য ইশারা করল। তারপর টিনের পাল্লা আবার ভেজিয়ে দিল।

ভেতরে তখন লড়াই চলছে।

যোগেনদা মোটেই মিথ্যে বলেননি। সত্যি, লড়াইটা ভীষণ অদ্ভুত।

ঘরটায় অনেক লোকের ভিড়—সেইজন্যই ভ্যাপসা গরম আর কেমন একটা গন্ধ। বোধহয় ঘামের গন্ধ আর বিড়ি-সিগারেটের গন্ধ মিশে এই গন্ধটা তৈরি হয়েছে।

ঘরের মাথার ওপরে লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে তৈরি ট্রাস। সেখান থেকে তিনটে সিলিংফ্যান লম্বা ডাউনরডের ডগায় ঝুলছে এবং কালিঝুলি মাখা ফ্যানগুলো সাধ্যমতো ঘুরছে। ওদের একটু-আধটু আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

ঘরে আলো বলতে তিনটে টিউব লাইট আর সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া তিনটে ন্যাংটো বালব। এই আলোয় লড়াইয়ের রিং-এ ভালোই আলো হয়েছে, তবে রিং ঘিরে থাকা দর্শকদের মধ্যে আলো এবং ছায়া ভাগাভাগি হয়ে গেছে। আর ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত সে-আলো পৌঁছোতে না পারলেও ছায়া অনায়াসে পৌঁছে গেছে।

গোডাউনের দু-দিকের দুই দেওয়ালে অনেক বস্তা থাকে-থাকে নানান উচ্চতায় লাট দিয়ে রাখা। বস্তার ভেতরে কী আছে কে জানে! দর্শকদের কেউ-কেউ লড়াইটা ঠিকঠাকভাবে দেখতে পাওয়ার জন্য বস্তার সেই লাটের ওপরে উঠে পড়েছে।

মোটামুটিভাবে গোডাউনের মধ্যিখানে, আলোর ঠিক নীচে, লড়াইয়ের রিং তৈরি করা হয়েছে। ইট গেঁথে যেমন পাঁচিল তোলা হয় ঠিক সেই ঢঙে বস্তার ওপরে বস্তা চাপিয়ে খাটো পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে। সেই পাঁচিল দিয়ে গোলমতন একটা জায়গা ঘেরা। তবে পাঁচিলের এক জায়গায় ফুটদুয়েক ফাঁক রাখা হয়েছে—রিং-এর ভেতরে যাতায়াতের জন্য।

রোশন ভিড় ঠেলে রিং-এর খানিকটা কাছাকাছি এগিয়ে গেল। চারপাশ থেকে নাকে আসছে ঘামের কটু গন্ধ।

রোশন তাকাল রিং-এর দিকে।

রিং-এর মধ্যে লড়াই চলছে। দুজন ফাইটার লড়ছে—কিন্তু সেখানে কোনও রেফারিকে চোখে পড়ল না।

ফাইটার দুজনের স্বাস্থ্য মোটামুটি। পরনে বারমুডা ধরনের শর্টস। একজনের শর্টসের রং কালো, আর-একজনের বাদামি। ব্যস, পোশাক বলতে শুধু ওইটুকুই।

না, ভুল হল। কারণ, পোশাক বলতে আরও একটু কিছু আছে। সেটা হল, দুজন ফাইটারেরই চোখ কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা। এবং সেই 'অন্ধ' অবস্থাতেই তারা লড়ছে।

রোশন অবাক হয়ে লড়াকু মানুষ দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। এরকম অদ্ভুত লড়াই দেখা তো দূরের কথা, ও কখনও শোনেওনি।

'হুঃ', 'হুঃ' জিগির চলছিল। একবারও থামেনি। কিছুক্ষণ লড়াইটা দেখার পর রোশন তার মানে বুঝতে পারল এবং সেইসঙ্গে লড়াইয়ের নিয়মটাও।

কালো প্যান্ট পরা ফাইটার তখন 'হুঃ', 'হুঃ' করে আওয়াজ করছিল আর রিং-এর মধ্যে চঞ্চল প্রজাপতির মতো নেচে বেড়াচ্ছিল। কখনও-কখনও বস্তার পাঁচিলে ধাক্কা খাচ্ছিল। আর বাদামি প্যান্ট পরা ফাইটার কোনও শব্দ করছিল না, বরং সেই 'হুঃ', 'হুঃ' শব্দ শুনে শব্দভেদী বাণের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাড়া করে নাগালে পাওয়ার চেষ্টা করছিল।

রোশন বুঝতে পারল, একজন ফাইটার ওই অদ্ভুত আওয়াজ করে শত্রু ফাইটারকে নিজের পজিশন জানিয়ে দিচ্ছে, বলতে গেলে শত্রুকে ইনভাইট করছে। আর সেই 'আবাহনী মন্ত্র' যাতে ঠিকঠাক শোনা যায় সেইজন্য দর্শকরা নিঃশব্দে চুপটি করে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখার উত্তেজনা ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিচ্ছে। তাদের কারও-কারও হাতে বিড়ি অথবা সিগারেট।

দুই 'অন্ধ' ফাইটারের অদ্ভুত কানামাছি লড়াই দেখতে লাগল রোশন।

একজন ফাইটার যখন 'হুঃ', 'হুঃ' চিৎকার করা অন্য ফাইটারকে নাগালে পেয়ে যাচ্ছে তখন সে পাগলের মতো ঘুষি-লাথি চালাচ্ছে, আর অন্যজন সেই মার থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে—কিন্তু কোনওরকম পালটা আক্রমণ করছে না। এবং সেই সময়টুকু 'হুঃ', 'হুঃ' চিৎকারটা বন্ধ থাকছে।

মার খাওয়া ফাইটার যখন আক্রমণকারী ফাইটারের কবজা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখনই শুরু হচ্ছে উলটপুরাণ। অর্থাৎ, যে এতক্ষণ মার দিচ্ছিল সে এবার 'হুঃ', 'হুঃ' আওয়াজ শুরু করে দিল। কারণ, এখন তার মার খাওয়ার পালা।

একজন লম্বা-চওড়া পেটানো চেহারার লোক রিং থেকে বেরোনোর পথের মুখটায় দাঁড়িয়ে ছিল। ফাইটাররা নিয়মে কোনও ভুলচুক করলেই সে চিৎকার করে সাবধান করছিল এবং কী করতে হবে নির্দেশও দিচ্ছিল। এই লোকটাই বোধহয় রেফারি। কালো হাফপ্যান্ট পরা ফাইটারকে সে 'ওয়ান' বলে ডাকছিল, আর বাদামি হাফপ্যান্টকে 'টু'। বোধহয় লড়াইয়ের আগেই এইরকম নামের কথা ফাইটারদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই মুহূর্তে কালো প্যান্ট বাদামিকে হাতের নাগালে পেয়ে গেছে এবং আন্দাজে ভর করে তার মাথা লক্ষ্য করে একটা ঘুসি চালিয়ে দিয়েছে।

ঘুসিটা লাগল বাদামির কানের এলাকায়। বাদামি 'উঃ' শব্দ করে বস্তার পাঁচিলের ওপরে টলে পড়ে গেল। ওপরের থাকের বস্তাটা পড়ে গেল রিং-এর বাইরে। জনগণ চাপা চিৎকার করে উঠল।

কালো তখন এলোপাতাড়ি লাথি চালাতে লাগল। খুঁজতে লাগল বাদামির শরীর। প্রথম দুটো লাথি শূন্যে খরচ হলেও পরের তিন-চারটে টার্গেটে লাগল। বাদামি পড়ে গেল মেঝেতে। যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। সেই আওয়াজ শুনে কালো ঝুঁকে পড়ল। আরও কয়েকটা শব্দভেদী আঘাত ধেয়ে গেল বাদামিকে লক্ষ করে। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে,...আরও...আরও...।

বাদামি তখন রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। ওর চোখ বাঁধা কালো কাপড়টা ঘাম আর রক্তে ভিজে গেছে। ওর শরীরটা মেঝেতে পড়ে আছে—আর নড়াচড়া করছে না। তবে মুখ দিয়ে যন্ত্রণার টুকরো-টুকরো

কাতরানির শব্দ বেরিয়ে আসছে। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, বাদামি এখনও বেঁচে আছে।

রেফারি চট করে রিং-এর মধ্যে ঢুকে এল। কালো প্যান্টের চোখের পটিটা খুলে দিয়ে ওর একটা হাত শূন্যে তুলে ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'লড়াই খতম। এ-ম্যাচের উইনার ছবিয়া!'

এতক্ষণ ধরে চুপচাপ থাকা পাবলিক এবার হইহই করে চেঁচিয়ে উঠল।

বাদামি হাফপ্যান্ট তখন ধীরে-ধীরে মেঝেতে উঠে বসেছে। রেফারির ইশারায় দুটো ছেলে রিং-এ ঢুকে পড়ল। ওদের একজনের হাতে অনেকগুলো পাঁচশো আর একশো টাকার নোট। টাকাটা সে রেফারির হাতে দিল।

সেখান থেকে কিছু টাকা গুনে নিল রেফারি। তারপর সেটা ছবিয়ার হাতে দিয়ে বলল, 'এই লড়াইয়ে ছবিয়া জিতেছে। তাই ও পাচ্ছে উইনারের প্রাইজ আড়াই হাজার টাকা...।'

পাবলিক আবার হইহই করে উঠল।

রেফারি এবার 'সাবাস, ছবিয়া!' বলে ছবিয়ার পিঠ চাপড়ে দিল। তারপর ছবিয়ার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল।

হ্যান্ডশেক করার সময় ছবিয়ার মুখের ভাবটা এমন হল যেন ও কৃতার্থ হয়ে গেছে।

রোশনের মনে হল, রেফারি লোকটা বোধহয় একজন কেউকেটা হবে।

রেফারির বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশ গোছের হবে। গায়ে একটা কালো হাফ শার্ট। স্বাস্থ্যের জন্য শার্টটা টান-টান হয়ে রয়েছে, নানান পেশির খবর জানিয়ে দিচ্ছে। মাথায় কোঁকড়ানো চুল—ছোট-ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রং ময়লা। কপালটা বেশ চওড়া। তার তুলনায় চোখ সরু। কিছুটা থ্যাবড়া নাক, চৌকো চোয়াল। চওড়া গোঁফ। ডানকানে একটা সোনার মাকড়ি। ডানহাতের কবজিতে স্টিলের বালা, আর আঙুলে পাথর বসানো তিনটে আংটি।

লোকটার পায়ে আধময়লা জিনস আর ব্যবহারে কাহিল হয়ে যাওয়া কালো স্নিকার।

রিং-এ ঢুকে যাওয়া ছেলে দুটো তখন হেরে যাওয়া ফাইটারকে ধরে তুলছে, দাঁড় করাচ্ছে। সে দাঁড়ানোর পর তার চোখে বাঁধা কালো কাপড়টা ওরা খুলে দিল।

বাদামি প্যান্ট একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে রেফারির কাছে এল।

রেফারি তার একটা হাত তুলে ধরে আগেরই মতোই চেঁচিয়ে বলল, 'সুরেশের জন্য এবার হাততালি। এই ম্যাচে সুরেশ সেকেন্ড হয়েছে। ওর জন্যে সেকেন্ড প্রাইজ সাড়ে সাতশো টাকা। হাততালি দিন সব্বাই—।'

হাততালির আওয়াজে গোডাউন গমগম করে উঠল।

ফাইটার দুজন রিং থেকে বেরিয়ে গেল। রোশন দেখল, সুরেশ তো ভালোই আহত হয়েছে, তবে ছবিয়া যে আঁচড়হীন তা নয়। ওরও ঠোঁটের কোণে, বাঁ-ভুরুর ওপরে রক্ত জমে আছে।

রেফারি বলল, 'আপনারা সবাই ওয়েট করুন। পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যেই পরের ফাইট চালু হয়ে যাচ্ছে। ফাইটারদের এখনই আমি রিং-এ ডেকে নিয়ে আসছি। ওরা এখানে এসে রাউন্ড দেবে। আপনারা ওদের হেলথ-ফেলথ দেখুন, সবকিছু ছানবিন করুন—তারপর বুকির কাছে বাজির পয়সা লাগান...।'

রেফারির কথা শেষ হতে-না-হতেই নতুন দুজন ফাইটার রিং-এর ভেতরে এসে হাজির। রেফারি ওদের নিয়ে রিং-এর মধ্যে রাউন্ড মারতে লাগল আর বলতে লাগল, 'নিন, ভাইসব—বাজি লাগান। বুকি ওই কর্নারে টেবিল নিয়ে বসে আছে—' হাত তুলে গো-ডাউনের একটা কোণের দিকে দেখাল রেফারি : 'আপনারা ওখানে গিয়ে বাজির পয়সা লাগান...।'

দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল।

রোশন বেশ অবাক চোখে চারপাশটা দেখছিল। মনে হচ্ছিল, ও একটা নতুন জগতে ঢুকে পড়েছে। ও ভিড় ঠেলেঠুলে বুকির টেবিলের দিকে এগোচ্ছিল। না, ওর বাজি ধরার কোনও মতলব ছিল না। শুধু ব্যাপারটা দেখার জন্য কৌতূহল হচ্ছিল।

বেশ কিছুক্ষণের ধাক্কাধাক্কি পার করে শেষ পর্যন্ত ও বুকির টেবিলের কাছে পৌঁছোল।

সেখানে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা ছোট কাঠের টেবিল আর দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার। চেয়ারে বসে আছে একজন রোগাপটকা মাঝবয়েসি লোক আর একজন পঁচিশ-ছাব্বিশের ছোকরা।

মাঝবয়েসি লোকটির চোখে চশমা, মাথায় একটা রঙিন রুমাল বাঁধা, আর গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। পরনে একটা ঢোলা হাফ শার্ট আর ময়লা পায়জামা। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। থেকে-থেকেই সে নাক টানছে আর হাতের পিঠ দিয়ে নাক মুছছে। এবং সেই নাক মোছার চকচকে রেশ থেকে যাচ্ছে গালের ওপরে।

মাঝবয়েসি লোকটির পাশে বসা পঁচিশ-ছাব্বিশের ছেলেটির চেহারাও রোগার দিকেই। গায়ের রং মাঝারি। মাথায় অনেক চুল। পরনে সাধারণ শার্ট-প্যান্ট আর চপ্পল।

ওরা দুজনেই ভীষণ ব্যস্ত।

মাঝবয়েসি লোকটি সবাইকে আগের লড়াইয়ের বাজির পেমেন্ট দিচ্ছে। পেমেন্ট দেওয়ার আগে বাজি ধরার চিরকুটটা নিয়ে চেক করে দিচ্ছে পঁচিশ-ছাব্বিশের ছেলেটি। এরই ফাঁকে-ফাঁকে নতুন লড়াইয়ের বাজির টাকাও নিচ্ছে ওরা। সেই টাকা নিচ্ছে ছেলেটি, আর চিরকুট ইস্যু করছে রোগাপটকা মাঝবয়েসি মানুষটা।

ওদের দুজনকে ঘিরে যথেষ্ট ভিড়। সেই ভিড় থেকে সামনে বাড়ানো রয়েছে অসংখ্য হাত। দেখে মনে হচ্ছে, দুর্ভিক্ষ হয়েছে এমন একটা অঞ্চলে ওরা দুজন খাবার বিলি করতে এসেছে। আর, খেতে না পাওয়া হতভাগ্য মানুষগুলো এককণা খাদ্যের আশায় ওদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দুই দেবদূতের দিকে।

রোশনের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সত্যি, এর চেয়ে সত্যিকারের দুর্ভিক্ষ হওয়াটা বোধহয় অনেক ভালো ছিল।

বুকি দুজনের চেয়ার-টেবিল থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট জায়গা কাপড় টাঙিয়ে ঘেরা রয়েছে—অনেকটা যেন গ্রাম-গঞ্জের নাটকমঞ্চের পাশে তৈরি গ্রিনরুম।

কৌতূহলে সেদিকটায় এগিয়ে গেল রোশন।

সেখানে বেশ কিছু লোকের জটলা। সেটা পেরিয়ে নজর চালাতেই গ্রিনরুমের ভেতরের দৃশ্যটা নজরে পড়ল।

সেখানে মাঝারি আলোর একটা বালব জ্বলছে। একটু আগেই যারা লড়াই শেষ করল সেই ফাইটার দুজন দুটো টুলের ওপরে বসে আছে। তাদের সেবা-শুশ্রূষা চলছে। একটা বছর তেরো-চোদ্দোর ছেলে একটা ছোট্ট টিনের বাক্স হাতে ওদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। বাক্সটার ডালায় লাল রঙের আঁকা একটা 'প্লাস' চিহ্ন—তবে তার রং এ-জায়গায় সে-জায়গায় চটে গেছে।

ছেলেটার পাশেই একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ডানহাতে ওষুধে ভেজানো তুলো। সে বারবার ঝুঁকে পড়ে সুরেশ নামের ফাইটারের বাঁ-ভুরুতে আর ঠোঁটের ডানদিকে সেই তুলোর পোঁটলাটা চেপে-চেপে ধরছে।

গ্রিনরুমের ডানদিক ঘেঁষে পাতা রয়েছে একটা লম্বা বেঞ্চ। সেই বেঞ্চে চারজন যুবক পাশাপাশি বসে রয়েছে—ঠিক যেন স্কুলের বেঞ্চে বসা ছাত্র। তিনজনের বয়েস ছাব্বিশ থেকে আটাশের মধ্যে, আর একজনের বয়েস সাঁইত্রিশ কী আটত্রিশ হবে। তাই চারজনের মধ্যে বেশি বয়েসের লোকটিকে 'অড ম্যান আউট' বলে মনে হচ্ছে। তার মাথায় এক-দু-গাছা পাকাচুলও চোখে পড়ছে।

রোশন ভাবছিল, এই চারজন এভাবে বেঞ্চে চুপচাপ বসে আছে কেন?

এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ও এই প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পেল না। তারপর যখন ও ভাবছে, কাউকে ব্যাপারটা জিগ্যেস করলে হয়, ঠিক তখনই ওর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ানো একটা লোক বলে উঠল, 'ওরা সব ফাইটার—পরপর জোড়ায়-জোড়ায় লড়বে...।'

রোশন লোকটার দিকে তাকাল।

বয়েস পঁয়তাল্লিশ কী তার একটু বেশিই হবে। ফরসা লম্বাটে মুখ। বড়-বড় চোখ। চোখে চশমা। ছোট মাপের চাপা নাক। সারা মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ।

সবমিলিয়ে মুখটায় কেমন যেন একটা কমিক ভাব রয়েছে—অনেকটা সার্কাসের জোকারের পেইন্ট করা মুখের মতন।

লোকটা একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে জ্বলন্ত বিড়ি—তাতে ঘন-ঘন টান দিচ্ছে। তা ছাড়া মুখ থেকে নেশার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

'আশাপুরে নতুন বুঝি?' চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করল লোকটা।

'হ্যাঁ—আজই এসেছি...।' সায় দিয়ে মাথা নাড়ল রোশন।

'আমি এখানকার...লোকাল...সেই জম্মো থেকেই...।'

রোশন একটু হাসল—কোনও কথা বলল না।

'আমার নাম নিত্যানন্দ—সবাই নিতুয়া বলে ডাকে। নিত্যানন্দ থেকে নিতু...তারপর নিতু থেকে নিতুয়া...।' বিড়িতে টান দিল দুবার। থু-থু করে কিছু একটা মুখ থেকে ছিটকে দিল : 'তোমার নাম কী?'

'রোশন—।' লোকটার সঙ্গে কথা বলতে রোশনের কেমন যেন অ্যালার্জি হচ্ছিল।

'বাঃ! রোশন—রোশনাই। বাপের ঘর আলো করা লালটু ছেলে...।' নিতু হাসল হ্যা-হ্যা করে।

রোশনের হাসিটা ভালো লাগল না। ওর কুশানের কথা মনে পড়ে গেল। ও ছিল ঘর আলো করা ছেলে। কী দারুণ ছিল লেখাপড়ায়। আর দেখতেও ছিল কী ফুটফুটে!

এইচ. এস.-এর পর রোশনের আর লেখাপড়া হয়নি। হয়নি মানে পড়তে ইচ্ছে করেনি আর। ড্রাইভিং শিখে লাইসেন্স বের করেছিল। কয়েক বছর এর-তার ট্যাক্সি আর প্রাইভেট কার চালিয়েছিল। এইচ. এস. পাশ করার পরপরই তো গন্ডগোল হল। একটা নিষ্ঠুর ঝড় ওদের ফ্যামিলিটাকে ওলটপালট করে দিল। এই নিতু লোকটা তার কতটুকু জানে!

নাঃ, নিতুর কোনও দোষ নেই।

'তা আসছ কোত্থেকে?'

'কলকাতা থেকে—।'

'আমাদের এখানে কি কাজ নিয়ে এসেছ?'

'না, সেরকম কোনও কাজ নিয়ে আসিনি।'

'আছ কোথায়?'

' "আশাপুর লজ"-এ উঠেছি। রেট বেশ সস্তা...।'

'হুঁ—।'

রোশন ওকে জিগ্যেস করল, 'এই লড়াইয়ের ব্যবস্থাটা কারা করে?'

নিতু রোশনের জামা ধরে একপাশে টেনে নিল। রোশন লক্ষ করল, ও সামান্য পা টেনে চলছে। একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে নিতু চাপা গলায় বলল, 'বলছি—তবে কারও সঙ্গে গজল্লা কোরো না। এই ফাইটের শো চালায় পলান—ওই যে, যে-লোকটা লড়াইয়ের রেফারি হয়। ওর সঙ্গে আরও আমচা-চামচা আছে...।'

রেফারির থ্যাবড়া নাক, চৌকো চোয়াল মুখটা রোশনের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'এই ফাইট শো থেকে পলানরা হেভি পাত্তি ইনকাম করে। প্রত্যেক শনিবার এই গোডাউনে লড়াই হয়...রাত আটটা থেকে—।'

'পুলিশ বা আর-কেউ কিছু বলে না।'

'পুলিশ?' খিকখিক করে হাসতে লাগল নিতু। হাসি থামলে পর গলা সাফ করল। শেষ হয়ে যাওয়া বিড়ির টুকরোটা মাটিতে ফেলে চপ্পল দিয়ে ঘষে দিল। তারপর বলল, 'পুলিশ হচ্ছে কোলের খোকা। ন্যাংটো, কথা বলতে পারে না, কারও কথা বুঝতেও পারে না। মানে, লজ্জা কাকে বলে জানে না। সেইসঙ্গে বোবা আর কালা। শুধু নিজের খিদেটুকু বোঝে। আর ওদের খিদের মানে তো বোঝো! তো পলান সে-খিদে রেগুলার মিটিয়ে দেয়।

'তা ছাড়া, এ-খেলা বন্ধ করবে কেন? এ-খেলা চললে তো সবার লাভ। অবশ্য ভুলভাল ফাইটারের ওপরে বাজি ধরে ফেললে লোকসান হতে পারে। পলান লোকটা শয়তান হলেও টাকা-পয়সা ছড়ায়। যেমন, ধরো না, যে-সে ওর এই ফাইটে নাম দিতে পারে। তো তার চেহারা রোগাপটকা হলেও। যদি সে ফাইটে হেরে যায় তা হলেও সে কমবেশি টাকা পাবে। গরিব লোকজন অনেক সময় এ-লড়াইয়ে নাম দেয় শুধুমাত্র দু-চারটে টাকার জন্যে। তা ছাড়া চোখ বেঁধে লড়াই হয় বলে কোনও ফাইটারই তেমন চোট-ফোট পায় না। তা হলে এ লড়াই মন্দ কী!'

রোশন বলল, 'বুঝেছি।' তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর জিগ্যেস করল, 'বেঞ্চে যে-চারজন ফাইটার বসে আছে তার মধ্যে তো একজনের বয়েস একটু বেশি মনে হচ্ছে। ওই যে, বেঞ্চের একেবারে এ-সাইডে বসে আছে...।' গলা উঁচু করে গ্রিনরুমের বেঞ্চের দিকে দেখাল রোশন।

নিতু ঠোঁট চওড়া করে হাসির ভঙ্গি করল। চশমাটা নাড়াচাড়া দিয়ে ঠিক করল। তারপর বলল, 'হুঁঃ! ও হচ্ছে গনিরাম। গনি বহুবার এখানকার ফাইটে নাম দিয়েছে। কখনও জিতেছে, কখনও মুখ থুবড়ে পড়েছে। আসলে ও নাম দেয় অভাবে। আশাপুরের সুতোকলে কাজ করত। কীসব চুরিচামারি করেছে বলে চাকরি গেছে। সে প্রায় বছরখানেক হল। তারপর থেকে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে।'

রোশন একটু অবাক হল। ছন্নছাড়া। ওর মতন! যার তিনকূলে আর কেউ নেই! আত্মীয়স্বজন বলতে আকাশ, বাতাস, মাটি, গাছপালা আর নদী-নালা। ওরাই এখন রোশনকে ঘিরে থাকে, ছুঁয়ে থাকে।

'গনিরামের কোনও ফ্যামিলি নেই?' গনিরামের ব্যাপারে কৌতূহল হল রোশনের।

'না, আছে—' জিভ দিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ করে বলল নিতু। তারপর আঙুল তুলে গ্রিনরুমের দিকে দেখাল : 'ওই যে...ওটা গনিরামের ছেলে...।'

আঙুলের নিশানা লক্ষ্য করে তাকাল রোশন! গনিরামের কাছে একটা দশ-বারো বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলেটার গায়ে নীল রঙের একটা টি-শার্ট, পায়ে কালো হাফপ্যান্ট। একহাতে একটা বড় পলিথিনের প্যাকেট, আর অন্যহাতে একটা ললিপপ।

ছেলেটা ওর বাবার সঙ্গে কীসব কথা বলছে, আর তার ফাঁকে-ফাঁকে ললিপপে একদফা 'চকাৎ' করছে। রেফারি তখন চেঁচিয়ে পরের লড়াইয়ের ফাইটারদের নাম ঘোষণা করছে। তার মধ্যে গনিরামের নাম রয়েছে। এবং তার অপোনেন্ট ফাইটার কামাল।

রেফারি আরও বলছে, আর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই নেক্সট ফাইট শুরু হবে। নিতুয়া নীচু গলায় রোশনকে গনিরামের কথা বলছিল।

গনিরাম আশাপুরের 'মহামায়া কটন মিল'-এ চাকরি করত। বছর চারেক আগে ওর বউ আরতি আশাপুর হাইরোডে ট্রাক চাপা পড়ে মারা যায়। আরতি কলকাতা থেকে ফিরছিল। তখন সন্ধে হয়-হয়। বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটা ফুল পাঞ্জাব ট্রাক ওকে চটকে দেয়। সে-দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

গনিরাম অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা পেয়ে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। ওর ছেলে ববিনের বয়েস তখন কত? খুব বেশি হলে সাত কি আট বছর। ওই একটাই ছেলে ওর।

বউয়ের শোক কাটিয়ে উঠতে গনিরামের এক-দেড়বছর লেগেছিল। ওর এক বিধবা দিদি ওর সঙ্গে থাকে —সাবিত্রী। তো সাবিত্রী ববিনের দেখভাল করতে লাগল। তার সঙ্গে রান্নাবান্না সব। কিন্তু বাচ্চাটা বাপের খুব নেওটা। সবসময় বাপের সঙ্গে থাকতে চায়, বায়না করে। বাবা রোজ সুতোকলের কাজে রওনা দিলে ববিন হাত-পা ছোড়ে, চেল্লামেল্লি করে। এই নিয়ে রোজ লাফড়া। তাকে সাবিত্রী অনেক কষ্টে মন-টন ভুলিয়ে সামলেসুমলে ঠান্ডা করে। তো এসব করতে-করতে স্কুল কামাই হয়। ব্যস!

শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটা স্কুল ছেড়ে দিল। গনিরাম ওকে এতটাই ভালোবাসে যে, তেমন বকাঝকা করে শাসন করে ওকে আর স্কুলে পাঠাতে পারল না।

'আপনি এত কথা জানলেন কেমন করে?' রোশন জিগ্যেস করল।

'জানব না!' হাসল নিতু : 'আমি আর গনিরাম তো একই বস্তিতে থাকি। ওটাকে সবাই বারো নম্বর বলে। ওই তো, রেল-লাইনের ধারে...।'

'গনিরামের চাকরিটা গেল কেমন করে?'

'ওই যে বললাম, চুরিচামারি করে...।'

'কী চুরি করেছে ও?' রোশন গনিরামকে দেখছিল। লোকটা বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে, মাথায় হাত বোলাচ্ছে।

'কী চুরি করেছে সেটা ঠিকঠাক জানি না, তবে এর-তার মুখে শুনেছি, মিল থেকে সুতোর লাছি হড়কে বাইরে কোন এক গেঞ্জি কোম্পানির কাছে বেচতে চেষ্টা করেছিল। কেসটা কীভাবে যেন ক্যাচাল হয়ে যায়।' একটা বড় মাপের শ্বাস ফেলল নিতুয়া। তারপর : 'ব্যস! চাকরিতে হাত ধুয়ে বসল...।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! অভাব পাগলা কুত্তার মতো কামড়ে ধরল। একটা কাজ জোটানোর জন্য আর পাঁচটা কলকারখানায় অনেক ঘোরাঘুরি ছুটোছুটি করল, কিন্তু পোড়া কপাল! কিছুই জোটাতে পারল না। তখন নেশা-টেশা ধরল...আর তার সঙ্গে এই ব্লাইন্ড ফাইট। যদি ফাইটে জিততে পারে তা হলে জম্পেশ পয়সা। আর যদি হেরে যায় তা হলেও কম-বেশি কিছু জোটে...।'

রোশন গনিরামের ছেলেকে অবাক হয়ে দেখছিল। গোডাউনের এই ব্লাইন্ড ফাইটের আসরে ববিন ছাড়া আর কোনও ছোট ছেলে নেই।

ও নিতুকে জিগ্যেস করল, 'নিতুদা, এখানে ববিন ছাড়া আর তো কোনও ছোট ছেলে-টেলে দেখছি না। তা হলে এই বাচ্চাটাকে ঢুকতে দিয়েছে কেন?'

'নিতুদা! তুমি আমাকে দাদা বললে! আমাকে দাদার সম্মান দিলে!' রোশনের বাঁ-হাতটা খামচে ধরল নিতু। কেমন যেন ধরা গলায় বলল, 'আমাকে সবসময় সবাই দুরছাই করে। পোকামাকড় কি জঞ্জাল ভাবে। না, ভাই রোশন, তুমি একজন স্পেশাল ভদ্দরলোক। তোমার ভালো হবে। কলকাতার লোক বলে তোমার কোনও গুমোর নেই...।' নিতু রোশনকে টেনে আরও একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেল। তারপর বলল, 'ববিন ছেলেটা বাপ ছাড়া কিছু বোঝে না। সবসময় বাবার লেজ ধরে থাকে। তাই গনিরাম লড়তে এলে পলানরা ওর ছেলেকে অ্যালাউ করে—তবে ববিনকে ফাইট দেখতে দেয় না। এক সাইডে বাচ্চাটাকে বসিয়ে রাখে...। ওই যে, দ্যাখো, কানুয়া ববিনকে হাত ধরে সাইডে নিয়ে যাচ্ছে। এবার তো গনিরামের ফাইট—।'

'কানুয়া কে?'

'পলানের ডানহাত, মানে, পলানের অনেকগুলো ডানহাত—তার মধ্যে একটা।' চোখের একটা ভঙ্গি করে হেসে উঠল নিতু। তারপর : 'পলান হচ্ছে মা দুর্গার কাছাকাছি। ওর অনেকগুলো ডানহাত, অনেকগুলো বাঁ-হাত। আশাপুরে ক'দিন যদি থেকে যাও তা হলে সব টের পেয়ে যাবে।'

আশাপুরে রোশন ক'দিন থাকবে সেটা আশাপুরই জানে! ইচ্ছে আছে কাল সকালে জগন্ময়ীর কালীমন্দির দেখতে যাবে। তারপর আশাপুরের এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াবে। মানুষজন দেখবে, অনুভব করবে। তারপর বল গড়াতে-গড়াতে যেদিক পানে যায়।

'লড়াই শুরু হচ্ছে—' পলান চিৎকার করে বলল, 'সবাই চুপ এবার!'

ভিড়ের পাঁচিলের জন্য পলানকে রোশন দেখতে পাচ্ছে না, তবে ওর হুকুমদারি ফরমান শুনতে কোনও অসুবিধে হল না। পলানের কথা বলার ঢং থেকে যেন তেজ ছিটকে বেরোচ্ছিল। তার সঙ্গে মিশে ছিল প্রত্যয়।

পলানের হুকুম শোনামাত্র সবাই চুপ করে গিয়েছিল। এবং ফাইটারদের 'হুঃ', 'হুঃ' ডাক শোনা গেল।

লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

রোশন নিতুর হাত ছাড়িয়ে ভিড়ের পাঁচিলের কাছে এগিয়ে গেল। নিতুকে বলল, 'নিতুদা, লড়াইটা একটু দেখব। আপনিও আসুন না, দেখবেন। গনিরাম তো আপনার পাড়ার লোক!'

নিতুয়া দু-একসেকেন্ড কী ভেবে রিং-এর দিকে এগোল। দু-একজন দর্শককে ঠেলে সরিয়ে জায়গা তৈরি করে ভিড় ভেদ করতে লাগল। বিড়বিড় করে বলল, 'এসব লড়াইয়ে নাম লিখিয়ে ফাটকা খেলার কী দরকার!'

রোশন নিতুয়ার প্রায় পাশেই ছিল। নিতুর কথার উত্তরে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পিছন থেকে কেউ ওর কাঁধে টোকা দিল।

পিছন ফিরে তাকাল রোশন।

রোগা টিংটিঙে চেহারার কালো রঙের বেঁটে মতন একটা ছেলে চোখে প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা ফুলশার্ট, সাদা প্যান্ট। এই গুমোট আবহাওয়ায় ফুলশার্ট কী করে গায়ে দিয়ে আছে কে জানে!

'এরিয়ায় নিউ নাকি?' নীচু গলায় প্রশ্ন করল ছেলেটা। কারণ, লড়াই চলছে।

প্রশ্নটা বুঝতে দু-এক সেকেন্ড সময় লাগল রোশনের। একটু বিরক্তভাবে ভুরু কুঁচকে ও আলতো গলায় জবাব দিল, 'হ্যাঁ—কেন?'

ছেলেটা চোখ বড় করে অবাক হয়ে তাকাল। ব্যঙ্গ করে বলল, 'বাব্বা! কোশ্চেনের উত্তরে কোশ্চেন? আপনি মাস্টারমশাই নাকি?'

রোশন কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

ছেলেটা আবার জিগ্যেস করল, 'নাম কী?'

'রোশন—।' নীচু গলায় বলল রোশন।

'কবে আশাপুরে এসেছেন?'

'আজই...।'

'আপনি হোয়্যার স্টে করছেন, মাস্টারজি?'

রোশন এবার একটু রিয়্যাক্ট করতে যাচ্ছিল। সেটা ওর মুখের ভাব দেখে নিতুয়া বুঝতে পারল। তাই রোগা ছেলেটার চোখের আড়ালে রোশনের হাত টিপল। বলতে চাইল, 'চেপে যাও—।'

রোশন নিজেকে সামলে নিল। ঠান্ডা গলায় বলল, ' ''আশাপুর লজ''-এ উঠেছি।'

'ও, বিশ্বরূপ জোয়ারদারের হোটেলে...।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর রোশন খুব শান্ত গলায় বলল, 'কেন, কোনও প্রবলেম হয়েছে?'

'না, প্রবলেম কিছু হয়নি—' মুখের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দাঁতের কোণ থেকে কিছু একটা বের করার চেষ্টা করল ছেলেটা। তারপর : 'যাতে প্রবলেম না হয় তার জন্যে আপনাকে একটু ছানবিন করছি। পলানদার এরিয়াতে এটাই স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম...।'

ও। এবারে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হল রোশনের কাছে। এই রোগা ছেলেটা পলানের চ্যালা। আশাপুরের এই এলাকার খবরদারি করে।

ছেলেটা এবার নিতুয়ার দিকে তাকাল। নিতুয়া হঠাৎই ভয় পেয়ে কেমন যেন সিঁটিয়ে গেল।

তাচ্ছিল্যের গলায় ছেলেটা বলল, 'কীরে পকেটমারের বাচ্চা! তুই এই জেন্টেলম্যান মাস্টারজির সঙ্গে কী ধান্দায় লেপটে আছিস? চিকেন বানাবি?'

নিতুয়া কোনও জবাব দিল না। রোশনের শরীরের আড়ালে যেন লুকোতে চেষ্টা করল।

ছেলেটা রোশনকে বলল, 'কেয়ারফুল, মাস্টারজি! এই নিতু সালা হাতসাফাইয়ের সুপ্যারম্যান...।' তারপর আঙুল দিয়ে দাঁত খোঁচাতে-খোঁচাতে চলে গেল।

রোশন নিতুকে জিগ্যেস করল, 'নিতুদা, এই ছেলেটা কে? পলানের আর-একটা ডানহাত?'

নিতু ছেলেটার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেদিকে চোখ রেখেই বলল, 'হ্যাঁ। ওর নাম কাটা নগেন। সালা রাম হারামি...।'

'কাটা নগেন? হঠাৎ ''কাটা'' কেন?' রোশন জিগ্যেস করল। বখাটে ছেলেটা নিতুকে যে পকেটমার বলে অপমান করে গেল, সেটাও রোশনের ভালো লাগেনি।

রোশনের দিকে তাকাল নিতু। মাথার কাঁচাপাকা চুলে হাত বোলাল, যেন কাটা নগেনের ছুড়ে দেওয়া অপমানে ওর বড়-বড় চুলের ডিজাইন ঘেঁটে গেছে। তারপর চশমাটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে ঠিকঠাক করে বসাল।

'সাত-আট বছর আগে একদিন রাত্তিরবেলা রেল লাইনের ধারে বসে কাটা নগেন নেশা করছিল। তখন ও ওয়াগন ব্রেকারদের কবজায় পড়ে যায়। পুরোনো কোনও দুশমনি ছিল বোধহয়। তো ওদের দলের একজন চপার দিয়ে নগেনকে অ্যাটাক করে। নগেন ছুটে পালায় বটে, তবে ওর পিঠে চপারের দু-তিনটে কোপ পড়ে। বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকার পর ও সেরে ওঠে—কিন্তু পিঠে ওই কাটা দাগগুলো থেকে যায়। তো সেই থেকে কাটা নগেন...।'

'ও। এবার চলুন, রিং-এর কাছে চলুন...।'

লোকজনের ফাঁকফোকর দিয়ে ওরা রিং-এর দিকে এগিয়ে গেল।

ওই তো দেখা যাচ্ছে গনিরামকে! কালো কাপড় দিয়ে ওর চোখ বাঁধা। খালি গা, কোমরে কালো হাফপ্যান্ট। ওর কাছ থেকে হাতচারেক দূরে ওর 'অন্ধ' প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল। ওরও খালি গা। তবে কোমরে বাদামি হাফপ্যান্ট। ঠোঁট ছুঁচলো করে 'হুঃ', 'হুঃ' আওয়াজ করছে।

দুজনের শরীরই ঘামে ভেজা।

গনিরামের বয়েস প্রতিদ্বন্দ্বী ফাইটারের চেয়ে বেশি, কিন্তু অভিজ্ঞতাও তো বেশি! তাই সবাইকে অবাক করে দিয়ে ও কামালের আওয়াজ লক্ষ্য করে হিংস্র পশুর মতো লাফ দিল। এবং তাকে নাগালে পেয়েও গেল।

ক্ষুধার্ত বাঘ যেভাবে ছুটন্ত হরিণের গলা কামড়ে ধরে তাকে আঁকড়ে ধরে, গনিরাম অনেকটা সেইভাবে কামালকে জাপটে ধরল। তারপর ওর পেটে একের পর এক ঘুসি চালাতে লাগল।

গনিরাম জানে যে, কামাল যদি ওর বাঁধন থেকে একবার ছিটকে যায় তা হলে গনিরামকে তখন 'হুঃ', 'হুঃ' চিৎকার করতে হবে, আর মার খাওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে। তাই গনিরাম যেন মরিয়া। কামালকে জাপটে ধরে আন্দাজে ওর মাথা লক্ষ্য করে একের পর এক ঘুসি চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কামালকে ধরে রাখতে বেশ কসরত করতে হচ্ছিল। কারণ, দুজনেরই ঘামে ভেজা শরীর। বারবার পিছলে যেতে চাইছে কামাল। কিন্তু তারই মধ্যে গনিরামের একটা মোক্ষম ঘুসি কামালের বাঁ-রগের ওপর গিয়ে পড়ল। এবং কামালের শরীরটা এলিয়ে গেল।

কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপরই এক ঝটকায় গনিরামের বাঁধন ছাড়িয়ে কামাল ছিটকে গেল। রিং-এর পাঁচিলের বস্তায় ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

গনিরাম ততক্ষণে জিগির তোলা শুরু করে দিয়েছে। ও ভেবেছিল এ-দানেই ফাইটটা শেষ করে দেবে, কিন্তু সেটা আর হল না। লড়াইটা জিততে পারলেই আড়াই হাজার টাকা! যদিও ফাইটারের লেভেল বুঝে পলান রেট ঠিক করে। এই গোডাউন ফাইটে গনিরামের যা বডি আর ট্র্যাক রেকর্ড তাতে ও আড়াই হাজার টাকাই পাবে। পেলে মুদিখানা দোকানের ধার অনেকটা শোধ করা যাবে। পাঁচলিটার কেরোসিন কিনে স্টক করা যাবে। ছেলেটার একটা জামা, আর একটা প্যান্ট কেনা খুবই দরকার। কারণ, ও একটা জামা, একটা প্যান্ট দিয়ে কোনওরকমে চালাচ্ছে। সেগুলো আবার বেশ কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। যদিও দিদি সেলাই করে মোটামুটি জুড়ে দিয়েছে।

গনিরামকে খুঁজে পেয়েছে কামাল। এলোপাতাড়ি কিল, চড়, ঘুসি চালাচ্ছে।

কামালের ডানভুরুর পাশটায় ফেটে গেছে। জ্বালা টের পাচ্ছে ও। কী যেন একটা চোখের পাশ দিয়ে খুব ধীরে-ধীরে গড়িয়ে নেমে আসছে। জায়গাটা একটু সুড়সুড় করছে। হাত দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করল কামালের। কিন্তু কী একটা ভয়ে ও জায়গাটা আন্দাজ করে হাত বাড়াল না। যদি চটচটে কোনও জিনিস হয় তা হলে কামালের মনের জোর কমে যেতেও পারে।

হঠাৎই গনিরামের একটা সুযোগ এসে গেল। ঘামের জন্য কামালের বাঁধন একটু নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। এক জোরালো ঝটকা দিয়ে সেই বাঁধন ছিঁড়ে ফেলল গনিরাম। আন্দাজে ভর করে যতটা পারল দূরে সরে গেল।

কামালের গায়ে জোর কম নয়। ওর সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে তিন রাউন্ড টিকে থাকা বেশ কঠিন। এই ব্লাইন্ড ফাইট গেমে এক-একটা রাউন্ড পাঁচমিনিটের। বেশিরভাগ লড়াই এখানে দু-রাউন্ডের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। একজন প্রতিযোগী পুরোপুরি কাহিল হয়ে পড়লে তবেই লড়াই শেষ হয়। নাঃ, গনিরামকে মাথা খাটিয়ে একটা কায়দা বের করতে হবে।

কামাল তখন জিগির তোলা শুরু করেছে। চোখে কাপড় বাঁধা থাকলেও কোনদিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে সেটা আঁচ করার জন্য ও এপাশ-ওপাশ মাথা ঘোরাচ্ছে। দর্শকরা উত্তেজনায় হাত নাড়ছে, কিন্তু কেউ কোনও শব্দ করছে না।

হঠাৎই গনিরাম বুকের বাঁ-দিকটা খামচে ধরল। একটু যেন ঝুঁকে পড়ল সামনে।

রোশন অবাক হয়ে ওকে দেখতে লাগল। নিতু রোশনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করল, 'কেসটা কী হল বলো তো?'

রোশন কোনও উত্তর দিল না। ওর সমস্ত মনোযোগ তখন গনিরামের দিকে।

গায়ের রং মাজা। স্বাস্থ্য মাঝারি। কোমর ঘিরে অল্পবিস্তর চর্বি জমেছে। বুকে কাঁচাপাকা লোম। গলায় কালো সুতোর মালায় একটা চকচকে চৌকো লকেট। ডানহাতটা বুকের বাঁ-দিকে খামচে ধরে আছে। সেই হাতের দু-আঙুলে দুটো আংটি : একটা মেটালের, আর-একটা লালচে পাথর বসানো।

চোখ তুলে মুখের দিকে তাকাল।

মাথার চুল সাধারণ। তারই কিছুটা কপালে নেমে এসেছে—ঘামে ভিজে লেপটে আছে। চোখের অবস্থা কালো কাপড়ের পটির জন্য বোঝা না গেলেও নাক আর ঠোঁট কুঁচকে গেছে যন্ত্রণায়। ঠোঁটের কোণ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। সারা মুখে ঘামের বিন্দু। রগের পাশ দিয়ে যে-ঘামের ধারা নেমেছে সেটা কালো কাপড়টা চুষে নিচ্ছে।

'আঃ।' যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল গনিরাম। তারপরেই কাটা গাছের মতো মেঝেতে আছড়ে পড়ল। তখনও ও বুকের বাঁ-দিকটা খামচে ধরে আছে।

দর্শকের দল একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—আশঙ্কার চিৎকার। গনিরামের কিছু একটা হয়েছে।

রোশন স্পষ্ট বুঝল, গনিরামের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

ন'বছর আগে এক রবিবার সকাল দশটা দশে ঠিক এইরকম দৃশ্যই ও চোখের সামনে দেখেছিল। ওর বাবা একটা টুলে বসে বাঁ-হাতে একটা স্টিলের থালা নিয়ে লুচি-বেগুনভাজা খাচ্ছিলেন। একটু দূরে মেঝেতে বসে রোশন একটা গরম লুচি ছিঁড়ে তাতে বেগুনভাজার পুর দিয়ে রোল তৈরি করছিল—তাতে সাধের কামড় বসাবে বলে।

এরকম জলখাবার ওদের ঘরে কদাচিৎ হয়। নইলে রোজকার আইটেম তো সেই হাতে তৈরি আটার রুটি আর কুচো আলুর ঝোলা তরকারি!

রোশন লুচি-বেগুনভাজায় প্রথম কামড় বসানোর মুহূর্তে ঘটনাটা ঘটেছিল। দৃশ্যটা এখনও অনুপুঙ্খভাবে ওর মনে আছে।

বাবার মুখটা যন্ত্রণায় কুঁচকে গিয়েছিল। তার পরের মুহূর্তেই বাবার হাত থেকে জলখাবারের থালাটা পড়ে গিয়েছিল—অথবা বাবা ফেলে দিয়েছিলেন। কারণ, তার পরের সেকেন্ডেই বাবা দু-হাতে বুকের বাঁ-দিকটা খামচে ধরেছিলেন। যন্ত্রণার একটুকরো শব্দ 'আঃ!' বেরিয়ে এসেছিল বাবার মুখ থেকে। তারপরই ভারী চেহারার খাটো মানুষটা টুল থেকে 'দড়াম' করে পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে।

স্টিলের থালাটা পড়ে যাওয়ার শব্দ পেয়েই মা পাশের রান্নাঘর থেকে 'কী হল? কী হল?' চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল। তারপর রান্নাঘর থেকে ছুটে চলে এসেছিল এ-ঘরের দরজায়।

বাবার মেঝেতে পড়ে যাওয়ার সেই ভয়ংকর দৃশ্যটা মা দেখতে পেয়েছিল। এবং সেই মুহূর্তে মা যে-বুকফাটা চিৎকার করে উঠেছিল সেটা এখনও রোশনের কানে বাজে। আচমকা বেজে ওঠা সাইরেনের তীব্র শব্দ যেন। সর্বহারা আন্তরিক হাহাকার।

মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আগেই রোশনের বাবা হয়তো শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন। কারণ, মেঝেতে পড়ে থাকা শরীরটা ছিল নিথর। তাই মানুষটাকে আর হাসপাতালে ভরতি করা যায়নি।

রোশনের বয়স তখন আঠেরো বছর। ছোট ভাই কুশান তার দু-বছর আগেই ওদের ছেড়ে চলে গেছে।

গনিরাম বুকে হাত চেপে পড়ে যাওয়ার সময় ন'বছর আগের দৃশ্যটাই রোশনের চোখের সামনে চলে এসেছিল। তাই ও ভাবছিল, গনিরাম কি এখনও বেঁচে আছে?

পলান তখন রিং-এর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ডানহাতটা পতাকার মতো ওপরে তুলে চিৎকার করে বলছে, 'আস্তে! আস্তে! সবাই চুপ করুন—একদম চুপ! ভয়ের কিচ্ছু নেই। আমরা দেখছি কী হয়েছে...।'

রোশনের ভেতরটা কেমন উতলা হয়ে উঠল। গনিরামকে যদি এক্ষুনি কোনও নার্সিংহোম বা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া যায় তা হলে হয়তো মানুষটা বেঁচে গেলেও যেতে পারে। যদি অবশ্য গনিরাম এখনও বেঁচে থাকে।

রোশন ব্যস্ত হাতে ভিড় সরিয়ে রিং-এর পাঁচিলের কাছে পৌঁছে গেল। নিতু ওর ঠিক পিছনে।

গনিরাম নিথরভাবে পড়ে রয়েছে। ওর চোখের বাঁধন পলান খুলে দিয়েছে। উবু হয়ে বসে ওর নাকের কাছে হাত রেখে বুঝতে চেষ্টা করছে নিশ্বাস পড়ছে কি না। কবজি ধরে পালস দেখছে। বুকে কান পেতে ধুকপুকুনি আছে কি না শোনার চেষ্টা করছে।

কিছু একটা গোলমাল যে হয়েছে সেটা কামাল আঁচ করেছিল। তাই ও লড়াইয়ের ডাক থামিয়ে চোখের পটি খুলে ফেলেছে। এখন ও-ও পলানের পাশে উবু হয়ে বসে গনিরামকে ডাকছে : 'গনিদা! অ্যাই গনিদা! কী হল তোমার? চোখ খোল। তাকাও—।'

কিন্তু গনিরাম সে-ডাকে সাড়া দিল না।

কামাল পলানের দিকে তাকিয়ে একটু থতিয়ে জিগ্যেস করল, 'পলানদা, কেসটা...মানে, গনিদাটা...আমি তো সেভাবে ওকে হিট করিনি...।'

পলান কামালের কথার কোনও জবাব না দিয়ে রিং-এর পাঁচিল ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে তাকাল। সেখানে নগেন আর কানুয়াকে দেখতে পেয়ে ইশারায় কাছে ডাকল।

ওরা দুজন নিমেষের মধ্যে রিং-এর পাঁচিল টপকে পলানের পাশটিতে হাজির হয়ে গেল।

রোশন উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গনিরামকে একবার পরীক্ষা করে দেখার জন্য ওর মন ছটফট করছিল। ও পালস দেখতে জানে। জানে যে, ঘাড়ের পাশে কিংবা রগের কাছে এমন শিরা আছে, যেগুলো মানুষ মরে গেলে আর দপদপ করে না। ও যখন ট্যাক্সি চালাত তখন ওর এক ডাক্তারি পড়া বন্ধু এগুলো ওকে শিখিয়েছিল।

চারপাশের দর্শকরা পলানের হুকুমে প্রথমটায় চুপ করে গেলেও এখন তাদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তবে বেশিরভাগ দর্শক, যারা কোনওরকম বাজি ধরেনি, গোডাউন ছেড়ে চলে যেতে লাগল।

নিতু রোশনের কানে-কানে চাপা গলায় বলল, 'চলো, চলে যাই...।'

রোশন মাথা নাড়ল, বলল, 'না, যাব না। গনিরামের ছেলেটা ওপাশে রয়েছে না! ববিন...।'

নিতুয়া লজ্জা পেয়ে গেল। গনিরাম ওর পড়শি...কতদিনের চেনা! রোশন ওর কেউ নয়...আজই গনিকে প্রথম দেখছে। অথচ...।

পলান গনিরামের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল। ডানহাতটা ওপরে তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'আপনারা শান্ত হোন। চুপ করুন। ভয়ের কিছু হয়নি। আমাদের ফাইটার গনিরাম সেন্সলেস হয়ে গেছে। আপনারা আপনাদের বাজির টাকা বুকির কাছ থেকে রিটার্ন নিয়ে নিন।' পলান কথাগুলো বলছিল বটে, কিন্তু সেগুলো ওর নিজের কানেই কেমন ফাঁকা আওয়াজের মতো শোনাচ্ছিল। কারণ, ও গনিরামকে নিয়ে এতক্ষণ যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে তার সবক'টাতেই গনিরাম ফেল করে গেছে। পলানের গলাটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিল। কী বলবে এখন?

তেমন কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে পলান বলে উঠল, 'আপনারা সবাই যার-যার বাড়ি চলে যান। এখন আর কোনও ফাইট হবে না। আমরা গনিরামকে নিয়ে এখন হসপিটালে যাব। আর-শনিবারে আবার ফাইটের প্রোগ্রাম হবে। এবার ভিড় পাতলা করুন...চলুন, চলুন!'

রোশনের মনটা অনেকক্ষণ ধরেই কু-ডাক ডাকছিল। এবার ও আর স্থির থাকতে পারল না। একলাফে পাঁচিল টপকে একেবারে রিং-এর ভেতরে গনিরামের পাশে। তারপর পড়ে থাকা মানুষটাকে ও নানানভাবে পরীক্ষা করতে শুরু করল।

দশসেকেন্ডের মধ্যেই রোশন বুঝতে পারল ববিন ছেলেটা অনাথ হয়ে গেছে।

রোশন উবু হয়ে বসে ছিল। চোখ তুলে তাকাতেই পলানের সঙ্গে চোখে চোখ। পলান ওর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে অপেক্ষা করছে।

রোশন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল : 'গনিরাম মারা গেছে...হার্ট অ্যাটাক।'

'তা হলে তো হসপিটালে নিয়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই।' পলান নীচু গলায় বলল, 'হার্ট অ্যাটাক হবি তো হবি আমাদের ফাইট সেন্টারে!'

'ওর বডিটা এখন বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে নেওয়ার পর একজন ডাক্তারকে ডাকতে হবে—ডেথ সার্টিফিকেট লেখাতে হবে...।' রোশন উঠে দাঁড়াল।

কাটা নগেন আর কানুয়া এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হয়তো বসের কোনও হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছিল। রোশনের কথায় একটু গার্জেন টাইপের ছাপ আছে বলে কাটা নগেনের মনে হল। ও সামান্য ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'সেসব রুল পলানদা জানে। আপনাকে আর নলেজ দিতে হবে না...।' পলানের দিকে তাকাল নগেন : 'পলানদা, তোমার রুল ফলো করে কিছুক্ষণ বিফোর একেই ছানবিন করেছি। এরিয়ায় নতুন...।'

'সেটা একবার দেখেই বুঝেছি। নতুন ম্যাপ...।' পলান কথাগুলো বলল রোশনের দিকে তাকিয়ে।

'নাম রোশন। বিশ্বদার লজে উঠেছে...।' নগেন তখনও ওর তথ্যভাণ্ডার উজাড় করছিল।

'ওসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে।' রোশন পলানকে বলল, 'এখন একটু জলদি করুন। পুলিশ যদি একবার জানতে পারে গনিরাম এখানে ফাইট করার সময় মারা গেছে, তা হলে কিন্তু পুলিশ কেস হয়ে যাবে! আর ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় ডাক্তারবাবুকে দিয়ে লেখাতে হবে যে, গনিরাম বাড়িতে হার্টফেল করে মারা গেছে। এখন প্লিজ, তাড়াতাড়ি করুন—।' রোশন প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল।

'গনিরাম কোথায় থাকে রে?' পলান কানুয়াকে জিগ্যেস করল।

'ওই তো, বারো নম্বরে...রেল লাইনের ধারে...।'

রিং-এর পাঁচিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিতুর দিকে আঙুল দেখাল রোশন, 'ওই যে, নিতুদা। উনি গনিরামের পাড়ায় থাকেন—বাড়ি চেনেন।'

কাটা নগেন আর কানুয়া ঠোঁট টিপে হাসল। বোধহয় রোশনের 'নিতুদা' সম্বোধনের জন্য।

পলান নিতুয়াকে ভালো করেই চেনে। কারণ, নিতু একসময় হাইরোডের বাসে পকেটমারি আর উঠাইগিরার লাইনে ছিল।

ও পকেট হাতড়ে কয়েকটা পাঁচশো আর একশো টাকার নোট বের করে কানুয়ার হাতে দিয়ে বলল, 'যা, জলদি একটা চারশো সাত গাড়ি ধরে নিয়ে আয়। বডিটা যাবে—সঙ্গে আরও লোকজন। তুই আর নগেন মিলে কেসটা সালটে আমাদের ঠেকে চলে আয়। আর এখান থেকে বডি নিয়ে স্টার্ট দেওয়ার সময় গোডাউন ফাঁকা করে তালা মেরে দিয়ে যাবি...।'

কানুয়া ঘাড় নাড়ল।

পলান আবার বলল, 'এখান থেকে রোশন, নিতুয়া এদের গাড়িতে তুলে নিবি...ও, হ্যাঁ—আর এই বডিটা। আমি বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেলাম—।'

পলান রিং-এর বাইরে চলে গেল।

নগেনের সঙ্গে কীসব কথা-টথা বলে কানুয়া তাড়াহুড়ো করে রওনা হল।

রোশন ভাবছিল, নিয়তি কী অদ্ভুত!

আজ বিকেলে যখন ও বাস থেকে হাইরোডে নামল, তখন ও বুঝতেই পারেনি মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর একটা মৃতদেহের সামনে ও দাঁড়িয়ে থাকবে। হয়তো সেই মৃতদেহের সৎকারের আয়োজনেও ওকে শামিল হতে হবে।

অথচ সেই মানুষটাকে ও চেনে না—মানে, চিনত না!

একটা দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলের জন্য ওর খারাপ লাগছে।

ববিন। এইমাত্র ছেলেটা ওর বাবাকে হারিয়েছে। ছেলেটাকে রোশন দূর থেকে একঝলক দেখেছে মাত্র। ওর না হয়েছে কোনও কথা, না হয়েছে কোনও পরিচয়। অথচ ববিনের এখন কী হবে, সেটা ভেবেই ও অস্থির!

মনে-মনে এই ব্লাইন্ড ফাইটকে দোষ দিল রোশন। গোডাউনটায় প্রত্যেক শনিবার এরকম অদ্ভুত ফাইটের আয়োজন যদি না হত, তা হলে হাইরোডের চায়ের দোকানের মালিক যোগেনদা ওকে এই ফাইট দেখতে আসার জন্য বলতেন না।

এই ফাইটটার সত্যি কি কোনও দরকার আছে? কার উপকারে লাগছে এটা?

প্রথমত এটা পলানের উপকারে লাগছে, কারণ এটা ওর একটা রোরিং বিজনেস। আর পাবলিক? ফাইটের জুয়াতে আজ জিতছে, কাল হারছে। আজ হাসছে, কাল কাঁদছে। আর পলান যখন নিয়ম করে প্রত্যেক সপ্তাহে শুধু লাভই গোটাচ্ছে তা হলে বেশিরভাগ পাবলিকই কাঁদছে। এটা স্রেফ যোগ আর বিয়োগের অঙ্ক।

এবারে বাকি রইল শুধু ফাইটাররা। ওদের পক্ষে একটা লাভ : জিতলে লাভ বেশি, হারলে কম। কিন্তু ওরা তো অল্পবিস্তর চোট-আঘাতও পাচ্ছে। গনিরাম আজ এই ফাইটে নাম না লেখালে হয়তো আর ক'টা ঘণ্টা, কি ক'টা দিন, অথবা কয়েক সপ্তাহ বেশি বাঁচত। বাবাকে সে-ক'টা দিন বেশি পেত ববিন।

রোশনের ভেতরে এই বিচিত্র টানাপোড়েন চলছিল। চলতেই লাগল।

হঠাৎই কী হল, ও কাটা নগেনকে বলল, 'আমি একমিনিট আসছি...।'

নিতুকে হাত নেড়ে বলল, 'নিতুদা, তুমি ববিনকে তোমার কাছে নিয়ে নাও। এখনই বাচ্চাটাকে খারাপ খবরটা দিয়ো না। আমি একমিনিটের মধ্যে আসছি...।'

রোশন রিং থেকে বেরিয়ে প্রায় ছুটে গোডাউনের বাইরে চলে এল।

ওই তো, গোডাউনের বাঁ-দিকে দাঁড় করানো বাইকগুলোর মধ্যে একটা বাইকে পলান চড়ে বসেছে। বসে স্টার্ট দিচ্ছে। বাইকের হেডলাইট জ্বলছে।

বাইকটা এবার গোডাউনের দরজা পেরিয়ে খানিকটা খোলা জমি ডিঙিয়ে পিচরাস্তায় গিয়ে পড়বে।

বাইকটা এগিয়ে আসতে লাগল। এগোতে লাগল। রোশনের দিকেই আসছে। রোশনের গায়ে হ্যালোজেন হেডলাইটের আলো এসে পড়েছে।

রোশন বড়-বড় ভিজে ঘাসের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল। কলাবতীর দিক থেকে বাতাস আসছে। শরীরে যেন ঠান্ডা কিছু স্প্রে করছে কেউ।

রোশন হাত তুলে বাইকটাকে থামতে ইশারা করল। একটু ইতস্তত করে ডেকে উঠল, 'পলানদা!'

বাইকটা রোশনের সামনে এসে দাঁড়াল। পলানের ডান পা মাটিতে ঠেকানো। মোটরবাইক গরগর করছে। পলান তাকিয়ে রয়েছে রোশনের দিকে। চোখে জিজ্ঞাসা।

রোশন ইতস্তত করে বলল, 'পলানদা, একটা কথা ছিল...।'

পলান কোনও কথা বলল না—রোশনের দিকে তাকিয়েই রইল। অপেক্ষা করতে লাগল। বাইকের একটা হাতলে ঘন-ঘন মোচড় দিচ্ছিল আর বাইকটা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঁচু বা নীচু পরদায় গরগর করেই যাচ্ছিল।

কথাটা বলবে, নাকি বলবে না? রোশন দোটানায় দুলছিল। মনে কিছুটা অস্বস্তি আর আশঙ্কা থাকলেও ওর মন যে ভীষণ বলতে চাইছে কথাটা!

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল : 'এই ব্লাইন্ড ফাইটটা বন্ধ করা যায় না, পলানদা?'

প্রশ্নটা শোনার পর কয়েকসেকেন্ড চুপ করে রইল পলান। তারপর একটু হেসে বাইক ছুটিয়ে চলে গেল।

রোশন বোকা-বোকা দৃষ্টিতে সেই চলে যাওয়া দেখল।

হঠাৎই ও খেয়াল করল, গোডাউনের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নিতু। ওকে ডাকছে।

'রোশন, চলে এসো। ববিনটা বড্ড কাঁদছে। ওকে বলেছি, ওর বাবার অসুখ করেছে—তাই অজ্ঞান হয়ে গেছে। কিন্তু ছেলেটা মানছে না...কাঁদছে তো কাঁদছেই...।' কথাটা বলে নিতু আবার গোডাউনের ভেতরে ঢুকে গেল।

রোশন মুখটা নীচু করে পায়ে-পায়ে গোডাউনের ভেতরে ঢুকল।

তার কিছুক্ষণ পরেই নগেনের ফোনে কানুয়ার ফোন এল। ও গাড়ি পেয়ে গেছে। আর দু-মিনিটের মধ্যেই ও চারশো সাতটা নিয়ে গোডাউনের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

গোডাউন এখন মোটামুটি ফাঁকা হয়ে গেছে। গনিরামকে ঘিরে ছ'-সাতজন লোকের ভিড়। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ গনিরামকে চিনত।

গ্রিনরুমের ভেতরে ববিনকে কোলে নিয়ে নিতুয়া একটা বেঞ্চে বসে আছে। বাচ্চাটা প্রবল কান্নাকাটি করছে। তারই মধ্যে ভাঙাচোরা স্বরে 'বাবা! বাবা!' করছে।

রোশন নিতুয়ার কাছে গেল। বলল, 'নিতুদা, দাও, ববিনকে দাও। গাড়িটা না আসা পর্যন্ত আমি ওকে একটু নদীর পাড় থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি...।'

তারপর ববিনের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকল, 'আয়, আমার কাছে আয়...।'

ববিনকে নিয়ে গোডাউনের বাইরে বেরিয়ে এল রোশন। নদীর হাওয়া ওর চোখেমুখে এসে লাগল।

ও বুঝতে পারছিল, ওর জীবনের ভেতরে নতুন আর-একটা জীবন ধীরে-ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে।

কিন্তু ও না শেকল ছেঁড়া পথিক! সম্পর্কহীন দায়দায়িত্বহীন মানুষ! তা হলে এসব কী হচ্ছে?

নিজের কাণ্ডকারখানা দেখে রোশন নিজেই বেশ অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

'আশাপুর লজ'-এর ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল রোশন। পুবের আকাশে সূর্যের ঘুম সবে ভেঙেছে। লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে সব জায়গায়। লজের ভাঙা মলিন জীর্ণ ছাদে যেমন সেই আলো লুটিয়ে পড়েছে তেমনই

সেই আলোর আদরের ছোঁয়া রাঙিয়ে দিয়েছে ছাদের কয়েকটি টবে লাগানো ফুলগাছের সাদা ফুলগুলোকে।

ছাদের চওড়া পাঁচিলের ওপরে পাশাপাশি রাখা চারটি শ্যাওলা ধরা টব। টবের গাছে টগর, বেল, জুঁই আর গন্ধরাজ ফুল। এখন ফুলগুলো ভোরের আলোর আভা মেখে নিয়েছে, তার সঙ্গে বাতাসও।

রোশন সূর্যমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করছিল। ওর দু-হাতে দুটো আধলা ইট।

ছাদের এক কোণে জড়ো করে রাখা আট-দশটা ইট। তার কোনওটা গোটা, কোনওটা আধলা। তবে সবগুলোই ময়লা এবং শ্যাওলা মাখা। সেখান থেকে দুটো জুতসই আধলা ইট বেছে নিয়ে রোশন ব্যায়াম করছিল। রোজ সকালে আধঘণ্টা ব্যায়াম করাটা ওর অভ্যেস। ব্যায়ামের কোনও সরঞ্জাম ওর লাগে না। যেখানে যেমন জিনিস জোটে সেগুলোকেই কাজে লাগিয়ে নেয়। কখনও ইটের টুকরো, কখনও এক লিটার কি দু-লিটার জলভরা প্লাস্টিকের বোতল, কখনও বা ঢালাইয়ের রড, কিংবা স্রেফ বালি।

রোশনের গায়ে ছাই রঙের শর্টস আর সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। একটু দূরে ছাদের মেঝেতে রয়েছে ওর হাতঘড়ি আর ছোট ট্রানজিস্টর রেডিয়ো। রেডিয়োতে কোনও একটা এফ-এম চ্যানেলে গান বাজছে। সেটা রোশনের ব্যায়ামের রিদম-এর কাজ করছে।

'আশাপুর লজ' বাড়িটা বেশ পুরোনো। মাঝারি মাপের দোতলা বাড়ি—তার তিনতলায় ছাদ। বাড়িটার পাশে বড় মাপের একটা ফাঁকা জমি খাটো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। হয়তো কোনও এককালে কেউ কিনে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। তবে জমিটা এখন আর ঠিক ফাঁকা নেই—এলোমেলো গাছপালা আর আগাছায় ভরতি। এ ছাড়া রয়েছে একটা দরমার ঘর। ঘরটা জমির একটু ভেতরদিকে।

দরমার ঘরটা ছাড়াও জমিটার ডানদিকের কোণ ঘেঁষে একটা ছোট্ট মন্দির রয়েছে। মন্দিরটার উচ্চতা বড়জোর ফুটচারেক হবে। তার চারচালা চুড়োটা লাল রঙের, বাকি দেওয়ালগুলো সাদা। মন্দিরটা দেখে অবহেলায় পরিত্যক্ত বলে মনে হলেও সেখানে মাঝে-মাঝে ফুল-টুল পড়ে, ধূপকাঠিও জ্বলে।

মন্দিরের ভেতরে হনুমানজির একটি ছোটখাটো মূর্তি আছে। তার চারপাশে ছড়িয়ে আছে কিছু শুকনো ফুল, আর একটা মাটির থালায় রয়েছে দু-একটা বাতাসা, কয়েকটা নকুলদানা। সেখানে ঘোরাফেরা করছে ছোট-ছোট কালো পিঁপড়ে।

এই ছোট্ট নগণ্য মন্দিরটাকে সবাই বলে হনুমানজির মন্দির। আর গাছপালা, আগাছায় ভরা ফাঁকা জমিটাকে বলে 'হনুমানজির মাঠ'। মাঠের দরমার ঘরটায় সারাদিনে কেউ আসে না। শুধু কোনও-কোনও রাতে ওই ঘরটায় আলো জ্বলতে দেখা যায়। তখন পলান আর পলানের দলবল ওই ঘরটা ব্যবহার করে।

ব্যায়াম শেষ করে আধলা ইট দুটো জায়গা মতো রেখে দিল রোশন।

তারপর প্যান্টে হাত ঘষে নিয়ে ছাদে পায়চারি করতে লাগল। ওর স্যান্ডো গেঞ্জি ঘামে ভিজে গেছে। তার ওপরে বাতাসের ছোঁয়ায় ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব।

এর মধ্যে আশাপুরে রোশনের চার-চারটে রাত কেটে গেছে। প্রতিদিন ভোরে ও লজের ছাদে ওঠে ব্যায়াম করার জন্য। তখন ও ঘুমিয়ে থাকা আশাপুরকে দেখতে পায়। ঠিক যেন একটা বাচ্চা ছেলে—মুখে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। তারপর একসময় বাচ্চাটার ঘুম ভাঙে।

যত দিন গড়ায় বাচ্চাটা ততই বড় হয়ে ওঠে। তারপর সন্ধ্যা নামে। বাচ্চাটা ক্রমশ দুরন্ত হয়, দুষ্টু হয়।

ধীরে-ধীরে রাত আসে। দুষ্টু বাচ্চাটাও তার সঙ্গে-সঙ্গে বদমায়েশ হয়ে ওঠে। তারপর রাত বাড়তেই বাচ্চাটা শয়তানে বদলে যায়। এ ক'দিনে রোশন এই বদলে যাওয়ার নানান ইশারা পেয়েছে।

ছাদের পাঁচিলের কাছে এসে রোশন হনুমানজির মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল। গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়ে দরমার ঘর, হনুমানজির মন্দির অল্পস্বল্প দেখা যাচ্ছিল। রোশন আনমনে এসব দেখছিল আর আশাপুর নামের বাচ্চাটার আজব রূপান্তরের কথা ভাবছিল।

কাকের ডাক কানে আসছিল অনেকক্ষণ ধরেই। কালো-কালো পাখিগুলোকে দেখাও যাচ্ছিল। এখন হনুমানজির মাঠের এই গাছপালার দিকে তাকিয়ে রোশন অন্যরকম কয়েকটা রঙিন পাখি দেখতে পাচ্ছিল।

বাঁশপাতি, বসন্তবৌরি, বেনেবউ। গাছের ডালে, গাছের পাতার ফাঁকে বসে আছে। কখনও বা এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে।

দোয়েলের শিস শুনতে পাচ্ছিল রোশন। দেখতে পাচ্ছিল টুনটুনির ছটফটে লাফালাফি।

এই পাখিগুলো আশাপুরকে অনেক সুন্দর করেছে। কিন্তু দরমার ঘরটার দিকে তাকিয়ে রোশনের কপালে ভাঁজ পড়ল। এই দরমার ঘরটা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা শুনেছে তাতে ঘরটা কর্কশ ডাকওয়ালা কালো-কালো পাখিগুলোর চেয়ে কিছু কম খারাপ নয়।

আকাশের দিকে চোখ তুলল রোশন। এর মধ্যেই সূর্যের আলো অনেকটা বেড়ে গেছে—আর তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না লাল বলটার দিকে। আলোর সঙ্গে বেড়ে গেছে তেজও।

এবার নীচে নামতে হবে। স্নান-টান সেরে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য বাইরে বেরোতে হবে। ব্রেকফাস্ট মানে লুচি-তরকারি। লজ থেকে বেরিয়ে বাঁ-দিকে এক-দু-মিনিট পা চালালেই মিষ্টির দোকান 'মোহন সুইটস'। সেখানে মিষ্টির পাশাপাশি শিঙাড়া, নিমকি, লুচি-তরকারি এসব পাওয়া যায়। এই কয়েকটা দিন রোশন ব্রেকফাস্টের ব্যাপারটা 'মোহন সুইটস'-এই সেরেছে। দোকানের মালিকের সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ-টালাপও হয়েছে।

হাতঘড়ি আর রেডিয়োটা ছাদের মেঝে থেকে তুলে নিল রোশন।

রেডিয়ো অফ করে সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নামতে লাগল। সাবধানে, কারণ সিঁড়ির ধাপগুলো ক্ষয়াটে, ছাল ওঠা, এবং একটার সঙ্গে একটার মাপের মিল নেই।

ঠিক তখনই আওয়াজটা শুনতে পেল।

শক্ত কোনও জিনিসের সঙ্গে শক্ত আর-একটা জিনিসের সংঘর্ষের শব্দ।

কয়েকসেকেন্ড পর শব্দটা শোনা গেল আবার।

রোশন একটু তাড়াতাড়ি নামতে চেষ্টা করল। আন্দাজে বুঝতে পারল আওয়াজটা আসছে একতলা থেকে।

'আশাপুর লজ'-এ রোশনকে নিয়ে বোর্ডার এখন মাত্র তিনজন। এবং এই তিনজনেরই থাকার ঘর দোতলায়। একতলায় শুধুমাত্র বিশ্বরূপবাবু থাকেন। এ ছাড়া কলতলা, বাথরুম, দুটো ছোট মাপের স্টোর রুম, আর রাস্তার দিকের একটা ঘর। সেটা রোশন সবসময় তালাবন্ধই দেখেছে। বিশ্বরূপবাবুকে ও জিগ্যেস করেছিল ওটাও স্টোর রুম কি না। তাতে উত্তর পেয়েছে, 'না, ওটা স্টোর রুম নয়—তবে বলতে পারেন স্টোর রুম টাইপেরই কিছু...।'

ব্যাপারটা রোশনের কাছে স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু তাই বলে আর কিছু জিগ্যেসও করেনি। কিন্তু পরে জেনেছে, ওই ঘরটা পলানরা ব্যবহার করে। ও-ঘরে পলানদের আর্মস থাকে। আবার কখনও-কখনও ওরা সেখানে আড্ডা দেয়, জুয়া খেলে।

দোতলায় নেমে রোশন দেখল একজন বোর্ডার একতলার আওয়াজ শুনে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ফরসা, বেঁটে, গোলগাল মুখ। ঠোঁটের ওপরে টুথব্রাশ গোঁফ। পরনে শুধু নীল রঙের একটা লুঙ্গি এবং কিছুটা মলিন হয়ে যাওয়া পইতে। কাঁচা ঘুম ভেঙে বুকে-পেটে হাত বোলাতে-বোলাতে বেরিয়ে এসেছে। কপালে বিরক্তির ভাঁজ। মাথার চুল এলোমেলো খোঁচা-খোঁচা।

ভদ্রলোকের সঙ্গে একদফা আলাপ হয়েছে রোশনের। কিন্তু কী যেন নামটা? এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

বিশ্বরূপ জোয়ারদারের লজটা বেশ পুরোনো আমলের বাড়ি। বাড়িটার সারা গা ছাল-টাল ওঠা হলেও মামুলি সাদা চুন রং করে চেহারা ফেরানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বাড়ির ভেতরে চৌকো উঠোন। তারই একপাশে চৌবাচ্চা, কলতলা, বাথরুম। উঠোনের মেঝেতে মাকড়সার জালের মতো ফাটল। আর কলতলার কাছটা শ্যাওলা ধরা।

দোতলায় রেলিং ঘেরা চৌকো বারান্দা—ঠিক উঠোনের মাপে। রেলিং বলতে সরু-সরু লোহার শিক। আর শিকের মাথায় রং-পালিশ চটে যাওয়া কাঠের আড়া। সেই আড়ার ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ফরসা বোর্ডারটি

একতলার শব্দের উৎস খোঁজার চেষ্টা করছে।

সিঁড়ি নামার সময় তার সঙ্গে রোশনের চোখাচোখি হয়েছে। বোর্ডার ভদ্রলোক রোশনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ভুরু উঁচিয়ে ইশারায় জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার?'

উত্তরে রোশন ঠোঁট ওলটাল শুধু।

ঠিক তখনই ও তৃতীয় শব্দটা শুনতে পেল। একটা জোরালো সংঘর্ষের শব্দ। আর তার পরেই কাচভাঙার ঝনঝন শব্দ।

রোশন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি নামতে লাগল।

একতলায় বাইরের ঘরে এসে যে-দৃশ্যটা ও দেখল তাতে অবাক হয়ে গেল।

'আশাপুর লজ' আসলে বিশ্বরূপ জোয়ারদারের বাপ-ঠাকুরদার বাড়ি। সেই বাড়িটায় থাকার কেউ ছিল না—একমাত্র বিশ্বরূপ ছাড়া। তাই একসময় ওঁর মনে হয়েছে, এই বাড়িতে একা-একা থাকার চেয়ে এটাকে লজে পালটে দিলে হয়। তাতে নতুন-নতুন লোকজনের সঙ্গে পরিচয় হবে, কথাবার্তা বলে বেশ সময় কাটবে, আর তার সঙ্গে টুকটাক ব্যাবসাও করা যাবে।

আশাপুরের 'মহামায়া কটন মিল' বেশ চালু মিল। সেই মিলটাকে ঘিরে নানারকমের কাজকারবারের পত্তন হয়েছে আশাপুরে। সেই সূত্রে বাইরে থেকে বেশ কিছু ছোট-বড় ব্যবসায়ী আশাপুরে আসে। দু-এক দিনের জন্য মাথা গোঁজার জায়গা খোঁজে।

এ ছাড়া আশাপুরের গান্ধীমাঠের কাছে প্রায় বিশ-পঁচিশটা লেদ কারখানা আছে। তাদের লেদ মেশিন, শেপার মেশিন, মিলিং মেশিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে। সবসময় ইস্পাতের নানান ছাঁদের কাটাকুটি নিয়ে তারা ব্যস্ত। তাকে ঘিরে গজিয়ে উঠেছে লোহার বাবরি বা ছাঁটের ব্যাবসা। ছোট কিংবা বড় লরিতে লোড হয়ে টন-টন বাবরি চালান যায় দূরে-দূরে।

এই সব ব্যবসা ঘিরেও বাইরের লোকের আসা-যাওয়া আছে আশাপুরে। তাদের কেউ-কেউ এসে ওঠে বিশ্বরূপ জোয়ারদারের লজে। দু-চারটে দিন কাটিয়ে যায়। লজে খাওয়াদাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। তবে কাছাকাছি অনেক খাওয়ার দোকান আছে। ভাতের হোটেলও।

'আশাপুর লজ'-এর একটা বড় গুণ আছে : খুব সহজেই বোর্ডারদের আপন করে নিতে পারে। এর কারণ, বিশ্বরূপ জোয়ারদারের ব্যবহার। সদালাপী মানুষটির মুখে সবসময় চওড়া হাসি। তার ওপর রয়েছে লজের সুবিধেজনক পকেটসই রেট। ফলে, বিশ্বরূপ জোয়ারদারের লজ কখনও একেবারে খালি যায় না। সারা বছর ধরে টুকটাক ব্যাবসা চলতেই থাকে।

লজের বাইরে একটা মাঝারি মাপের সাইনবোর্ড আছে। সেটার রং-টং চটে গেলেও 'আশাপুর লজ' শব্দ দুটো পড়া যায়। তার নীচে একটা ছোট বোর্ড লাগানো আছে। তাতে লেখা 'প্রোঃ বিশ্বরূপ জোয়ারদার, বি.এ.'। বিশ্বরূপবাবুদের বংশে তিনি ছাড়া কেউ গ্র্যাজুয়েট হতে পারেনি। তাই সাইনবোর্ডে তাঁর লেখাপড়ার সাফল্যের ওরকম বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

সদর দরজা ডিঙিয়ে লজে ঢুকলেই একটা বড়সড় লম্বাটে ঘর। তার বাঁ-দিকে একটা বড় কাঠের টেবিল। টেবিলের ওপারে যে-হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ারটা রাখা আছে সেটাতে বিশ্বরূপবাবু বসেন। ওঁর মাথার পিছনে দেওয়াল জুড়ে একটা বড় ইংরেজি ক্যালেন্ডার। একপৃষ্ঠা জুড়ে বারো মাসের তারিখ ছাপা। ক্যালেন্ডারটার পাশে ফ্রেমে বাঁধানো তিনটে সাদা-কালো ফটোগ্রাফ। ফটোগুলো এতই পুরোনো যে, ফটোর মানুষগুলোর চেহারা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। এ ছাড়া বিশ্বরূপের টেবিল-চেয়ার দুটোর অবস্থাও তাই। হদ্দ পুরোনো হওয়ায় কাঠের রং মোটামুটিভাবে গাঢ় খয়েরি হয়ে গেছে। তার ওপর এখানে-ওখানে হাফডজন ফাটল তো আছেই।

তিনটে ফটোর নীচে পাশাপাশি দাঁড় করানো রয়েছে দুটো শো-কেস। সে-দুটোর বয়েস এত বেশি যে, স্লাইডিং পাল্লার কাচগুলো ময়লার দাপটে ঘষা কাচের চেহারা নিয়েছে। ফলে ভেতরে ঠিক যে কী-কী জিনিস

রাখা আছে সেটা বোঝা বেশ শক্ত।

টেবিলে পড়ে আছে একটা জাবদা খাতা আর একটা বাংলা খবরের কাগজ। খবরের কাগজটার অবস্থা দেখে বোঝা যায় ওটা অনেকে অনেকবার পড়েছে। কারণ, ওটা গতকালের কাগজ। আজকের কাগজ এখনও আসেনি—আসার সময় হয়নি।

বিশ্বরূপ জোয়ারদারের চেয়ারের উলটোদিকে দুটো হাতল ছাড়া ছাই রঙের প্লাস্টিকের চেয়ার। বোর্ডারদের বসার জন্য। আর মালিক এবং অতিথিদের হাওয়া সাপ্লাই করার দায়িত্ব নিয়েছে একটা জোব চার্নকী সিলিংফ্যান। মাথার ওপরে হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘুরছে এবং তার কাতরানির শব্দও শোনা যাচ্ছে।

ঘরের ডানদিকে দুটো বেঞ্চি পাতা। সেগুলোর এমনই দশা যে, অনায়াসে তাদের হেরিটেজ আইটেম বলা যায়। তারই একটার ওপরে বেশ কয়েকটা বিছানার চাদর আর তিনটে বালিশ থাকে-থাকে সাজানো রয়েছে।

এই ঘরটাকে এককালে জোয়ারদার পরিবারের লোকরা 'বাইরের ঘর' বলে ডাকত। আজ ঘরটার পরিচয় 'আশাপুর লজ'-এর 'রিসেপশন রুম'।

সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে একতলায় নেমে এসেছে রোশন। তারপর ঢুকে পড়েছে 'বাইরের ঘর' অথবা রিসেপশন রুমে। এবং অবাক হয়ে গেছে। কারণ, ঘরের দৃশ্যটা সাধারণত যেরকম দেখতে ও অভ্যস্ত এখন সেরকম ছিল না।

দুটো ছেলে বিশ্বরূপবাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের একজনের হাতে একটা হকি স্টিক। আর-একজন বিশ্বরূপ জোয়ারদারের কলার চেপে ধরে ভীষণভাবে ঝাঁকাচ্ছে। একটা শো-কেসের দুটো পাল্লাই আর নেই—তার বদলে মেঝেতে ভাঙা কাচ ছড়িয়ে আছে।

হকি স্টিক হাতে ছেলেটা স্টিকটা মাথার ওপরে তুলল। দেওয়ালের ফটোগুলো তাক করে অস্ত্রটা চালাল।

রোশন একলাফে পৌঁছে গেল ছেলেটার পিছনে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় গতিশীল স্টিকটাকে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল।

সিঁড়ি নামতে-নামতে রোশন হাতঘড়িটাকে শর্টস-এর পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু ট্রানজিস্টর রেডিয়োটা বাঁ-হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছিল। তাই হকি স্টিকের আঘাত থেকে বিশ্বরূপদাকে বাঁচানোর সময় শুধুমাত্র ডানহাতটাই ও ব্যবহার করতে পেরেছিল।

হকি স্টিকটা রোশন পিছন থেকে আচমকা চেপে ধরায় আক্রমণকারী ছেলেটি পিছনে টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিল। ওর শরীরটা আধপাক ঘুরে পেন্ডুলামের মতো এপাশ-ওপাশ দুলে উঠল দুবার। তারপর স্থির হল। কিন্তু ওর শরীরের ধাক্কায় একটা প্লাস্টিকের চেয়ার উলটে পড়ে গেল।

হকি স্টিকটা রোশনের হাতে চলে এসেছিল। একইসঙ্গে ও চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'থামো! থামো! কী হচ্ছে এসব! থামো বলছি!'

ছেলেটা থমকে গেল। রোশনের দিকে রক্ত-চোখে তাকিয়ে রইল। যেন এখুনি ওর ওপরে হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় ছেলেটা ঝাঁকুনির কাজটা থামালেও বিশ্বরূপ জোয়ারদারের কলারটা এখনও খামচে ধরে আছে।

এই দুটো ছেলেই রোশনের অচেনা। শনিবার রাতে ব্লাইন্ড ফাইটের সময় দুটোর একটাকেও ও দেখেনি।

প্রথম ছেলেটার গায়ের রং কালো। মাথায় ছোট-ছোট চুল। গাল দুটো ডুমো-ডুমো। নাকটা বেশ লম্বা। সামনের দাঁতগুলো এত উঁচু যে, দাঁতের মাজনের জোরালো বিজ্ঞাপনের মডেল হতে পারে। পোশাক বলতে একটা কালো হাফশার্ট, আর ময়লা জিনসের প্যান্ট। পায়ে সস্তা চটি।

দ্বিতীয় ছেলেটা এখন বিশ্বরূপদার কলার ছেড়ে দিয়েছে। রোশনের দিকে ভুরু কুঁচকে কুতকুতে চোখে তাকিয়ে আছে।

ছেলেটার গায়ের রং মাঝারি। কাঁধ চওড়া। গাল ভাঙা। শৌখিন গোঁফ। দু-কানে স্টিলের মাকড়ি। গাঢ় নীল রঙের একটা রাউন্ড নেক টি-শার্ট পরে আছে। পায়ে বাদামি রঙের কর্ডের প্যান্ট। পায়ে কালো রঙের চপ্পল।

রোশন ধীরে-ধীরে বলল, 'বিশ্বরূপদার গায়ে হাত দেবে না। ওঁর কাছ থেকে সরে যাও।' মাথা ঝাঁকিয়ে সরে যাওয়ার ইশারা করল।

রোশনের গলার স্বর ঠান্ডা, কিন্তু তার মধ্যে একটা আদেশের ছোঁয়া ছিল।

দ্বিতীয় ছেলেটা রোশনের হাতের হকি স্টিকটার দিকে একপলক তাকাল। তারপর খানিকটা অনিচ্ছার ভাব নিয়ে বিশ্বরূপ জোয়ারদারের কাছ থেকে একটু পিছিয়ে দাঁড়াল।

প্রথম ছেলেটা রোশনকে সশস্ত্র দেখেও ঘাবড়াল না, পাত্তাও দিল না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'তুই কে রে? কোন হরিদাস? ফোট এখান থেকে! এটা আমাদের পার্সোনাল কেস—আমরা নিজেরা মিটিয়ে নেব। চ্যাল-চ্যাল, ফোট!'

দ্বিতীয় ছেলেটা বলল, 'তুই বাইরের পাবলিক—আমাদের কেসে নাক গলালে নাক কেটে দেব—।' হাতের পাঞ্জা দিয়ে কেটে দেওয়ার ইশারা করল দ্বিতীয়।



প্রথম ছেলেটা হঠাৎ কী ভাবল কে জানে! রোশনের মুখ লক্ষ্য করে আচমকা ঘুসি চালাল। ও ভেবেছিল হকি স্টিক দিয়ে পালটা আঘাত করে ওঠার আগেই ঘুসিটা রোশনের মুখে গিয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় ছেলেটাও মোটামুটিভাবে একইরকম ভেবেছিল। হয়তো বিশ্বরূপ জোয়ারদারও তাই।

কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা ঘটল অন্যরকম। বাঁ-হাতে ধরা রেডিয়োটা এক নিমেষে চলে এল প্রথমের ঘুসির গতিপথে। যথারীতি সংঘর্ষ হল। কিন্তু তার শব্দ তেমন জোরালো হল না। তবে রেডিয়োটা হঠাৎই বাজতে শুরু করল। মাতাল করা এক মিউজিক ভেসে বেড়াতে লাগল রিসেপশনে।

আক্রমণকারী ছেলেটা শক খাওয়ার ভঙ্গিতে ডানহাতটা ঝট করে পিছিয়ে নিল। ওর মুখ কুঁচকে গেল যন্ত্রণায়।

রোশন বলল, 'বাইরের পাবলিক হলে কি অন্যায় দেখলে বাধা দেওয়া বারণ? বিশ্বরূপদার সঙ্গে যা কিছু গোলমাল সব আলোচনা করে মিটিয়ে নাও—গায়ে হাত-টাত তুলে নয়।' কথা বলতে-বলতে রোশন হকি স্টিকটা বেঞ্চিগুলোর দিকে ছুড়ে ফেলে দিল : 'তোমরা চেয়ারে বোসো। বসে কথা বলো—।'

রোশনের কথার উত্তরে ছেলে দুটো কোনও কথা বলল না। চেয়ারে বসলও না। ওদের মুখ-চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ওরা ভেতরে-ভেতরে ফুঁসছে। রোশনের হাতে এখন হকি স্টিক নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা ঠিক করে উঠতে পারছে না রোশনকে এখন অ্যাটাক করা যায় কি না। বোধহয় রোশনের স্যান্ডো গেঞ্জির আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকা পেশির দল ওদের ধন্দে ফেলে দিয়েছিল।

রোশন রেডিয়োটা একবার দেখল। ওপরের রুপোলি রঙের প্লাস্টিক কভারটা আড়াআড়ি ফেটে গেছে। তা ছাড়া একটা ছোট তেকোণা টুকরো খসেও পড়েছে মেঝেতে।

রেডিয়োর পিছনদিকের অন-অফ সুইচটাকে খুটখাট শব্দ করে বারকয়েক নাড়াচাড়া করল, যদি ওটাকে অফ করা যায়। কিন্তু না, তাতে কোনও কাজ হল না। তখন ভলিয়ুমের রোলার সুইচটাকে নিয়ে পড়ল। আবারও রেজাল্ট জিরো।

এই কাজগুলো করতে-করতেই ও বিশ্বরূপদাকে বলল, 'কী, বিশ্বরূপদা, ঠিক বলেছি না?'

বিশ্বরূপ জোয়ারদার বড়-বড় শ্বাস ফেলছিলেন। গলায় হাত বোলাচ্ছিলেন। রোশন ঠিক সময়ে না এসে পড়লে আরও কত হেনস্থা সহ্য করতে হত কে জানে!

এখন তিনি অবাক-বিহ্বলভাবে রোশনকে দেখছিলেন। ওর প্রশ্নের অর্থ প্রথমটায় ধরতে পারলেন না। তাই পালটা জিগ্যেস করলেন, 'কী বলো তো?'

'না, বলছিলাম যে, কোনও আলোচনা থাকলে সেটা বসে ঠান্ডা মাথায় সেরে ফ্যালো।' ছেলে দুটোর দিকে তাকাল এবার : 'জামার কলার খামচে ধরে, হকি স্টিক হাতে নিয়ে ভদ্রলোকরা কখনও আলোচনা করে না — ছোটলোকরা করে। তোমরা কি ছোটলোক?'

ছেলে দুটোকে একটু বিভ্রান্ত বলে মনে হল। ওরা ঠিক ধরতে পারছিল না রোশনের কথাবার্তা কোনদিকে এগোচ্ছে।

রেডিয়োটা ডানহাতে নিল রোশন। ওদের কাছে এগিয়ে এল। নীচু গলায় বলল, 'নাও, এবার চট করে বসে পড়ো—।'

ছেলে দুটো দাঁড়িয়েই রইল। অপছন্দের চোখে রোশনকে দেখতে লাগল।

রোশন বিশ্বরূপ জোয়ারদারের দিকে তাকাল : 'দাদা, আপনি অ্যাট লিস্ট বসুন। তারপর বলুন, কী ব্যাপার। এরা সাতসকালে আপনার গেস্টহাউসে এসে এরকম জানোয়ারের মতো উৎপাত করছে কেন?'

প্রথম ছেলেটা বিশ্বরূপদার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলে উঠল : 'বিশ্বদা, আমরা এখন যাচ্ছি। কেসটা রিপোর্ট করে দিচ্ছি। বাইরের পাবলিকের চাটাচাটি আমরা টলারেট করব না। আপনি শালা ফিকিরবাজি করে আমাদের বারবার ঘোরাচ্ছেন—কিন্তু ওসব করে কোনও লাভ নেই। আমরা আবার আসব...।'

এ-কথা বলে ছেলে দুটো চলে গেল। যাওয়ার আগে রোশনকে চোখ দিয়ে মেপে গেল। সদর দরজাটা বিকট আওয়াজে 'দড়াম' করে খুলে এবং বন্ধ করে ওদের রাগের রিখটার স্কেলের ম্যাগনিটিউডের আইডিয়া দিয়ে গেল।

হকি স্টিকটা বেঞ্চির কাছে মেঝেতে চুপচাপ শুয়েই রইল।

'আশাপুর লজ'-এর রিসেপশনে এখন শব্দ বলতে শুধু মাথার ওপরে ঘুরতে থাকা পুরোনো সিলিংফ্যানটার কাতরানির শব্দ, আর রোশনের বিকল রেডিয়োর মিউজিক। মিউজিকটা তখন থেকে এমন একঘেয়েভাবে বেজে চলেছে যে, এখন রীতিমতো বিরক্তিকর লাগছে।

আওয়াজটা বন্ধ করার জন্য রোশন রেডিয়োটাকে শূন্যে কয়েকবার জোরালো ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু কোনও লাভ হল না। তখন বিরক্তির একটা শব্দ করে ও বেঞ্চির কাছে চলে গেল। থাকে-থাকে রাখা দুটো বালিশের

মাঝে রেডিয়োটা গুঁজে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে কেউ যেন আওয়াজটার গলা টিপে ধরল।

আবার বিশ্বরূপদার সামনে এসে দাঁড়াল রোশন। নরম গলায় বলল, 'দাদা, বসুন। একটু খুলে বলুন তো, ব্যাপারটা কী...।'

বিশ্বরূপ জোয়ারদার ধীরে-ধীরে নিজের চেয়ারে বসলেন। রোশন লক্ষ করল, ওঁর রোগা হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে।

মেঝেতে ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাচের টুকরো। সাবধানে পা ফেলে রোশন উলটে পড়া প্লাস্টিকের চেয়ারটার কাছে গেল। সেটাকে সোজা করে তারপর টেনে নিয়ে বিশ্বরূপদার মুখোমুখি বসল। ওঁর কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'শোনো, রোশন—আসল ব্যাপারটা হল টাকা। প্রতি সপ্তাহে ওদের হাজার টাকা করে দিতে হবে। এই হল ওদের ডিমান্ড। আগে পাঁচশো টাকা করে দিতাম—দু-সপ্তাহ হল টাকাটা ওরা বাড়িয়েছে। বাড়িয়ে হাজার টাকা করেছে। সেটা প্রতি সপ্তাহে কোত্থেকে জোগাড় করব? আমার লজ কি সেরকম চলে?'

' ''ওরা'' মানে কারা?'

'কারা আবার? ওই পলান নামে শয়তানটার চ্যালা-চামুণ্ডা গুন্ডা...।'

আবার সেই পলান! গোডাউনের ব্লাইন্ড ফাইট গেম শো-র 'চেয়ারম্যান'!

'আপনি টাকা দেন কেন?'

'ভয়ে।'

'ওদের ভয় পাওয়ার কী আছে?' রোশন অবাক হয়ে জানতে চায়।

'ভয় পাওয়ার কী আছে মানে?' বিশ্বরূপ পালটা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন অবাক হয়ে যাওয়া বছর সাতাশ-আটাশের ছেলেটার দিকে। এ-ছেলেটা কি 'তোলা' ব্যাপারটার কথা লাইফে শোনেনি?

বিশ্বরূপ শার্টের খুঁট দিয়ে মুখ মুছলেন। টেবিলে রাখা জাবদা খাতাটাকে অকারণেই একপাশ থেকে আর-একপাশে সরালেন। মুখ দেখে মনে হল, কী বলবেন সেটা ভাবছেন। হয়তো আরও ভাবছেন, কতটুকু বলবেন।

রোশন 'আশাপুর লজ'-এর মালিককে দেখছিল।

মানুষটার চেহারা একেবারেই নিরীহ। দেখে বোঝা যায়, গায়ের রং এককালে ফরসা ছিল, সময়ের চাপে তামাটে হয়ে গেছে। বয়েস খুব বেশি হলে পঞ্চাশ-বাহান্ন। লম্বায়-চওড়ায় বেশ খাটোই বলতে হবে। মাথার চুল পাতলা হয়ে জমি দেখা যাচ্ছে। চুলে অল্পবিস্তর পাক ধরেছে। ছোট কপাল। কপালের বাঁ-দিক ঘেঁষে কালির ছিটের মতো তিন-চারটে তিল। চোখে প্লাস্টিক ফ্রেমের চশমা। চশমার নীচে ছোট নাক। নাকের নীচে সরু গোঁফ। এ ছাড়া পাতলা ঠোঁটের প্রান্ত দুটো ওপরদিকে সামান্য বাঁক নিয়ে শেষ হওয়ায় মনে হয় যেন বিশ্বরূপদা সবসময় হাসছেন।

গত তিনদিনে ওঁর সঙ্গে রোশনের ভালোমতোই আলাপ-পরিচয় হয়েছে। একসময় 'আশাপুর লজ'-এর এই বাড়িটায় বিশ্বরূপ জোয়ারদারদের একান্নবর্তী পরিবার বাস করত। লোকজনের কথাবার্তা চলাফেরায় বাড়িটা সরগরম থাকত। তারপর সময়ের স্রোতে সবাই একে-একে নানানদিকে ছিটকে গেছে। কেউ চাকরি নিয়ে দেশান্তরী হয়েছে, কেউ ভাগ্য ফেরাতে শহরে পাড়ি দিয়েছে। আবার কেউ বা অকালেই ঈশ্বরের প্রিয় হয়ে গেছে। এইভাবে ভাগচক্রে ভাগ-ভাগ হয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বরূপ জোয়ারদার ভাগশেষ হয়ে পড়ে আছেন। একেবারে একা। ওঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব বলতে শুধুই লজের বোর্ডাররা।

লজের মালিককে খুঁটিয়ে দেখছিল রোশন। অপমানের ঝাপটায় কানদুটো এখনও লাল হয়ে আছে। রোশনের চোখে চোখ পড়লেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছেন। এমন একটা ভাব যেন পারলে নিজের শরীরের ভেতরেই লুকিয়ে পড়তে চান।

রোশনের খুব খারাপ লাগছিল। বিশ্বরূপদার হেনস্থা, অপমান, লজ্জা—এসব ও দেখতে চায়নি। হয়তো অনেকদিন ধরেই এ ধরনের ব্যাপার চলছে। এবং 'চলছে, চলবে'—এটাই যেন একমাত্র স্লোগান।

'কী হল, বলুন—ভয় পাওয়ার কী আছে?' রোশনের প্রশ্নের ঢংটা এমন যেন লাস্ট বেঞ্চের দুর্বল ছাত্রকে শাসাচ্ছে।

বিশ্বরূপ জোয়ারদার অতি কষ্টে রোশনের চোখে চোখ মেলালেন।

কোনওরকমে মিনমিন করে জবাব দিলেন, 'ওরা সবসময় মারধোরের ভয় দেখায়। ওদের কাছে ছোরা, রিভলভার, বোমা—সব আছে...।'

'আছে। কিন্তু ওরা তো মাত্র দশ-বারো-চোদ্দোজন। আর আপনারা তো সংখ্যায় অনেক।'

'আপনারা মানে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন বিশ্বরূপ।

'আপনারা মানে আপনারা—আশাপুরের লোকজন, আশাপুরের মানুষ...।'

'মানুষ!' হতাশায় বিষণ্ণ হাসলেন বিশ্বরূপ : 'আমরা মানুষ হলে তো হয়েই যেত!'

'আপনার থেকে যে উইকে হাজার টাকা করে চাইছে এ-কথা আর কেউ জানে না?'

'জানে—সবাই জানে। কিন্তু জানলে কী হবে? সবাই তো টাকা দেয়!'

'ব্যাপারটা তো তোলাবাজি ছাড়া আর কিছু না!'

মাথা নীচু করলেন বিশ্বরূপ জোয়ারদার। আক্ষেপের শব্দ করে হাসলেন : 'না রোশন—তোলাবাজি বোলো না। বলো, প্রোটেকশন মানি। রেগুলার এই টাকাটা দিলে আমার লজের কোনও ক্ষতি হবে না—কেউ এটার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। বোঝো অবস্থা!'

'আর কারা-কারা এরকম টাকা দেয়?'

'বললাম যে—সবাই। প্রত্যেকটা দোকানদার—এমনকী চায়ের দোকান, পানের দোকান, রোল-চাউমিনের দোকান—কেউ বাদ নেই। এক-একজনের রেট এক-একরকম। কী বলব তোমাকে...ফুটপাথে বসে যে দোক্তাপাতা বেচে তাকেও পলানের প্রোটেকশন মানি দিতে হয়।'

'চমৎকার!' রোশন মুখের ভেতরে একটা তেতো স্বাদ টের পেল।

'তুমি ওদের আটকাতে চেষ্টা করে ভালো করোনি। ওরা ফিরে আসবে—একটু পরে, কি আরও অনেক পরে...।'

'কিন্তু বিশ্বরূপদা, আমি তো ওদের কাউকে মারিনি! শুধু থামাতে চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া একটা ছেলে তো আপনার গায়ে হাত তুলেছিল! আপনাকে মারধোর করছিল...।'

বিশ্বরূপ জোয়ারদার রোশনকে বাধা দিয়ে বললেন, 'মারধোর আর কোথায়! জামার কলারটা ধরে একটু ঝাঁকাচ্ছিল শুধু—।' কথাটা বলার সময় রোশনের চোখে চোখ মেলাতে পারলেন না—চোখ সরিয়ে নিলেন।

রোশন অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটা বলছে কী! 'কলারটা ধরে একটু ঝাঁকাচ্ছিল শুধু'!

রোশনের মনে তর্ক করার জেদ তৈরি হল। ও বলল, 'আর হকি স্টিক দিয়ে যে ভাঙচুর চালাচ্ছিল? সেটা কী ব্যাপার?' ইশারায় ভাঙা শো-কেস আর মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা কাচের টুকরোগুলো দেখাল।

'দ্যাখো, ওরা ছোট ছেলে। বয়েস কম। তো একটু দুরন্ত তো হবেই। তাই রাগের মাথায় হুড়োহুড়ি করতে-করতে...।'

'বিশ্বরূপদা, আপনার লজ্জা করছে না?' ভর্ৎসনা ছিটিয়ে জানতে চাইল রোশন। আচ্ছা, কোন আক্কেলে মানুষটা এইরকম কথা বলছে? ছোট ছেলে! বয়েস কম! দুরন্ত!

রোশন বুঝল এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ওর হাত থেকে তির ছুটে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর মনে হচ্ছিল, ও যা করেছে ঠিক করেছে। পলানের শাগরেদরা দুরন্ত হতে পারে, আর ও দুরন্ত হলেই দোষ!

বিশ্বরূপ জোয়ারদার রোশনের প্রশ্ন অথবা মন্তব্যের উত্তরে কোনও কথা বললেন না। টেবিলের জাবদা খাতা আর খবরের কাগজটা একবার এপাশে আর-একবার ওপাশে সরিয়ে গোছগাছের ভান করতে লাগলেন। তারই ফাঁকে সদর দরজার দিকে দুবার তাকালেন। বোধহয় ভাবছিলেন, এই বুঝি পলানের চ্যালারা ফিরে এল।

রোশন বিশ্বরূপদার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনি ফোন করে ছোটকুকে ডেকে নিন। এখানে এই ছড়ানো কাচের ওপরে বেশি হাঁটা-চলা করবেন না। পা কেটে যেতে পারে...।'

ছোটকু বিশ্বরূপের লজে ফাইফরমাশ আর ঝাড়পোঁছের ঠিকে কাজ করে। সকালে ন'টা-সাড়ে ন'টায় একবার আসে, তারপর সন্ধে সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ আর-একবার। বছর আঠেরো-উনিশ বয়েস। এ-পাড়ার আরও কয়েকটা দোকানে ও কাজ করে। থাকে রেল লাইনের ধারের বস্তিতে। রাতে ছেলেটা একজন কেবল অপারেটরের অফিসে নাইট ডিউটি করে। সেখানে রাত জেগে ফ্রি-তে সিনেমা দ্যাখে। ওর ভীষণ সিনেমা দেখার নেশা। ছোটকুর কাছেই এসব শুনেছে রোশন।

রোশনের কথায় বিশ্বরূপ প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলেন।

'আমি আসছি—' বলে রোশন বেঞ্চির কাছে গেল। বালিশের ফাঁক থেকে রেডিয়োটা বের করল। তখনও যন্ত্রটা বাজছে।

রোশন রেডিয়োটা ছুড়ে ফেলে দিল। ওটা মেঝেতে পড়ে থাকা ভাঙা কাচের টুকরোগুলোর ওপরে গিয়ে পড়ল।

'ছোটকুকে ওটা ফেলে দিতে বলবেন—।' বলে রোশন পকেটে হাত ঢোকাল। হাতঘড়িটা বের করে সময় দেখল। আটটা কুড়ি।

অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওর পুজোর সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। ওর ব্যাগে মা, বাবা আর ছোট ভাইয়ের একটা গ্রুপ ফটো আছে। ছোটবেলা একটা সস্তার ক্যামেরা দিয়ে রোশনই ফটোটা তুলেছিল। রোজ সকালে সাড়ে সাতটা নাগাদ মেঝেতে বাবু হয়ে বসে ওই ফটোটা সামনে রেখে ধূপ কাঠি জ্বেলে রোশন পুজোয় বসে। মানে, ওদের তিনজনের কথা ভাবে। সেটাই রোশনের পুজো।

ও তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে পুজোয় বসল।

আর পলান ওর দলবল নিয়ে 'আশাপুর লজ'-এ হানা দিল ঠিক সাড়ে দশটায়। ওদের সবার হাতেই ছিল গুন্ডাগর্দির স্ট্যান্ডার্ড অস্ত্রশস্ত্র।



গেস্টহাউসের ঘরের মেঝেতে বাবু হয়ে বসে ছিল রোশন। ওর সামনে কাঠের স্ট্যান্ডে ল্যামিনেট করে সাঁটা একটা রঙিন ফটো। ফটোটা সময়ের ছাপে কিছুটা মলিন। ফটোর সামনে মেঝেতে রাখা পিতলের ছোট্ট ধূপদানি। ধূপদানিতে একটা ধূপকাঠি বসানো। তার ডগাটা লাল—জ্বলছে। ধূপকাঠির আলসে ধোঁয়া খুব ধীরে ভেসে যাচ্ছে ওপরে। রোশনের নাকে সুগন্ধের ছোঁয়া।

রোশন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ফটোটার দিকে। ফটোতে ওর মা আর বাবা। ওদের দুজনের মাঝে ছোট্ট ফুটফুটে কুশান। কুশানের বয়েস তখন ছ'-সাত বছর।

রোশনের বাবার একটা ক্যামেরা ছিল। সুযোগ পেলেই বালক রোশন সেটা নিয়ে খুটুরখাটুর করত। নিজের পছন্দসই ফটো তুলত। ফটো যে তেমন একটা ভালো উঠত তা নয়, তবে উঠত। রোশনের ফেভারিট সাবজেক্ট ছিল ভোরবেলার সূর্য, শেষ বিকেলের সূর্য, কাক, পায়রা, মা, বাবা আর কুশান। বাবার ক্যামেরায়

ছোটভাইয়ের অনেকরকমের ফটো তুলেছে ও। তবে মা, বাবার সঙ্গে কুশানকে নিয়ে এই একটা ছবিই ও তুলেছিল। রোশনের বয়েস তখন বারো-তেরো হলেও ফটোটা খারাপ ওঠেনি।

এই ফটোটা ওর বাবা কাঠের ফ্রেমে সেট করে ল্যামিনেট করে নিয়ে এসেছিলেন। ফটোটা দেখে রোশনের খুব ভালো লেগেছিল, আবার দুঃখও হয়েছিল। ওর বারবার মনে হত এই ছবিতে ও নেই কেন। সেটাই ছিল ওর দুঃখ। ও বাবাকে প্রায়ই বলত, 'ফটোয় আমি নেই কেন? চলো, আমরা চারজন মিলে একটা ফটো তুলি। চলো না, বাবা!'

সেই ফটো আর তোলা হয়নি। তার আগেই ফটোর ওই তিনটে মানুষ সত্যি-সত্যিই ফটো হয়ে গেল।

রোশনের বাবা বড় ছেলের বায়না শুনে বলতেন, 'শোন, আমার এই ক্যামেরাটা নেহাতই সস্তা দামের মডেল। এটাতে অটোমেটিক সিস্টেম নেই। আমরা চারজন একসঙ্গে ছবি তুলতে চাইলে এ-ক্যামেরায় পারা যাবে না—স্টুডিয়োয় যেতে হবে...।'

'আজ যাব, কাল যাব' করে সেটা আর যাওয়া হয়নি। রোশন চিরকাল ওদের ফ্যামিলি গ্রুপ ফটোর বাইরেই রয়ে গেল। বাবা, মা আর কুশান একে-একে ফটোর দেশে চলে গেল। রোশনকে একা ফেলে গেল ফটোর বাইরে। একেবারে একা।

রোশনের ভেতরে একটা দুঃখের ঢেউ উথলে উঠল। ও চোখ বুজে ফেলল। ওর বাঁ-চোখের কোণ থেকে এক ফোঁটা জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

চোখ মুছল ও। তারপর একটু সময় নিয়ে সামলে নিল নিজেকে।

না, ওরা সব আছে। রোশনকে ওরা ছেড়ে যায়নি মোটেই। মা, বাবা, কুশান—ওরা মনে-মনে রোশনের সঙ্গে কথা বলে। রোশনকে ওরা ভালোবাসার ছোঁয়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

রোশন ধীরে-ধীরে চোখ খুলল। ওই তো ওরা! রোশনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'বাবু, কী হয়েছে তোর? কাঁদছিস কেন?' মা জিগ্যেস করল।

'খোকা, চোখে জল কেন তোমার?' বাবা ওকে 'খোকা' বলে ডাকতেন।

'অ্যাই, দাদা! শিগগির চোখের জল মোছ! নইলে সব্বাইকে বলে দেব, এত বড় ছেলে, ভেউভেউ করে কাঁদছে!' এরকম কথা কুশান ছাড়া আর কে বলতে পারে!

রোশন চোখ মুছল আবার। ফটোটার দিকে তাকিয়ে একবার নমস্কার করল। বিড়বিড় করে কী বলল। তারপর ফটোটা তুলে নিয়ে ওর ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে রাখল।

এবার ধূপদানিটা তুলে নিল রোশন। ধূপকাঠিটা মাপে অনেক ছোট হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনও জ্বলছে। ধূপদানি হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এল। দেওয়ালে ঘষে কাঠিটা নিভিয়ে দিল। তারপর ওটা কপালে ঠেকিয়ে সরু বারান্দায় রাখা প্লাস্টিকের লিটার বিনে ফেলে দিল। ধূপদানিটা ভালো করে ঝেড়ে নিল।

তখনই ও যেন টের পেল, খিদে পেয়েছে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি আটকে দিল। যেমন দরজার ফাটল ধরা কাঠ, তেমনই জং ধরা লোহার ছিটকিনি। দুটোরই বেশ বয়েস হয়েছে।

ঘরের একপাশে মেঝেতে রাখা রোশনের ব্যাকপ্যাক। রোশন ব্যাকপ্যাকের কাছে এল। ওটার একটা সাইড চেন খুলে ধূপদানিটা সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। তারপর চেন টেনে দিল।

এই ব্যাকপ্যাকটাই ওর সংসার। এর ভেতরেই থাকে ওর জামা-প্যান্ট, টি-শার্ট, টাকা-পয়সা, ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ড, ভোটার কার্ড, দুটো প্লাস্টিক প্যাকেটে মোড়া হাওয়াই চপ্পল, আর স্নিকার—তার সঙ্গে টুকিটাকি আরও অনেক কিছু। এই সংসারটাই ও পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যেদিকে মন চায় সেদিকে চলে যায়। যেমন, এখন ও চলে এসেছে আশাপুরে। যে-ক'টা দিন ভালো লাগে এখানে থাকবে। সেরকমটাই প্রথমে ও ভেবেছিল। কিন্তু এখন ভালো লাগার সঙ্গে-সঙ্গে সম্পর্কের টান জড়িয়ে যাচ্ছে। নইলে বিশ্বরূপ জোয়ারদার ওর কে হয়? কে হয় গনিরাম আর ববিন? কে-ইবা নিতুদা!

শর্টস আর গেঞ্জি ছেড়ে জিনসের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে নিল। তারপর খাটে বসে স্নিকার বেঁধে নিল পায়ে। ব্যাগ হাতড়ে গোটা পঞ্চাশ টাকা বের করে পকেটে গুঁজে নিল। তারপর বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা পকেটে ভরে নিল। এই তালা-চাবির সেটটা বিশ্বরূপদার। প্রত্যেক বোর্ডারের ঘরের জন্যই তিনি এইরকম তালা-চাবির ব্যবস্থা রেখেছেন।

একতলায় নেমে এল রোশন। রিসেপশনের জায়গাটা এখন সাফ করে পরিষ্কার। বোঝা গেল, ছোটকু এসে হাত-টাত লাগিয়েছে।

বিশ্বরূপ জোয়ারদার ওঁর চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন—ওই পুরোনোটাই। রোশনের পায়ের আওয়াজ পেয়ে কাগজ থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকালেন।

রোশন বলল, 'একটু বেরোচ্ছি। খিদে পাচ্ছে...।'

'সাবধানে যাও। চোখ-কান খোলা রেখো।'

উত্তরে রোশন একচিলতে হাসল শুধু।

রাস্তায় বেরিয়ে রোশন রোদে মাখামাখি হয়ে গেল। আহা রোদ! সব জায়গায় সমান। রাস্তা দিয়ে কত মানুষ যাতায়াত করছে। ওরা যদি সবাই সমান হত! এই রোদের মতন!

রাস্তাটা নামেই পাকা রাস্তা। সর্বত্র খানাখন্দে ভরা। তারই ওপর দিয়ে সাইকেল রিকশা, অটো, প্রাইভেট কার এপাশ-ওপাশ টাল খেয়ে ছুটে চলেছে। তার সঙ্গে রয়েছে সাইকেল, আর কখনও-কখনও প্রাইভেট কার।

গাড়ির চাকায় ধুলো উড়ছে। রোশন নাকের ওপরে হাত চাপা দিল। তাতে দুটো কাজ হল : ধুলোর হাত থেকে বাঁচা গেল, আর রাস্তার পাশ ঘেঁষে চলা কাঁচা ড্রেনের দুর্গন্ধও অনেকটা কমে গেল।

রোশন রাস্তায় পথচলা মানুষদের খুঁটিয়ে দেখছিল। ছোট-ছোট পড়ুয়ারা বাক্স-ভ্যানরিকশা চড়ে স্কুলের দিকে চলেছে। কোনও-কোনও মানুষ ব্যস্তভাবে হেঁটে চলেছে—হয়তো অফিসের তাড়া, কিংবা জরুরি কোনও কাজের তাড়া। একটা সাইকেল ভ্যান কলার কাঁদি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ রঙিন চাদরের মোট বয়ে নিয়ে চলেছে। কেউ বা বন্ধুর সঙ্গে জোর গলায় তর্ক করতে-করতে এগিয়ে যাচ্ছে।

কাকের ডাক শুনে ওপরদিকে তাকাল রোশন। ওভারহেড তারে তিন-চারটে কাক বসে আছে। উলটোদিকের তেলেভাজার দোকানের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে জোর গলায় ডেকে চলেছে।

রোশনের কী খেয়াল হল, ও হাঁটতে-হাঁটতে অনেকটা দূরে চলে গেল। আশাপুরের চারপাশটা একমনে দেখতে লাগল। মানুষ আর প্রকৃতি থেকে ওর পছন্দের বিষয়গুলো বেছে নিয়ে ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিতে লাগল। খিদের অনুভূতিটা তখন কোথায় যেন তলিয়ে গেল।

এইভাবে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর একসময় পায়ে-পায়ে 'মোহন সুইটস'-এ পৌঁছে গেল। কাচের বাক্সের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা দোকানদার রোশনকে দেখে মুখ-চেনা হাসি হাসল। ছেলেটা ক'দিন ধরে তার দোকানে খেতে আসছে।

'আজ কী দেব?'

'লুচি-তরকারিই দিন—।' রোশন বলল।

কাগজের ছোট থালায় চারটে গরম-গরম লুচি আর আলু-কুমড়োর তরকারি এগিয়ে দিল দোকানদার। একহাতে থালাটা নিয়ে পকেট থেকে কুড়ি টাকা বের করে তাকে দিল রোশন। তারপর দোকানের শো-কেসের একপাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার চলমান জীবনের দিকে তাকিয়ে লুচি-তরকারি খেতে শুরু করল।

বাঃ, দারুণ! লুচিগুলো হাতে গরম। আর তরকারিটাও কালো জিরে দেওয়া, ঝাল-ঝাল। ব্যাপক টেস্ট।

দুটো লুচি শেষ করে রোশন যখন তিন নম্বর লুচির অপারেশন স্টার্ট করেছে, তখনই ঠিক ম্যাজিকের মতো কাটা নগেন ওর সামনে আবির্ভূত হল। সাদা ফুলশার্ট, সাদা প্যান্ট—তবে সাদা রং ময়লা হয়ে অফ হোয়াইট হয়ে গেছে।

কাটা নগেনের চোখে মজার হাসি চকচক করছে।

রোশন কিছু বুঝে ওঠার আগেই রোগা টিংটিঙে বেঁটে ছেলেটা ওর গালে এক থাপ্পড় কষাল। এবং দ্বিতীয় থাপ্পড়টা বসাল ওর লুচি-তরকারির থালায়।

থালাটা ছিটকে পড়ল রাস্তায়। পলকে দুটো কাক উড়ে এসে জুড়ে বসল সেখানে। লুচি-তরকারিতে ঠোকর বসাল।

হতচকিত রোশন কাটা নগেনের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কী বলবে, কী করবে ভেবে পেল না।

কাটা নগেন টেনে-টেনে বলল, 'কাম, হিরো—পলানদা কলিং ইউ...।'

গালে হাত চলে গিয়েছিল রোশনের। না, ব্যথার জন্য নয়—নেহাতই একটা প্রতিবর্তী ক্রিয়ায়।

'কাম, কাম। পলানদা কলিং...।'

রোশন লক্ষ করল, রাস্তার ওপারে দুটো ছেলে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে দেখছে।

আজ ভোরবেলা এই দুটো ছেলেই তোলাবাজি নিয়ে বিশ্বরূপ জোয়ারদারের 'আশাপুর লজ'-এ হুজ্জুতি করেছিল। একজন দাঁত উঁচু, কালো হাফশার্ট, জিনসের প্যান্ট। আর-একজন স্টিলের মাকড়ি, নীল টি-শার্ট, বাদামি প্যান্ট।

'কোথায় পলানদা?' হাতে হাত ঘষল রোশন। পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত মুছল, মুখ মুছল।

'গেস্টহাউসের নিয়ার।' বলল কাটা নগেন। তারপর জোরকদমে হাঁটা দিল 'আশাপুর লজ'-এর দিকে।

রোশনকে থাপ্পড় মারার ব্যাপারটা বেশ কয়েকজনের নজরে পড়েছিল, 'মোহন সুইটস'-এর দোকানদার, দোকানের দুজন খদ্দের, আর রাস্তার চার-পাঁচজন লোক। কিন্তু ওই দেখা পর্যন্তই! কারও মুখ থেকে কোনও আওয়াজ বেরোয়নি—প্রতিবাদ তো দূরের কথা!

রোশন মাথা নীচু করে হাঁটতে শুরু করল। কাটা নগেন তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। লক্ষ করল, সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করা দুটো ছেলে ওর পিছন-পিছন আসছে।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই 'আশাপুর লজ'-এর সামনে চলে এল। দেখল সেখানে লজের সদর দরজার কাছে চার-পাঁচটা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের চেহারা নানারকম হলেও একটা মিল রয়েছে : ওরা সবাই রোশনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।



ওদের হাতে শক্ত মুঠোয় ধরা বাঁশের খেটো, হকি স্টিক, লোহার রড, এ ছাড়া একজনের ডানহাতের চার আঙুলে ফিট করা রয়েছে স্টিলের পাঞ্চ।

কিন্তু পলান কোথায়? কাটা নগেন যে বলল, পলানদা ওকে ডাকছে!

এদিক-ওদিক নজর চালাল রোশন। ওই তো কাটা নগেন! এবং পলান।

'আশাপুর লজ'-এর উলটোদিকে পাশাপাশি দুটো লেদ কারখানা। তার সামনে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা প্লাস্টিকের ছাউনি। সেই ছাউনির নীচে ছায়াতে দাঁড়িয়ে পলান এবং পলানের মোটরবাইক। তার পাশে কাটা নগেন।

রোশন আঁচ করতে পারল কী হতে চলেছে। ও পলানের দিকে এগিয়ে গেল।

পলান হাসছে। ওর একটা হাত কোমরে, আর-একটা হাত মোটরবাইকের হ্যান্ডেলের ওপরে। ডানকানে মাকড়ি, ডানহাতে বালা, হাতের আঙুলে তিনটে আংটি : পলানের ট্রেড মার্ক।

পলানের বাইকের পাশে দাঁড়িয়ে নগেনও হাসছিল। ওর হাসির ধরনটা যেন বলছিল, 'দ্যাখো, এবার কী হয়।'

রোশন পলানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল : 'পলানদা, আমাকে ডেকেছেন?'

'গুড মর্নিং, হিরো—।' পলান বলল।

'গুড মর্নিং—।' পালটা উইশ করল রোশন।

ও বুঝতে চেষ্টা করছিল, প্রথম আঘাতটা কীভাবে কোনদিক থেকে আসবে।

'যা, ওপারে লজের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়া...।' পলান ভারী গলায় অর্ডার দিল।

রোশন এদিক-ওদিক দেখে রাস্তা পার হল। মনকে কী এক প্রতিজ্ঞায় শক্ত করে ধীরে-ধীরে পা ফেলে গেস্টহাউসের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা বন্ধ, তবে দোতলার জানলাগুলো খোলা। ওগুলো বোর্ডারদের ঘরের জানলা। তার মধ্যে ডানদিকের ঘরটা রোশনের।

রোশন গেস্টহাউসের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই শত্রুরা ওকে ঘিরে নিল। ওকে কেন্দ্র করে আট-ন' ফুট ব্যাসের একটা বৃত্ত তৈরি হল।

ওপারে চোখ গেল রোশনের। পলান খইনি ডলছে। আর কাটা নগেন একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ওরা দুজন এখন সিনেমা দেখার জন্য রেডি। ওদের খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সকালের দুই হানাদার। চোখে মজা নিয়ে তাকিয়ে আছে 'সিনেমার পরদা'র দিকে। ওদের সাইকেল দুটো স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো।

সিনেমা শুরু হল।

খেটো হাতে একজন শত্রু প্রথম এক পা বাড়াল রোশনের দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে সেই জায়গা বরাবর ব্যাসার্ধটা ছোট হয়ে গেল।

ছেলেটা খেটো চালাল রোশনের বুক লক্ষ্য করে। সেই আঘাতটা রোখার জন্য রোশন সামনে দু-হাত বাড়াল। কিন্তু ছেলেটা এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং পেশাদার। কারণ, মাঝপথেই ও অস্ত্রটাকে থামাল এবং রোশনকে অবাক করে দিয়ে দিক পালটে খেটোটা শেষ পর্যন্ত চালাল ওর কোমর লক্ষ্য করে।

এই আকস্মিক আঘাতটা রোশন আটকাতে পারল না। ওর পেটের পেশি, কোমরের হাড় যেন হাই ভোল্টেজ শক খেল। যন্ত্রণার কেন্দ্রবিন্দু তৈরি হয়ে গেল সেখানে। আর সেই কেন্দ্র থেকে যন্ত্রণার অনুভব তরঙ্গ ওর শরীরের নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

রোশন দাঁতে দাঁত চেপে এই যন্ত্রণার মোকাবিলা করতে চেষ্টা করছিল। আর ঠিক তখনই একটা হকি স্টিক পিছন থেকে এসে আছড়ে পড়ল ওর শিরদাঁড়ার ওপরে।

আক্রমণের এই 'সিনেমা'-টা চলছিল রাস্তার একপাশে, লজের দরজার কাছে। ব্যস্ত রাস্তার মানুষজনের কেউ-কেউ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে 'সিনেমা' দেখা শুরু করলেও রাস্তায় কোনও অবরোধ তৈরি হয়নি। বরং বলা যায়, সামান্য যানজট তৈরি হয়েছিল।

পথচারী দর্শক ক্রমশ সংখ্যায় বাড়ছিল। তাই রাস্তার ওপার থেকে পলানরা 'সিনেমা'-টা আর দেখতে পাচ্ছিল না। ওরা চটপট রাস্তা পেরিয়ে গেস্টহাউসের কাছে চলে এল। পলানকে দেখে লোকজন তাড়াতাড়ি

পিছনে সরে গিয়ে পথ করে দিল। পলানের ঠোঁটের একটা কোণ উঁচু হয়ে রয়েছে। বোঝাই যায়, ওর হাতে ডলা খইনিটা ওখানে গিয়ে সেটল করেছে।

রোশনকে মারার কাজটা তখনও চলছে। অপারেশনের আগে পলান শাগরেদদের বলে দিয়েছিল, 'শুয়োরের বাচ্চাটাকে বেধড়ক মার মারবি, তার খেয়াল রাখবি মালকড়িতে যেন চোট না পায়। আর হ্যাঁ, মাথায় মারবি না। তবে সারা বডিতে রামপালিশ দিবি—।'

আক্রমণকারীরা সর্দারের অর্ডার অক্ষরে-অক্ষরে পালন করছিল। সর্দারের বিধিনিষেধ মেনে রোশনকে আগাপাশতলা পালিশ দিচ্ছিল।

হকি স্টিক এসে পড়ল ঊরুতে। খেটো এসে পড়ল পায়ের গোছে। লোহার রড এসে পড়ল পাছায়।

রোশন তখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেও ওর মাথা টলছিল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ও অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়বে রাস্তায়। কিন্তু তবুও ও দাঁতে দাঁত চেপে মার খেয়ে যাচ্ছিল। না, ও প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না। প্রতি-আক্রমণ কখনওই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। অন্তত এখনও ওর তাই বিশ্বাস।

পাবলিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে বিনিপয়সার এই সিনেমা উপভোগ করছিল। কারও মুখে কোনও প্রতিবাদ নেই।

বিশ্বরূপ জোয়ারদার বাড়ির ভেতর থেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু একবারের জন্যও দরজা খোলেননি। ওঁর ভীষণ খারাপ লাগছিল। বোকা ছেলেটা ওঁকে বাঁচাতে গিয়েই এই বিপদের মুখে পড়ল!

বোর্ডারদের ঘরের একটা জানলা দিয়ে বিশ্বরূপ ঘটনাটা দেখছিলেন। অন্যান্য ঘরের জানলাতেও কয়েকজন বোর্ডার দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু ওভারহেড ইলেকট্রিকের তারে পাশাপাশি বসে থাকা অনেকগুলো কাক তারস্বরে চিৎকার করছিল। হয়তো ওদের মতন করে প্রতিবাদ করছিল।

এমনসময় একটা পুলিশের জিপ কোথা থেকে এসে ভিড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পুলিশের জিপ দেখে পাবলিক তাড়াহুড়ো করে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেল। তাদের অনেকেরই নজর রোশনের দিক থেকে সরে গিয়ে পড়ল পুলিশের জিপের দিকে। কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপর তারা আবার 'সিনেমা'-র দিকে নজর ফেরাল।

জিপের স্টিয়ারিং-এ খাকি পোশাক পরা মোটাসোটা একজন কনস্টেবল। মাথায় মিহি লোমের মতো চুল—হয়তো বিশ-পঁচিশ দিন আগে নেড়া হয়েছিল। তবে তার কেশরাশির ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছে তার গোঁফরাশি—যাকে মোচ বললেও যথেষ্ট কম বলা হয়।

জিপের প্যাসেঞ্জার সিটে যিনি বসে আছেন তাঁর হ্যাট এবং খাকি ইউনিফর্ম বলে দিচ্ছে তিনি একজন সাব-ইনস্পেকটর। রোগা, কালো, চোয়াড়ে, পোড়খাওয়া চেহারা। গলায় কালো কারে ঝোলানো একটা ছোট্ট রুপোর লকেট।

সাব-ইনস্পেকটরসাহেব জিপ থেকে নেমে পড়লেন। জিপের সামনে দিয়ে ঘুরে পলানের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন।

'কী, পলানদা, খবর-টবর কী? সব কুশল-মঙ্গল তো?'

সাব-ইনস্পেকটরসাহেবের বয়েস পলানের চেয়ে অন্তত দশ কি বারো বছর বেশি হবে। তাঁর দু-রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে। তবুও তিনি পলানকে 'পলানদা' বলে ডেকেছেন এবং তাঁর চোখ-মুখে একটা গদগদ আহ্লাদী ভাব ফুটে উঠেছে।

পলান হাসল, বলল 'হ্যাঁ সুরেনদা, সব কুশল-মঙ্গল। আপনার সব ফিট তো?'

'একদম ফিট—' বলে একগাল হাসলেন সাব-ইনস্পেকটর সুরেন্দ্রনারায়ণ দাস—পলানদের দলের কাছে 'সুরেনদা'। হাসির সঙ্গে-সঙ্গে ওঁর দু-গালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। একটা চোখ ছোট করে ধূর্তামির ইঙ্গিত

দিলেন।

রোশনের মারধোরের ব্যাপারটা তখনও চলছিল। ভিড় করে থাকা লোকজনের মনোযোগ সেদিকেই। কারণ, তারা জানে, পলানদের কাছে 'পুলিশের গাড়ি'-র গুরুত্ব অন্য আর-পাঁচটা গাড়ির মতোই—এমনকী সেই গাড়িটা ঠেলাগাড়ি কিংবা সাইকেল ভ্যানও হতে পারে।

রোশনের দিকে ইশারা করে সুরেন জিগ্যেস করলেন, 'কেসটা কী?'

পলান কান চুলকে শব্দ করে থুতু ফেলল মাটিতে। তারপর বলল, 'সালা পকেটমার! আর লোক পায়নি আমারই মানিব্যাগটা হিপ পকেট থেকে তুলে নিয়েছিল—ওই ''মোহন সুইটস''-এর সামনে। আস্পর্ধাটা একবার ভেবে দেখুন! দু-চারদিন হল এরিয়াতে এসেছে তার মধ্যেই এতটা বাড় বেড়ে গেছে। আমি পিকপকেট হয়েছে টের পেয়েই খপ করে জানোয়ারটাকে লপকে নিয়েছি...।'

কাটা নগেন পাশে দাঁড়িয়ে সুরেন আর পলানের কথা শুনছিল। পলানের কথা শেষ হতে না হতেই তার খেই ধরে নিয়ে বলল, 'সেইজন্যেই স্যার আমরা মালটাকে একটু এডুকেশন দিচ্ছি—হালকা এডুকেশন...।'

কথাটা শুনে সুরেন্দ্রনারায়ণ একটু হাসলেন। ভিড়ের মাথা ডিঙিয়ে রোশনের দিকে একবার দেখলেন। তারপর পলানকে বললেন, 'আপনি বলেন তো তুলে নিয়ে গিয়ে ভেতরে করে দিই...।'

'না, না—তার আর দরকার নেই। আমিও কেসটা সালটে দিচ্ছি। আপনি তো জানেন, বিনা কারণে আমি আপনাদের কোনও ট্রাবল দিই না। যে ঝামেলাগুলো আমি নিজেই সালটাতে পারি সেগুলোর জন্যে আপনাদের কখনও ডিসটার্ব করি না। আমি চাই, আশাপুরে শান্তি থাকুক...।'

'হ্যাঁ, সে তো জানি—' হাসলেন সুরেন। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, 'পলানদা, একটা কথা ছিল...।'

'বলুন না—।'

সুরেন কাটা নগেনের দিকে একবার তাকালেন।

পলান ইশারাটা বুঝতে পেরে বলল, 'ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। ওদের কানের সঙ্গে মুখের কোনও কানেকশন নেই। ওরা কান দিয়ে যা শোনে সেটা কখনও ওদের মুখ দিয়ে বেরোয় না...।' নগেনকে দেখিয়ে পলান যোগ করল : 'আপনি তো ওকে চেনেন...ওর নাম নগেন...।'

সুরেন হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, চিনি। কাটা নগেন—।'

'কাটা' বিশেষণটা শুনে নগেনের কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল।

সুরেন্দ্রনারায়ণ পলানের প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, 'পলানদা, আমার মান্থলি পেট্রল খরচাটা নিয়ে একটু ভাবুন-টাবুন। চারপাশে জিনিসপত্রের দাম যা বেড়েছে সামথিং ইনক্রিমেন্ট না হলে আর চলছে না...।'

কথাটা শুনে পলান চোখ ছোট করল। কিছুক্ষণ বোধহয় নিজের মনেই কী ভাবল। তারপর বলল, 'হয়ে যাবে। খুব কিছু বেশি করতে পারব না—তবে সামথিং কিছু করে দেব। আপনাকে প্রমিস করলাম, সুরেনদা—।'

'ব্যস, ব্যস—এর বেশি আর কিছু চাই না। থ্যাংক ইউ, পলানদা।'

সুরেন দাস চটপটে পায়ে জিপে উঠে পড়লেন। জিপ স্টার্ট দিতে না দিতেই পলান প্রায় ছুটে গিয়ে হাজির হল জিপের কাছে, ড্রাইভারের পাশে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে দুটো একশো টাকার নোট বের করল। নোট দুটো ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'পান্ডেজি, জরা মওজ-মস্তি করনা...।'

কনস্টেবলটি মেগা সাইজের দাঁতের সারি বের করে হাসল, পলানকে একটা আধা-সেলাম ঠুকল। তারপর মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে জিপের চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল।

জিপটা চলে যেতেই একটা গুঞ্জন কানে এল পলানের। সেইসঙ্গে কান্নার শব্দ।

পলান ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল। ব্যাপারটা কী? কে অমন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে?

মারপিটের বৃত্তের পরিধিতে এসে থমকে দাঁড়াল পলান। পিছনে কাটা নগেন। ও তখন থেকে পলানের সঙ্গে-সঙ্গে ছায়ার মতো সেঁটে আছে।

রোশন রাস্তার ওপরে নেতিয়ে পড়ে আছে। চোখ আধখোলা, হাঁপাচ্ছে। কপালের ডানপাশে রক্ত লেগে আছে। ঠোঁটের ডানকোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। গায়ের পোশাক ধুলোমাখা। ওর শরীরে রোদ এসে পড়েছে।

রোশনকে যারা মারধোর করছিল তারা যার-যার অস্ত্র হাতে নিয়ে ছবির মতন দাঁড়িয়ে আছে। চোখমুখে হতভম্ভ ভাব—বুঝতে পারছে না এখন কী করবে।

পলানকে সামনে দেখতে পেয়ে ওরা পলানের দিকে তাকাল। ওদের চোখে প্রশ্ন : 'এখন কী করব?'

সুরেন দাসের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল বলে এই চাপা কান্নার শব্দ পলানের কানে যায়নি। এখন সেই শব্দটাই ওর কানে ঢুকছিল, আর দৃশ্যটাও দেখতে পাচ্ছিল সরাসরি।

রোশনের কাহিল শরীরের পাশে রাস্তায় লেপটে বসে আছে একজন ভদ্রমহিলা। কালো-কোলো ছোটখাটো চেহারা। গায়ের শাড়িটা অতি ব্যবহারে ময়লা। কোথাও-কোথাও ছিঁড়েও গেছে। মাথার চুলের অনেকটাই পাকা।

ভদ্রমহিলার পাশে রাখা একটা ছোট পুঁটলি। পুঁটলিটা নানান রঙের কাপড়ের টুকরো জুড়ে তৈরি।

এই পুঁটলিটাকে আশাপুরের সবাই চেনে। চেনে পুঁটলির মালিককেও। তাকে সবাই 'বুড়িমাসি' বলে ডাকে। মাসি জগন্ময়ী কালীমন্দিরের চাতালের এক কোণে থাকে। সকালে-বিকেলে চৌরাস্তার মোড়ের বিবেকানন্দের মূর্তির কাছে বসে ভিক্ষে করে। মাথায় ভালোরকম গোলমাল আছে।

পলান বুড়িমাসির মুখটা দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু পুঁটলিটা দেখেই তাকে চিনে নিতে পারল।

বুড়িমাসি তখন রোশনের গায়ে-মাথায় হাত বোলাচ্ছে আর আপনমনে কথা বলছে, ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছে।

'আমার খোকাকে মারছ কেন তোমরা? কেন মারছ? ও খুব ভালো খোকা। রোজ বিকেলে আমারে চা-বিস্কুট খাওয়ায়। ভালো খোকাকে মেরো না গো, মেরো না। ও মরে গেলে কে আমারে রোজ চা-বিস্কুট খাওয়াবে?'

রোশনের গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে ওকে ডাকছিল বুড়িমাসি : 'ওঠ, ভালো খোকা, ওঠ। উঠে পড়, বাবা—।'

রোশন এপাশ-ওপাশ একটু নড়ল। সারা শরীরে ব্যথা, কিন্তু যন্ত্রণার একটুকরো চিৎকারও ওর মুখ দিয়ে বেরোয়নি। দাঁতে দাঁত চেপে ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। বুড়িমাসির কথাগুলো যেন বহুদূর থেকে ওর কানে ভেসে আসছিল। ওর মনে হচ্ছিল, মা ওর গায়ে-মাথায় হাত বোলাচ্ছে, ডাকছে, 'বাবু, ওঠ-ওঠ! আর ঘুমোসনি। বেলা হয়ে গেছে—।'

রোশন চোখ খুলল, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে চোখ কুঁচকে বন্ধ করে ফেলল। সূর্য সরাসরি ওর চোখে এসে পড়েছে।

মুখ ফিরিয়ে আবার চোখ খুলল। এবার চোখে পড়ল চোখের জল। বুড়ি মাসির চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। মাসি কাঁদছে আর রোশনের চা-বিস্কুট খাওয়ানোর কথা বলছে।

গত তিনদিন বিকেলের দিকে আশাপুরের এদিক-সেদিক লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে বেরিয়েছিল রোশন। বিবেকানন্দের রেলিং ঘেরা মূর্তির কাছে রোজই ও বুড়িমাসিকে ভিক্ষে করতে দেখেছে। ডানহাত সামনে পেতে মাসি শুধু একটা কথাই বলে, 'দুটো টাকা দাও না, বাবা—চা খাব।' আর মাঝে-মাঝে মিহি গলায় বেসুরো গানের মতো কী একটা গায়।

প্রথম দিন মাসিকে দেখেই রোশনের মনটা কেমন যেন করে উঠেছিল। ও কাছাকাছি একটা চায়ের দোকান থেকে চা আর দুটো নোনতা বিস্কুট কিনে এনেছিল। বুড়িমাসির হাতে চা-বিস্কুট ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'নিন, মাসি—চা খান।'

তার পর থেকে ব্যাপারটা রোজকার নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। বুড়িমাসির কাছে এটাই বোধহয় অনেক— তাই বারবার সে-কথা বলছে।

পলান বুঝতে পারছিল, পরিস্থিতিটা কেমন করে যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। ভিড় করে থাকা লোকজন তখন টুকরো-টুকরো কথা বলছে। টুকটাক প্রশ্ন তুলছে।

'ছেলেটাকে ওরা এভাবে মারছে কেন?'

'এমনভাবে কেউ মারে।'

'পুলিশ তো এল আর চলে গেল—।'

'চলে যাবে না তো কী করবে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবে?'

'হুঁঃ! আমাদের পুলিশ খুব ভালো। ''বাবুরাম সাপুড়ে''-র সাপের মতো। ছোটে না কি হাঁটে না, কাউকে যে কাটে না...।'

কথাটা শুনে দু-চারজন হেসে উঠল।

পলান কাটা নগেনকে চাপা গলায় বলল, 'সবাইকে বল, ছেলেটা আমার পকেট মেরেছে। তাই একটু শাস্তি দেওয়া হচ্ছে...।'

পলানের নির্দেশ পাওয়ামাত্র নগেন একটা হাত শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে উঠল : 'এই ছেলেটার নাম রোশন। একে সবাই চিনে রাখুন। এ আমাদের আশাপুরে নিউ এসেছে। ওনলি তিন-চারদিন। বেটা আসলে পকেটমার। এই হাফ অ্যান আওয়ার এগো ওই ''মোহন সুইটস''-এর সামনে এই উঠাইগিরা মালটা পলানদার পকেট থেকে মানিব্যাগ তুলে নিয়েছে। আমরা কেসটা ক্যাচ করে ফেলেছি। একেবারে রেড হ্যান্ডেড। তাই তার পানিশমেন্ট দেওয়া হচ্ছে।' একটু থেমে দম নিল। তারপর : 'আবার বলছি, এই উটকো ছেলেটা পকেটমার। আমাদের পিসফুল আশাপুরের পিস নষ্ট করতে এসেছে। এইরকম লোকের জন্যে আশাপুরে কোনও জায়গা নেই। নো স্পেস।'

কাটা নগেন একই কথা বারবার বলতে লাগল। মনে হচ্ছিল, ও যেন ট্রেনের কামরায় দাদের মলম বিক্রি করছে।

নগেনের কথায় পাবলিকের মধ্যে তেমন একটা হেলদোল দেখা গেল না।

একটা রোগাপটকা লোক তার পাশে দাঁড়ানো মোটামতন একজনকে চাপা গলায় বলল, 'কাটা নগেন ঢপ দিচ্ছে— হান্ড্রেড পার্সেন্ট। আধঘণ্টা আগে আমি ওই ''মোহন সুইটস''-এ বসে কচুরি আর জিলিপি খাচ্ছিলাম। তখন এই রোশন ছেলেটা এল। লুচি-তরকারি কিনে দোকানের বাইরেটায় দাঁড়িয়ে খেতে লাগল। তার কিছু পরেই ওই কাটা নগেন এসে ছেলেটার গালে থাপ্পড় মারল, ওর খাবারের থালা এক থাবড়া মেরে ছিটকে ফেলে দিল। তারপর ''পলানদা ডাকছে'' বলে ওকে ডেকে নিয়ে গেল। তা হলে ছেলেটা পলানের পকেট মারল কখন?'

মোটামতন ছেলেটা হাত নেড়ে প্রায় থামিয়ে দিল রোগা বন্ধুকে : 'চেপে যা—কিচ্ছু বলার দরকার নেই। এসব বলতে গেলে তোকে ধরে উদ্যোম ক্যালাবে...।'

রোগা লোকটা মুখে কুলুপ আঁটল।

রোশনকে লাঠিসোটা দিয়ে মারার দৃশ্যটা তিন-চারজন লোক মোবাইলে তুলছিল। তার মধ্যে একজনকে কাটা নগেন দেখতে পেল।

ও বলতে গেলে নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপরে। নোংরা খিস্তি দিয়ে মোবাইল ফোনটা ছিনিয়ে নিল।

হকি স্টিক বাগিয়ে ধরা চ্যালাটাকে ইশারা করল পলান। সঙ্গে-সঙ্গে সে মোবাইল 'ফটোগ্রাফার'-এর পায়ে সপাটে খেটো চালাল। লোকটা 'ওরে বাবা গো!' বলে মুখ থুবড়ে পড়ল সামনে। ওর পড়ে যাওয়ার ভঙ্গি

দেখে পলান হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করে অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল। বোঝা গেল, মুখে খইনি থাকার জন্য ওর হাসিটা তেমন খোলামেলা হল না।

আরও তিনজন লোক মোবাইলে ফটো তুলেছিল। একজন 'ফটোগ্রাফার' এর দুরবস্থা দেখে তারা নিজেদের মোবাইল ফোন চটপট লুকিয়ে ফেলল।

ইতিমধ্যে রোশন কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর গা-হাত-পা টনটন করছে। চোখের নজর ঝাপসা। শত্রুরা অস্ত্র বাগিয়ে থাকলেও সেগুলো এই মুহূর্তে চালাতে পারছে না। কারণ, বুড়িমাসি রোশনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে কী যে সব বলছে তার একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

এমন সময় পলানের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ও পকেট থেকে ফোন বের করে বোতাম টিপে কানে লাগাল।

সাব-ইনস্পেকটর সুরেন দাসের ফোন।

'পলানদা, এখনও কি আপনারা স্পটে রয়েছেন?'

'হ্যাঁ—কেন?'

'ব্যাপারটা গোটা আশাপুরে চাউর হয়ে গেছে। থানায় তিনজন ফোন করেছে। ন্যাচারালি ওরা নাম-টাম কিছু বলেনি। তবে বাজার গরম হয়ে উঠেছে। আমাকে বড়বাবু ফোন করে ব্যাপারটা ইমিডিয়েটলি দেখতে বলছেন। আমি স্পটে আবার যাচ্ছি। এবার অফিশিয়ালি। আপনি আপনার ভাই-টাইদের নিয়ে পুরো হাওয়া হয়ে যান। দেরি করবেন না...।'

'ও. কে.—।'

পলান ফোন কেটে দিল। তারপর হাত নেড়ে দলের ছেলেগুলোকে চলে যেতে ইশারা করল। কাটা নগেন ওর কাছাকাছিই ছিল। পলান নীচু গলায় ওকে বলল, 'এক্ষুনি সবাইকে কেটে পড়তে বল। পুলিশ স্পটে আসছে। কেসটা থানায় খবর হয়ে গেছে—।'

পলানের কথা শেষ হতে না হতেই নগেন কাজ শুরু করে দিল। দলের ছেলেগুলোকে নানান নামে ডেকে-ডেকে পাতলা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

ওরাও আর দেরি করল না। মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

পলান চটজলদি রাস্তা পেরিয়ে চলে এল ওর বাইকের কাছে। পিছন-পিছন নগেন। বাইক স্টার্ট দিয়ে ওরা দুজনে চড়ে বসল। তারপর বিকট আওয়াজ তুলে হাইস্পিডে বাইক ছুটিয়ে দিল পলান।

'সিনেমা' শেষ। তাই বেশিরভাগ মানুষই ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে তাদের কাজে-কর্মে রওনা হয়ে গেল। দু-চারজন যারা পড়ে রইল তাদের কাজের তাড়ার চেয়ে কৌতূহল অনেক বেশি। কেউ-কেউ রোশনের কাছে এগিয়ে গেল। একজন ভালো করে ওর হাত-পা-মুখ দেখতে লাগল। খুঁজতে লাগল, কোথায়-কোথায় কেটে-ছড়ে গেছে, রক্ত বেরোচ্ছে। আরও দুজন লোক রোশনকে নানান প্রশ্ন করতে লাগল।

'তুমি এখানে নতুন এসেছ শুনলাম। তা কী কাজে এসেছ?' একজন জিগ্যেস করল।

রোশন, যে এতক্ষণ মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ পর্যন্ত বের করেনি, এইবার কথা বলল : 'আমি আশাপুরে কোনও কাজে আসিনি। জায়গাটা আমার ভালো লেগেছে—তাই আমি এখানে থাকতে এসেছি...।'

ও থেমে-থেমে কথাগুলো বলছিল, আর সেইসঙ্গে হাঁপাচ্ছিল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

'তুমি কি সত্যিই পলানদার পকেট মেরেছ?' আর-একজন জানতে চাইল।

রোশন হাসল। ঠোঁটে চোট থাকার জন্য ঠোঁট বেশি চওড়া করতে পারল না। ও ধীরে-ধীরে বলল, 'আমার বলার কিছু নেই। আপনার যেটা মনে হয়, সেটাই আসল সত্যি...।'

লোকটা একটু অবাক হয়ে গেল। রোশনের কথা ওর কাছে কেমন হেঁয়ালির মতো লাগল। কী বলতে চাইল ছেলেটা? 'আপনার যেটা মনে হয়, সেটাই আসল সত্যি।'

তার মানে?

রোশন জড়ানো হোঁচট খাওয়া গলায় বুড়িমাসিকে বলল, 'মাসি, তুমি এখন যাও। আমি বিকেলে বিবেকানন্দের স্ট্যাচুর কাছে যাব—তোমাকে চা-বিস্কুট খাওয়াব...।'

'খাওয়াবি তো?' চা-বিস্কুট খাওয়ার কথায় বুড়িমাসির চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে আশাভরা নজরে তাকাল রোশনের দিকে। ঘাড় হেলিয়ে আবার জানতে চাইল, 'খাওয়াবি তো?'

রোশন আবার বলল, 'হ্যাঁ—খাওয়াব। বিকেলে আমি যাব তোমার কাছে...।'

বুড়িমাসি বলল, 'বেঁচে থাক, ভালো খোকা। ভগবান তোর সঙ্গে থাকুক।'

আপনমনে কয়েকবার ঘাড় নাড়ল বুড়িমাসি। তারপর রাস্তা থেকে তালিমারা পুঁটলিটা তুলে নিয়ে হাঁটা দিল।

রোদের তেজ অনেকটা বেড়ে গেছে। রোশনকে ঘিরে থাকা ভিড় একেবারে ফিকে হয়ে গেছে। চলে যাওয়ার সময় কেউ-কেউ আলোচনা করতে-করতে গেছে, রোশন কেন মুখ বুজে মার খেল। কেন ও পালটা আঘাতের পথে গেল না?

বিশ্বরূপ জোয়ারদার দোতলার জানলা থেকে সবই দেখছিলেন। দেখছিলেন, ওঁকে হেনস্থা থেকে বাঁচানোর মাশুল গুনছে একজন তরতাজা নিষ্পাপ যুবক। বিশ্বরূপের খুব খারাপ লাগছিল। একটা অদ্ভুত গ্লানিতে ওঁর মনটা ছেয়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে বুকের ভেতরে একটা কষ্ট।

দোতলার জানলা থেকে খানিকটা দূরেই ইলেকট্রিকের তার। সেখানে ছ'-সাতটা কাক এখনও সার বেঁধে বসে আছে। 'কা-কা' করে ডাকছে। হয়তো ওদের প্রতিবাদ এখনও ফুরোয়নি।

বিশ্বরূপের হঠাৎই যেন ঘোর কাটল। তিনি তাড়াহুড়ো করে বোর্ডারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাড়াতাড়ি পা চালালেন সিঁড়ির দিকে। এক্ষুনি ওঁকে যেতে হবে রোশনের কাছে। রোশনের এখন সাপোর্ট দরকার। ও নিশ্চয়ই সাংঘাতিকরকম চোট পেয়েছে। ওকে ইমিডিয়েটলি ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে।

বিশ্বরূপ যখন লজের বাইরে বেরোলেন তখন রোশন সদর দরজার কাছাকাছি চলে এসেছে। ছেলেটা বেশ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছে। একজন লোক পাশ থেকে এগিয়ে এসে রোশনের হাত ধরে ওকে সাহায্য করতে যাচ্ছিল, কিন্তু রোশন হাতের ইশারায় তাকে বারণ করল। ও একাই গেস্টহাউসে যেতে পারবে, দোতলায় নিজের রুমে পৌঁছতে পারবে। ওর শরীরকে ভরসা দেওয়ার জন্য ওর কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তবে পলান আর তার দলবলের অন্যায় কাজ-কারবারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ওর সাপোর্ট দরকার। অনেক সাপোর্ট।

বিশ্বরূপ জোয়ারদার দু-পা এগিয়েই রোশনকে পেয়ে গেলেন। রোশন ইশারা করে বারণ করা সত্ত্বেও বিশ্বরূপ সেই বারণ শুনলেন না। রোশনের বাঁ-হাতটা আঁকড়ে ধরলেন। ইস, কী মারটাই না মেরেছে ছেলেটাকে!

বিশ্বরূপের বুকের ভেতরে কষ্টটা বাড়ছিল। চোখের কোণও ভিজে গিয়েছিল। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিল। পলান আর ওর দলবলের ওপরে রাগও হচ্ছিল খুব। ওঁর যদি গায়ে সেরকম জোর-টোর থাকত তা হলে সবক'টা শয়তানকে ধরে কষে পিটিয়ে দিতেন। রোজই তো ভাবেন এই কথাটা, কিন্তু কাজে সেটা আর হচ্ছে কই!

রোশনকে সঙ্গে করে গেস্টহাউসের রিসেপশন রুমে ঢুকলেন। টেবিলের কাছে গিয়ে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে ওকে বসালেন। মাথাটা হেলিয়ে দিলেন চেয়ারের পিঠের দিকে। তারপর ছুটলেন কলতলায়।

একটু পরেই একটা ভেজা তোয়ালে নিয়ে ফিরে এলেন। রোশনের কপাল আর ঠোঁটের রক্ত মুছে দিলেন। তারপর তোয়ালের পরিষ্কার অংশে দিয়ে মাথা মুছে দিলেন বারবার। একইসঙ্গে বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'আমার ব্যাপারে জড়িয়েই তোমার এই সর্বনাশ হল। আমার ব্যাপারে জড়িয়েই তোমার এই সর্বনাশ হল...।'

রোশন মাথা হেলিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। দু-চোখ বোজা। বড়-বড় শ্বাস পড়ছে। কপাল আর ঠোঁটের পাশটায় অল্প-অল্প জ্বালা করছে। মাথার ভেতরে একটা দপদপানি। আর বুকের ভেতর একটা অচেনা শক্তি নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসছে।

একটু পরে তোয়ালেটা টেবিলে রেখে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলেন বিশ্বরূপ। তারপর ছোটকুকে ফোন করলেন।

দুবার রিং বাজতেই ছেলেটার সাড়া পাওয়া গেল। বিশ্বরূপ ওকে বললেন, 'শোন, ''ভবানী মেডিকেল'' থেকে একটা স্যাভলন, খানিকটা তুলো, আর চারটে ব্যথা মরার ট্যাবলেট আমার নাম করে নিয়ে আয়—সন্ধেবেলা আমি দাম মিটিয়ে দেব। জলদি নিয়ে আয়...।'

'হ্যাঁ—জানি। এমার্জেন্সি। পলানের গুণ্ডাগুলো রোশনদাকে বহুত মার মেরেছে—ফর নাথিং...।'

বিশ্বরূপ বুঝলেন, রোশনকে বিনা কারণে মারার খবরটা চারদিকে চাউর হয়ে গেছে।

'ছোটকু, তুই জিনিসগুলো নিয়ে জলদি গেস্ট হাউসে চলে আয়—।'

'দু-মিনিটের মধ্যে আসছি, কাকু....।' ফোন ছেড়ে দিল ছোটকু।

চারমিনিটের মধ্যে ছোটকু স্যাভলন, তুলো আর ট্যাবলেট নিয়ে গেস্টহাউসে চলে এল। দেখল, বিশ্বরূপ জোয়ারদার রোশনের ওপরে ঝুঁকে পড়ে পরিচর্যায় ব্যস্ত। ওর কাছাকাছি লজের বাকি দুজন বোর্ডার মুখে উৎকণ্ঠা আর কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে।

ছোটকু ঢোকার ঠিক সাতমিনিট পর গেস্টহাউসে ঢুকল নিতুয়া আর ববিন। বাচ্চা ছেলেটা একটা কোরা থান লুঙ্গির মতন করে পরে আছে। গায়ে ছোট একটা কোরা উড়ুনি। গলায় কাছা—তাতে লোহার চাবি ঝুলছে।

রেল লাইনের ধারে বারো নম্বর বস্তিতেও রোশনের মার খাওয়ার খবরটা পৌঁছে গেছে।



রেললাইনের ধারে গড়ে ওঠা বারো নম্বর বস্তিটাকে দেখলে হঠাৎ করে মনে হতে পারে ঝুলনযাত্রার সাজানো রঙিন 'খোকা' ঘরবাড়ি।

বস্তির সামনে দিয়ে চলে গেছে মরচে ধরা রেললাইন। লাইনের লোহার জং ধরা বাদামি রং দেখেই বোঝা যায় এ-লাইন দিয়ে শেষ কবে ট্রেন চলেছিল সে-কথা কারও আজ মনে নেই।

এরকম বাতিল একজোড়া লাইন পাশাপাশি শুয়ে আছে। তার ওপরে সকালের রোদ এসে পড়েছে। কিন্তু জং ধরা বিবর্ণ লোহা থেকে এককণাও আলো ছিটকে আসছে না চোখে।

সেই লাইনের ওপরে এখানে-ওখানে অলসভাবে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে আছে কম-বেশি বয়েসের কয়েকজন মানুষ। একজন রোগা প্রৌঢ় খালি গায়ে লুঙ্গি পরে উবু হয়ে বসে দাঁত মাজছে। একজন মাঝবয়েসি মহিলা কাচা জামাকাপড় ছড়িয়ে দিচ্ছে রেললাইনের ওপরে। দুটো ছোট বাচ্চা বাতিল লাইনের ক্ষয়ে যাওয়া কাঠের স্লিপারের ওপরে লাফিয়ে-লাফিয়ে এক্কা-দোক্কা গোছের কিছু একটা খেলছে। একজন সাদা-চুল বুড়ো মানুষ খালি গায়ে দাঁড়িয়ে হাতে চাপড় মারার শব্দ করে গায়ে তেল মাখছে।

বাতিল রেললাইনের পাশ ঘেঁষে বারো নম্বরের সারি-সারি ঘর। ঘরগুলো মাপে ছোট-ছোট খুপরির মতো। কোনওটা উঁচু, কোনওটা নীচু। কোথাও শ্যাওলা ধরা টালির ছাউনি, কোথাও বিজ্ঞাপনের বাতিল ফ্লেক্স, কোথাও আবার সবুজ, নীল অথবা গোলাপি পলিথিন দিয়ে চাল ছাওয়া।

ঘরগুলোর দেওয়াল ঘেঁষে কোথাও-কোথাও ছোট-ছোট টব বসানো। সেই টবে বেড়ে উঠেছে ফুলগাছ। তাতে ফুটফুটে সাদা আর গোলাপি ফুল। কোনও ঘরের চালে ছেয়ে রয়েছে লতানে লাউ অথবা কুমড়ো গাছ। আবার কোনও-কোনও চালে বসানো রয়েছে টিভির ডিশ অ্যানটেনা।

বারো নম্বর বস্তির সামনে রয়েছে বেশ কয়েক সারি রেললাইন। তার মধ্যে দু-সারি জং ধরা বাতিল হলেও বাকি চার সারি লাইন বেশ ঝকঝকে চকচকে। সেইসব চকচকে লাইন দিয়ে রোজ নানারকমের ট্রেন অথবা মালগাড়ি যাতায়াত করে। তাদের ঘটাঘট খটাখট শব্দের চঞ্চল ছন্দ বারো নম্বর বস্তির মানুষজনের জীবনের ছন্দের সঙ্গে বিনুনির মতো জড়িয়ে গেছে।

বস্তির ঘরগুলো এলোমেলো ছন্নছাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারই ফাঁকফোকর দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে সরু-সরু পথ। সেইসব পথ দিয়ে দুজন মানুষ পাশাপাশি যাতায়াত করতে পারে। তবে কোথাও-কোথাও পথগুলো আরও সরু হয়ে গেছে। বস্তির ছোট-ছোট বাচ্চারা গোলকধাঁধার মতো বিছিয়ে থাকা এইসব গলিগালায় লুকোচুরি কিংবা চোর-পুলিশ খেলতে-খেলতে বড় হয়ে ওঠে। তারপর—তাদের মধ্যে যারা ক্রিমিনাল তৈরি হয়—তারা পুলিশের তাড়া খেয়ে এই 'ভুলভুলাইয়া'র মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গা-ঢাকা দেয়।

বারো নম্বর বস্তির একটা ভীষণ সরু গলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল রোশন। সূর্য মাথার ওপরে উঠলে তবেই তার আলো সরাসরি গলিগুলোর মেঝেতে এসে পৌঁছয়। এখন সবে সাড়ে আটটা—তাই গলিগুলো সব ছায়াগলি।

গনিরামের একচিলতে ঝুপড়ি-ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল রোশন। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। সামনে ফাটল ধরা মেঝে। তার একপাশে উবু হয়ে বসে গনিরামের বিধবা দিদি সাবিত্রী আনাজপাতি কুটছে। আনাজপাতির বেশিরভাগটাই আলু, তার সঙ্গে মিশেছে বেগুনের দু-চারটে টুকরো।

রোশনকে দেখে সাবিত্রী উঠে দাঁড়াল। রোগা, কালো চেহারা। চোখগুলো বেশ বড়। মাথার চুলে পাক ধরেছে। কানে রুপোর দুল। এ ছাড়া আর কোনও অলঙ্কার নেই—প্রসাধনের তো প্রশ্নই ওঠে না!

'এসো—ভেতরে এসো...।' আটপৌরে ডুরে শাড়িতে হাত মুছে রোশনকে ভেতরে আসতে বলল সাবিত্রী। গনিরাম মারা যাওয়ার পর রোশন এ-ঘরে এতবার এসেছে যে, বলতে গেলে গনিরামের পরিবারের একজন হয়ে গেছে। অনেকটা নিতুয়ার মতো।

রোশন ঘরের ভেতরে ঢুকল।

দিনের বেলাতেও অন্ধকার-অন্ধকার ঘর। নীচু ছাদ। ঘরে কোনও জানলা নেই। তবে সামনের আর পিছনের দেওয়ালে বড়-বড় তিনটে ঘুলঘুলি রয়েছে।

ঘরে আসবাবপত্র বলতে একটা 'কোনওরকম' খাট। খাটটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উঁচু। উঁচু কেন বোঝা যায় খাটের নীচে গাদা করা দুনিয়ার জিনিসপত্র দেখে।

খাট ছাড়া ঘরে রয়েছে দুটো ছোট টুল, একটা ছোট টিভি, আর মেঝেতে বসানো একটা টেবিল ফ্যান। ফ্যানটা কড়কড় আওয়াজ করে ঘুরছে। রোশনের পায়ে হাওয়া লাগছে।

ঘরের একদিকের দেওয়ালে গনিরামের একটা ফটো। ভোটার কার্ডের ফটো থেকে বড় করে নিয়ে রোশন বাঁধিয়ে দিয়েছে। এই বাঁধানো ফটোটা গনিরামের শ্রাদ্ধের সময় ব্যবহার করা হবে।

সামনের একটা টুল দেখিয়ে সাবিত্রী রোশনকে বসতে বলল।

রোশন না বসে ঘরের ভেতরে আরও একটু ঢুকে এল, জিগ্যেস করল, 'কত টাকা উঠল?'

'মাত্র সাড়ে চারশো।' সাবিত্রী ঠোঁট উলটে বলল, 'ভেবেছিলাম তোমাকে কল করে জানাব, তা তোমার তো আবার মোবাইল নেই...।' খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সাবিত্রী। ওর দৃষ্টি ফাঁকা। আলতো করে বলল, 'ভাইটা মরেও আমার ঘাড়ে ঝামেলা দিয়ে গেল...।'

রোশন চিন্তায় ঠোঁট কামড়াল। বিড়বিড় করে বলল, 'মাত্র সাড়ে চারশো!'

সাবিত্রী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'এই বস্তি থেকে আর কত চাঁদা উঠবে! আমি তো তোমাকে প্রথম থেকেই বলেছিলাম। একে মড়া পোড়ানোর সময় কেউ-কেউ টাকাপয়সা দিয়েছে...তারপর আবার...।'

সাবিত্রী কিছু ভুল বলেনি। গনিরামের সৎকারের সময় মোট যা-যা খরচ হয়েছিল তার সবটা পলানের টাকায় মেটেনি। নিতুয়া টাকা দিয়েছে, রোশন টাকা দিয়েছে। এ ছাড়া বারো নম্বরের আরও অনেকে কিছু-কিছু করে টাকাপয়সা দিয়েছে।

কিন্তু এখনও তো গনিরামের শ্রাদ্ধ বাকি! সাবিত্রীর খুব ইচ্ছে, বেশ নিয়ম-টিয়ম মেনে ওর ভাইয়ের শ্রাদ্ধ হোক। কিন্তু তার জন্য খরচ আছে! তার ওপরে লোক খাওয়ানোর খরচ। সেই খরচ তুলতেই নিতুয়া কয়েকজন ছেলেপিলে সঙ্গে নিয়ে বস্তিতে চাঁদা তুলছে। তুলতে-তুলতে বস্তি এলাকার বাইরেও চলে গেছে ওরা।

ব্যাপারটা রোশনের ভালো লাগেনি। ওর মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা যেন ছদ্মবেশে ভিক্ষাবৃত্তি। তাই ও অন্যরকম কিছু একটা ভেবেছে।

সে-কথা মনে রেখেই ও একটা হাত তুলে সাবিত্রীকে ভরসা দিতে চাইল। একইসঙ্গে হাসতে চেষ্টা করল।

কিন্তু কাঁধের কাছে একটা ব্যথা ওর হাত তোলার কাজটা পুরোপুরি করতে দিল না। হাসিটাও ঠিকঠাক হল না—মুখটা একটু কুঁচকে গেল যন্ত্রণায়।

'কী হল, রোশন? তোমার ব্যথা এখনও মরেনি?' সাবিত্রীর গলায় উদ্বেগ।

'না, দিদি—ও কিছু নয়।'

রোশন মনে-মনে হিসেব করল। পলানের গুন্ডাগুলো ওকে মেরেছে আটদিন আগে। ওর মনের জোর আর বিশ্বরূপ জোয়ারদারের যত্ন-আত্তি সেই মারধোরের ব্যথা আটদিনে অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। তবে কমিয়ে দিলেও শরীরের কোথাও-কোথাও কমবেশি অসুবিধের ছোঁয়া রয়ে গেছে। যদিও ব্যথা কিছুটা কমতেই ও অল্পস্বল্প ব্যায়াম শুরু করে দিয়েছে।

এমন সময় সামনের রেললাইন দিয়ে হুড়মুড় করে একটা লোকাল ট্রেন ছুটে গেল। গনিরামদের ঘরের মেঝেটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। টালির চালের টালির সেটিং কোথাও ঢিলে থাকায় কাঁপুনির তালে-তালে খটাখট শব্দ হতে লাগল।

ট্রেন চলে যেতেই সব আবার কেমন চুপচাপ হয়ে গেল।

রোশন একটু অস্বস্তি নিয়ে হাসল। তারপর সাবিত্রীকে বলল, 'দিদি, তুমি চিন্তা কোরো না—টাকা ঠিক উঠে যাবে। ববিন কোথায়? আমি ওকে নিয়ে একটু বেরোব...।'

'ও পায়খানায় গেছে। আমি নিজে গিয়ে ওকে লাইনে দাঁড় করিয়ে এসেছি। নইলে বাচ্চা ছেলে বলে ওকে হাটিয়ে দিয়ে সবাই টপকে যায়...।'

বস্তির লোকজনের জন্য সরকার থেকে হাফডজন পায়খানা আর বড় বাঁধানো কলতলা তৈরি করে দিয়েছে। রোজ সকালে সেখানে লাইন পড়ে। তবে কেউ-কেউ এখনও পুরোনো অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। তারা রেললাইনের ধারের ঝোপঝাড়ে কাজ সারতে চলে যায়।

'ববিনকে নিয়ে কোথায় যাবে?' সাবিত্রী জানতে চাইল।

'চাঁদা তুলতে বেরোব। শ্রাদ্ধের খরচের জন্যে—।'

রোশন ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। যে-গলি দিয়ে ববিন ফিরে আসবে সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ববিনকে নিয়ে ও ঠিক কোথায় যাবে সেটা ও সাবিত্রীকে বলল না। ইচ্ছে করেই একটু এড়িয়ে গেল।

রোশন ববিনের পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে দেখে সাবিত্রী বলল, 'এখুনি চলে আসবে। অনেকক্ষণ আগে ওকে লাইনে দিয়ে এসেছি...।'

সাবিত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই ববিনকে দেখা গেল। খালি গা, খালি পা—কোমরে একটা গামছা। গলায় সাদা কাপড়ের টুকরোয় বাঁধা একটা চাবি ঝুলছে।

ছেলেটা তরতর করে হেঁটে আসছে। রোগা, মাঝারি রং, মাথায় অনেক চুল।

সাবিত্রী রোশনকে দেখছিল। ববিনকে নিয়ে এই সকালবেলায় কোথায় যাবে ও? ফিরতে দেরি হবে কি না কে জানে! দেরি হলে খবর নেওয়ারও কোনও উপায় নেই। কারণ, রোশন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে না। কেন ব্যবহার করে না সে-কথা জিগ্যেস করলে রোশন বলে, 'কার জন্যে মোবাইল রাখব! যাদের জন্যে রাখা দরকার ছিল তারা সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে...। তাই এখন মোবাইল ছাড়াই বেশ আছি।'

এ-কথা সাবিত্রীকে আগে বলেছে রোশন। বিশ্বরূপদা আর নিতুয়াও জানে এ-কথা।

ববিন রোশনকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকছিল। রোশন ওকে বলল, 'চট করে রেডি হয়ে নে—আমার সঙ্গে একটু বেরোবি...।'

ববিন সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় কাত করে রাজি : 'এক্ষুনি আসছি, কাকু—।'

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ববিন বেরিয়ে এল। কোনওরকমে ধুতি আর উড়ুনি পরে নিয়েছে। পায়ে হাওয়াই চটি। ওর কোরা ধুতি আর উড়ুনি এর মধ্যেই বেশ ময়লা হয়ে গেছে।

সাবিত্রী তাড়াহুড়ো করা ছেলেটার মাথা আঁচড়ে দিচ্ছিল। রোশনকে বলল, 'দেখো, বেশি দেরি কোরো না। ছেলেটা সকাল থেকে শুধু দুটো বিস্কুট খেয়েছে। ও ফিরে এসে চানাচুর মুড়ি খাবে। তখন তুমিও একটু চা খেয়ে যেয়ো...।'

রোশন ববিনকে নিয়ে এগোল। এখন ও পলানের কাছে টাকা চাইতে যাবে। চাঁদা—গনিরামের শ্রাদ্ধের জন্য। পলান কিছুতেই ওর দায় এড়াতে পারে না। রোশনের বিশ্বাস, কাছা নেওয়া বাচ্চা ছেলেটাকে দেখলে পলানের হয়তো একটু দয়া-মায়া হবে। যদিও কোনও গুন্ডার দয়া কিংবা মায়ার ওপরে রোশনের কোনও শ্রদ্ধা নেই। তবে পলানের দায়ের ব্যাপারটা কিছুতেই ও মাথা থেকে সরাতে পারছে না।

পলানের কাছে যাওয়ার কথা ও সাবিত্রীকে বলেনি। কারণ, বললে পর সাবিত্রী হাঙ্গামা শুরু করে দিত। আর ববিন এই কয়েকদিনে এই নতুন 'কাকু'-টার এতটাই ন্যাওটা হয়ে পড়েছে যে, কাকুর সঙ্গে রাস্তায় বেরোতে পারলেই ও খুশি। বাবা চলে যাওয়ার দুঃখটা এই কাকুটা এর মধ্যেই অনেকটা ভুলিয়ে দিয়েছে। তবে বাবার ফটোটার দিকে চোখ পড়লে ববিনের খুব কান্না পায়। তাই যতক্ষণ ও ঘরে থাকে ততক্ষণই ও বাবার ফটোর দিক থেকে নজর সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

ববিনকে সঙ্গে করে এ-গলি সে-গলি দিয়ে হেঁটে চলল রোশন। হাঁটতে-হাঁটতে একসময় বেরিয়ে এল রেললাইনের ধারে। এখানে রেললাইনের পাশাপাশি পায়ে হাঁটা স্ট্রেইটকাট পথ। এই রাস্তা ধরে গেলে সময় কিছুটা বাঁচবে।

রোশন আর ববিন হাঁটতে লাগল। রোশনের নাকে দুর্গন্ধের ছোঁয়া আসছিল। ওর পাশে-পাশে চলেছে জং ধরা বাতিল রেললাইন। লাইন ডিঙিয়ে ওদিকটায় তাকালে ঝকঝকে রেললাইনের সারি চোখে পড়ে। তার পরে রয়েছে আগাছার ঝোপঝাড়। সেই ঝোপ-জঙ্গল পেরোলেই উঁচু পাঁচিল। সেই পাঁচিলের ওপাশে সুন্দর-সুন্দর কয়েকটা ফ্ল্যাটবাড়ি। বাড়ি তো নয়, রংচঙে হাইরাইজ!

সত্যি, রেললাইনের এপার-ওপার কী ভীষণ দুরকম! জং ধরা রেললাইনের পাশে অভাবের লালা মাখানো জং ধরা পোকামাকড়ের জীবন। আর ঝকঝকে রেললাইনের দিকে বার্নিশ করা ঝকঝকে উষ্ণ জীবন।

রোশন ববিনের হাত চেপে ধরল। ছেলেটা যা দুরন্ত! আচমকা রেললাইনের দিকে ছুট না লাগায়।

চলার পথে দু-একটা টাইম কল চোখে পড়ল। এই কলগুলোর লাইন বে-আইনিভাবে টানা। বস্তির লোকরাই মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাপ থেকে পাইপ লাগিয়ে মাটির নীচ দিয়ে নিজেদের পছন্দমতন এদিকে-ওদিকে লাইন টেনে নিয়ে গেছে। সেইসব কলের জল সরু হলেও কাজ চলে যায়।

একটু পরেই বাঁ-দিকে বাঁক নিয়ে অন্য রাস্তা ধরল রোশন। ঘড়ি দেখল, প্রায় ন'টা বাজে। এই সময় থেকে প্রায় ঘণ্টা তিনেক পলানকে 'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' দোকানটার সামনে পাওয়া যায়। সেখানে দুটো বেঞ্চি পেতে ও সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে আড্ডা দেয়। সকালবেলা ওটাই পলানের ঠেক।

চৌরাস্তার বিবেকানন্দর মূর্তির কাছে গিয়ে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে মিনিট চার-পাঁচেক হেঁটে গেলেই 'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। একটা বড় রাস্তা, আর একটা গলির কাটাকুটির এক কোনায় কর্নার প্লটে দাঁড়িয়ে আছে দোকানটা। আশাপুরের ব্যস্ত জায়গায় থাকার ফলে মিষ্টির দোকানটা বেশ চালু। তা ছাড়া পলান বহু মানুষকে এই দোকান থেকে মিষ্টি কেনার জন্য 'অনুরোধ' করে থাকে। আর পলানের 'অনুরোধ' মানে সেটা আদেশের খুব কাছাকাছি।

পলান 'জনপ্রিয়'-র পাবলিসিটি করে বলে ও এবং ওর শাগরেদরা এই দোকান থেকে সারা মাস ধরে খেয়াল-খুশি মতো নোনতা আর মিষ্টি খায়, আর মাস গেলে পলান থোক পাঁচশো টাকা মালিক নবকান্ত ঘোষের হাতে ধরিয়ে দেয়। গড়ে প্রতি মাসে হাজার কি দু-হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে জেনেও নবকান্ত চুপচাপ থাকেন। কারণ, ওঁকে আর হপ্তায়-হপ্তায় আলাদা করে 'পলান চ্যারিটি ফ্যান্ড'-এ ডোনেশান দিতে হয় না।

বস্তির গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়েই রোশন একটা সাইকেল রিকশা ধরে নিয়েছিল। সেখানে ও আর ববিন পাশাপাশি বসে রিকশার ঘোমটা তুলে দিল। কারণ, রোদ ক্রমশ চড়া হচ্ছে।

রাস্তাঘাট শান্ত, স্বাভাবিক। দেখে মনেই হয় না এই শান্ত এলাকায় কোনওরকম অশান্তি থাকতে পারে। আটদিন আগে রোশনকে যে দিনের আলোয় খোলা রাস্তায় আমজনতার চোখের সামনে বেধড়ক পেটানো হয়েছে সেটাও এখন মনে হচ্ছে স্বপ্ন অথবা কল্পনা।

রাস্তার একটা গর্তে চাকা পড়তেই রিকশাটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। রোশনের শরীরও ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। ও গায়ের ব্যথা টের পেল। ও ববিনের হাত আঁকড়ে ধরে বসেছিল, যাতে রিকশার ঝাঁকুনিতে ছেলেটা সিট থেকে পড়ে না যায়। এখন হাতের বাঁধনটাকে আরও শক্ত করল।

ববিন হঠাৎ বলে উঠল, 'কাকু, আমাকে একটা বড় বল কিনে দেবে?'

রোশনের নজরে পড়ল, রাস্তার পাশ ঘেঁষে একজন ভদ্রলোক হেঁটে যাচ্ছেন—সঙ্গে ববিনের বয়েসি একটি ছেলে। ছেলেটার হাতে একটা সাদা-কালো নকশা কাটা ফুটবল।

রোশন ববিনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'কিনে দেব—আগে পরশুদিন তোর বাবার পুজোটা মিটে যাক...।'

'পুজো' মানে শ্রাদ্ধ। ববিনকে এটাই বুঝিয়েছে রোশন। গনিরামের শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে গেলে ববিন আর সাবিত্রীর ব্যাপারটা নিয়ে ওকে ভাবতে হবে। কী করে এই দুটো প্রাণীর পেট চলবে? এর-ওর-তার কাছে হাত পেতে বা চাঁদা তুলে দু-চারদিন চলতে পারে, তার বেশি তো নয়!

তখনই ওর মনে পড়ল, এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলতে হবে। এটিএম কার্ডটা যে ওর সঙ্গেই আছে সেটা যাচাই করতে প্যান্টের পকেটের ওপর দিয়ে হাত রাখল রোশন। অনুভবে বুঝল, কার্ডটা ওর সঙ্গে আছে।

রিকশা গতি কমিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' এসে গেছে। ওই তো, পলান আর তার দলবল দোকানের এক সাইডে দুটো বেঞ্চি পেতে মুখোমুখি বসে আছে। ওদের সামনেই ফুটপাথের ওপরে একটা বড় বটগাছ। তারই ছায়ায় বসে আছে ওরা। ছায়া সরে গেলে ওরা বেঞ্চিগুলোকে সেইমতো সরিয়ে নেয়।

বেঞ্চি দুটোর কাছাকাছি চারটে বাইক স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো। তার মধ্যে লাল রঙের বড় বাইকটা পলানের।

রিকশা থেকে নেমে দাঁড়াল রোশন আর ববিন। রিকশাওয়ালা ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

রোশন পলানের দিকে তাকাল। ট্রেড মার্কগুলো আগে চোখে পড়ল ওর। মাকড়ি, বালা, আংটি। গায়ে রাউন্ড নেক জামরঙা টি-শার্ট, পায়ে রং চটা জিনস আর স্ট্র্যাপ দেওয়া চপ্পল।

পলানের শাগরেদদের মধ্যে কানুয়া আর কাটা নগেনকে চিনতে পারল রোশন—বাকিদের চেহারা অচেনা। তবে তাদের চরিত্র বোধহয় অচেনা নয়। এদের দু-একজন হয়তো ওকে পেটানোর সময় অ্যাক্টিভ ছিল। রোশনের মুখগুলো মনে নেই।

কিন্তু ববিনকে নিয়ে পলানের দিকে এগোতে গিয়ে থমকে গেল ও।

পলানের হাতে খবরের কাগজের একটা পোঁটলা ছিল—সেটা ধীরে-ধীরে ও খুলছিল। কাগজের মোড়ক সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা চকচকে রিভলভার।

পলানের মুখোমুখি বসে একজন মোটা মতন লোক হাত নেড়ে পলানকে রিভলভারটা সম্পর্কে নানান কথা বলছিল, বোঝাচ্ছিল।

'পলানদা, এটা স্প্যানিশ মাল। ''লামা-মডেল থ্রি-এ''। অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি। মালটা একেবারে আপনার হাতসই। মাত্র ছ'শো-সাড়ে ছ'শো গ্রাম ওয়েট। সিঙ্গল অ্যাকশন। সাত রাউন্ড ফায়ার করতে পারবেন। এ-ওয়ান মাল—তবে দাম একটু বেশি...।'

'কত?' পলান জিগ্যেস করল। রিভলভারটা হাতে বাগিয়ে ধরে পরখ করে দেখতে লাগল।

'আপনার জন্যে, দাদা, সাড়ে তিন লাখ—।' চোখ ছোট করে হেসে বলল লোকটা।

রিভলভারটা দেখামাত্রই রোশন ববিনকে নিজের পিছনে টেনে নিয়েছিল—যাতে ছোট ছেলেটা অস্ত্রটা দেখতে না পায়।

'সাড়ে তিন লাখ!' চোখ কপালে তুলল পলান : 'রেটটা বড্ড হাই হয়ে যাচ্ছে...।' কথা বলতে-বলতে রিভলভারটা আবার খবরের কাগজে মুড়ে ফেলল।

'তা জিনিসটাও তো হাই-ফাই, দাদা—।'

কিছুক্ষণ দরাদরির পর তিন লাখ বিশ হাজারে দামের সেটলমেন্ট হল।

পলান কাগজে মোড়া অস্ত্রটা কানুয়ার হাতে দিয়ে বলল, 'মালটা জায়গা মতো রেখে আয়—।' তারপর আর্মস ডিলারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল সকালে এরকম সময়ে এখানে এসে নোট নিয়ে যাবেন...।'

মোটা মতন লোকটা যাবতীয় দাঁত বের করে হাসল। প্রায় নব্বই ডিগ্রি ঘাড় কাত করে বলল, 'নো প্রবলেম, পলানদা, নো প্রবলেম। কাল এরকম সময়ে চলে আসব।'

লোকটা চলে যেতেই ববিনের হাত ধরে পলানের বেঞ্চির আরও কাছে এগিয়ে গেল রোশন। ততক্ষণে কানুয়া একটা বাইকে চড়ে রওনা হয়ে গেছে।

পলান রোশনদের দিকে কোনও নজরই দিচ্ছিল না। শাগরেদদের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রোশনের মনে হল, পলান যেন ওদের দেখেও না দেখার ভান করছে। তাই আর কোনও উপায় না দেখে ও ডেকে উঠল।

'পলানদা—।'

পলানের কথাবার্তা থমকে গেল। ভুরু কুঁচকে অচেনা চোখে তাকাল রোশনের দিকে। ওপরদিকে মাথা ঝাঁকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কে তুই?'

রোশন হাসল : 'এর মধ্যে ভুলে গেলেন? সেই যে আটদিন আগে ''আশাপুর লজ''-এর সামনে সকালবেলা আমাকে চার-পাঁচজন মিলে পেটাল। আপনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। পুলিশ এল। আপনার সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলে চলে গেল। মনে পড়ছে?'

পলানের উলটোদিকের বেঞ্চি থেকে একটা রাফ ছেলে ধমকে উঠল, 'অ্যাই সালা, চোপ! ঠুকে-ঠুকে কথা! লাথি মেরে মুখ ভেঙে দেব...।'

রোশন ছেলেটার দিকে ঘুরে তাকাল : 'অ্যাই, ভদ্রভাবে কথা বল। আমার সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে রয়েছে। ওর সামনে গালাগাল দিবি না।'

রোশনের কথা শেষ হতে-না-হতেই ছেলেটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপরে।

ঝাঁপিয়ে পড়ার পর যে-কাণ্ডটা ঘটল তাতে ছেলেটার মনে হল, ঝাঁপিয়ে না পড়লেই বোধহয় ভালো ছিল—অন্তত ওর স্বাস্থ্যের পক্ষে।

চোখের পলকে রোশন ওর ডানহাতটা টানটান করে সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিল। গোটা হাতটা দেখাচ্ছিল শক্ত কাঠের মতো। আর সেই কাঠের প্রান্তে হাতের আঙুলগুলো বেঁকে গিয়ে একটা অর্ধচন্দ্র তৈরি করে ফেলেছিল।

ঝাঁপিয়ে পড়া ছেলেটার গলা রোশনের তৈরি অর্ধচন্দ্রের ফাঁদে পা দিল। এবং রোশন ওর টুঁটি টিপে ধরল।

ছেলেটা যেসব গালিগালাজ শুরু করেছিল সেগুলো আর শেষ করে উঠতে পারল না। রোশনের হাতের চাপে সেগুলো আচমকাই থমকে গেল। ছেলেটা রোশনের কাঠের মতো অনমনীয় হাতটাকে দু-হাত দিয়ে পাগলের মতো খামচাতে লাগল। রোশনের হাত ছড়ে যেতে লাগল নখের আঁচড়ে। রক্তের ফোঁটা দেখা যাচ্ছিল, জ্বালাও করছিল বেশ—কিন্তু কাঠের হাতটা কাঠেরই রইল, রক্ত-মাংসের হল না।

শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ছেলেটার চোখ বড়-বড় গোল-গোল হয়ে গিয়েছিল। ও কেমন অদ্ভুত অবাক ভঙ্গিতে রোশনের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন কোনও অবাক ভয় পাওয়া পুতুল।

কিন্তু রোশনের দৃষ্টি নরম এবং ঠান্ডা। ও ছেলেটাকে পিছনদিকে ঠেলছিল। ছেলেটা ইচ্ছে না থাকলেও এক পা দু-পা করে পিছু হটছিল।

এইভাবে ছেলেটাকে ঠেলতে-ঠেলতে বেঞ্চির কাছে নিয়ে গেল রোশন—যে-বেঞ্চিতে রাফ অ্যান্ড টাফ ছেলেটা বসে ছিল।

ছেলেটা এখন আর প্রতিরোধ করার কোনওরকম চেষ্টা করছিল না। শুধু ক্লান্ত হাতের আলতো আঙুলে রোশনের 'কামড়' খোলার এলেবেলে চেষ্টা করছিল।

রোশনের হাতের চাপে ছেলেটার প্রতিরোধহীন শরীর ধীরে-ধীরে বসে পড়ল বেঞ্চিতে। এবং রোশন সঙ্গে-সঙ্গে ওর টুঁটি থেকে আঙুল সরিয়ে নিল। তারপর নিজের ঠোঁটজোড়ার ওপরে খাড়াভাবে তর্জনী ছুঁইয়ে ইশারায় বোঝাল, একদম চুপ। টুঁ শব্দটি কোরো না...।

ছেলেটা কাত হয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দুপাশ থেকে ওর দুজন দোস্ত ওকে আঁকড়ে ধরল। 'নোনতা...নোনতা' বলে ভরসা দেওয়ার ডাক ডাকতে লাগল। একজন নোনতার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। আর-একজন 'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর একজন সেলস বয়ের কাছে তাড়াহুড়ো করে একটা জলের বোতল চাইল। দোকানের আরও দুজন লোক কাচের কাউন্টারের ওপর দিয়ে গলা তুলে রোশনের ঘটনাটা দেখছিল। পলানের ছেলেটা জলের বোতল চাইতেই সেই দুজন লোক ভয় পাওয়া টিকটিকির মতো ভেতর দিকে সটকে গেল।

নোনতা তখন শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে। ওর গলার কাছটা লাল।

রোশন নোনতার টুঁটি টিপে ধরামাত্রই পলান বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটা এত আচমকা ঘটে গেছে যে, ও কী করবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না।

এখন সময় পৌনে দশটা। সামনের রাস্তায় ব্যস্ততার যথেষ্ট ভিড়। সাইকেল রিকশা, গাড়ি, হেঁটে চলা মানুষজন, সাইকেল, সব এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে। এখন যদি রোশনকে ধরে ও পালিশ দেয় তা হলে এখানে পলকে ভিড় জমে যাবে। লোকজন রোশনকে মারধোর করার কারণ জানতে চাইবে। পাবলিকের কৌতূহল। তখন বানিয়ে-বানিয়ে কোনও মিথ্যা বলা যাবে না। কারণ, গনিরামের ওই বাচ্চা ছেলেটা। কী যেন নাম? ও সব দেখেছে, শুনেওছে। ও পাবলিককে সব বলে দেবে। একে বাচ্চা ছেলে, তার ওপর গায়ে ওর অশৌচের পোশাক। পাবলিক ওর কথাই বিশ্বাস করবে।

তারপর কথায়-কথায় ওর বাবা কীভাবে মারা গেল সে-কথা উঠবে। সেখান থেকে চলে আসবে গোডাউন ফাইটের কথা। তারপর...।

নাঃ, ব্যাপারটা পলানের ফর-এ যাবে না। পরে অসুবিধে হতে পারে।

পলান দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এসবেরই তোলমোল করছিল।

তবে রোশন ছেলেটার আস্পর্ধা দেখে তাজ্জব লাগছে। এই সেদিন রাস্তার ওপরে পাবলিক প্লেসে ওকে ওরকমভাবে মারা হল, তাতেও ওর ধক কমেনি!

পলান দেখল, নোনতা মোটামুটি সামলে উঠেছে। ওর মুখে মাথায় জলের ছিটে দিচ্ছে পলানের দুজন চ্যালা—সোমেন আর তাতান। নোনতা গলায় হাত বোলাচ্ছে, তাকিয়ে আছে পলানের দিকে। চোখের নীরব আকুতি যেন বলতে চাইছে, 'পলানদা, বদলা নাও। কিছু একটা তো করো...।'

পলান আঙুলের ইশারায় রোশনকে কাছে ডাকল, বলল, 'অ্যাই, শোন। সাতসকালে এখানে কী লাফড়া পাকাতে এসেছিস?'

রোশন পলানের কাছে এগিয়ে এল : 'আমি তো কোনও ঝামেলা পাকাইনি—।' ওর মুখ-চোখ শান্ত। একটু আগের এনকাউন্টারের কোনও এফেক্ট সেখানে নেই।

'তুই আমার ছেলের গায়ে হাত দিস কোন সাহসে?'

'আমি তো ওর গায়ে হাত তুলিনি। ও-ই তো আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে মারতে আসছিল। আমি শুধু ওকে ববিনের সামনে নোংরা গালিগালাজ করতে বারণ করেছিলাম। বাচ্চাদের সামনে গালাগাল দেওয়াটা ঠিক নয়।'

রোশন যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, তার একটু দূরেই বড় মাপের কাঁচা ড্রেন। সেখানে কালো রঙের থকথকে নোংরা জল। সেই জলে মশার লার্ভা সাঁতরাচ্ছে। রোশনের মনে হল, নোনতার মুখ নর্দমার এই জলের চেয়েও নোংরা।

কাটা নগেন কখন যেন বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পলানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ও হঠাৎ বলে উঠল, 'তুই নোনতাকে সাডেনলি হিট করলি কেন?'

রোশন শান্ত গলায় বলল, 'হিট করিনি। এটাকে বলে সেলফ ডিফেন্স। তুমি তো গুড ইংলিশ জানো। নিশ্চয়ই এর মিনিং আন্ডারস্ট্যান্ড?'



পলান বুঝল, রোশন কাটা নগেনের ইংরেজি বলার বাতিককে 'টোন' করছে। তবে নগেন সেটা বুঝতে পারল বলে মনে হল না। ও দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'যা-যাঃ, আর জ্ঞান দিতে হবে না। পলানদা, লাগাও তো মালটাকে দু-ঝাঁপড়—তা হলেই সব তেল ড্রাই হয়ে যাবে...।'

রোশন পলানের চোখের দিকে তাকাল, বলল, 'আপনি আমাকে মারতে পারেন। আমি কোনও বাধা দেব না। আমি জানি, ওই একটা জিনিসই আপনি পারেন। এ ছাড়া আপনার আর কোনও গুণ নেই। তা ছাড়া আপনার দলের হাতে মার খাওয়াটা আমার ধীরে-ধীরে অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। তো সেটাই বা খারাপ কী!'

পলান একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল। তারপর ভুরু কুঁচকে বিরক্তভাবে জিগ্যেস করল, 'বল, কী চাই? কীজন্যে এসেছিস আমার কাছে?'

রোশন তখন সংক্ষেপে গনিরামের কথা বলল। বলল, গনিরাম কীভাবে ব্লাইন্ড ফাইটে মারা গেছে। তারপর ববিনকে কাছে ডাকল। ওর মাথায় হাত রেখে বলল, 'গনিরামের ছেলে। ববিন। চারবছর আগে ওর মা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে...।'

'তো আমি কী করব?'

'পলানদা, চারদিন পর গনিরামের শ্রাদ্ধ—' রোশনের গলা নরম হল। একটু ইতস্তত করে ও বলল, 'শ্রাদ্ধের খরচের জন্যে আপনার কাছে হেলপ চাইতে এসেছি...মানে ডোনেশন...।'

'আমি হঠাৎ ডোনেসন দিতে যাব কেন? ওর বস্তিতে চাঁদা তোল—।'

'সে তো তুলছি। কিন্তু সে আর কইটুকু! আপনি যদি একটু বেশি ডোনেশন দেন তো শ্রাদ্ধটা উতরে যায়। প্লিজ, পলানদা।'

পলান রোশনকে ভালো করে দেখল। তারপর ববিনকে। কিছুক্ষণ কী চিন্তা করল। শেষমেশ পকেটে হাত ঢুকিয়ে একগাদা নোট বের করে নিল। পাঁচশো টাকা আর একশো টাকার নোট। তবে পাঁচশো টাকার নোটই বেশি। সেখান থেকে তিনটে একশো টাকার নোট বেছে নিয়ে রোশনের দিকে এগিয়ে ধরল : 'নে—।'

রোশন যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল। অল্প হেসে বলল, 'আপনার কাছ থেকে অনেক বেশি আশা করেছিলাম, পলানদা। অন্তত সাতহাজার টাকা...।'

'সাতহাজার টাকা!' পলানের চোখ কপালে উঠল : 'টাকা কি গাছ নেড়ে আসে?'

' ''আশাপুর লজ''-এর বিশ্বরূপদার কাছ থেকে আপনার ছেলেরা যেভাবে মাসে চারহাজার টাকা করে চাইছে তাতে এটাই তো মনে হয় যে, টাকা সত্যি-সত্যিই গাছ নেড়ে আসে। তা আপনার কী মনে হয়?'

কাটা নগেন এবং পলানের অন্য চ্যালাদের মনে হল, রোশন এসব বেহুদা কথা বলে ওদের 'পলানদা'-কে চাটছে।

নগেন দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় পলানকে বলল, 'পলানদা হিট ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করে দাও...।'

পলান হাতের ইশারায় ওকে চুপ করতে বলল। নিজেও চুপ করে রইল। বোধহয় কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

রোশন বলল, 'গনিরাম কীভাবে মারা গেছে মনে আছে? ব্লাইন্ড ফাইট লড়তে-লড়তে। আপনি তো ওই ফাইটের অর্গানাইজার। তা হলে তো আপনার একটা দায় থাকছে, নাকি?'

'ও মারা যাওয়ার পর আমি অনেক টাকা দিয়েছি—' পলান যে নিজেকে বেশ চেষ্টা করে শান্ত রাখছিল সেটা ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

'তা দিয়েছেন...' রোশন স্বীকার করল, 'কিন্তু শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজটা উতরে না দিলে হয়! একবার এই অনাথ বাচ্চাটার কথা ভাবুন তো!' ববিনকে দেখাল রোশন : 'বলুন, পলানদা, এই বাপ-মা মরা ছেলেটার ভবিষ্যৎ কী?'

পলান ববিনের দিকে তাকাল। সরল চোখ, নিষ্পাপ মুখ—অথচ ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শেষ পর্যন্ত হয়তো অন্ধকার জগতের দিকেই চলে যাবে ছেলেটা।

'ওর ভবিষ্যৎ কী তা জানি না, তবে সাতহাজার টাকাটা দেওয়া একেবারে অসম্ভব। ম্যাক্সিমাম শ'পাঁচেক টাকা দিতে পারি...।'

'পলানদা, আপনি এমনভাবে বারগেন করছেন যেন এটা দুর্গাপুজো বা শিবরাত্রির চাঁদা।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল রোশন। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আমি তা হলে যাই। ববিনকে সঙ্গে করে ওর বাবার শ্রাদ্ধের জন্যে চাঁদা তুলি। বাজারের কাছে, বিবেকানন্দের স্ট্যাচুর কাছে, জগন্ময়ীর কালীমন্দিরের কাছে, হাইরোডের কাছে, সব জায়গায় ঘণ্টাখানেক করে দাঁড়াই। লোকজনকে বলি গনিরামের কথা, বলি কীভাবে ও ব্লাইন্ড ফাইটের সময় হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। তার সঙ্গে এও বলব, পলানদা পাঁচশো টাকার বেশি দিতে পারবে না বলেছে। তাই আমি আর এই বাপ-মা মরা ছেলেটা আপনাদের কাছে হাত পেতে সাহায্য চাইছি। আমাদের সাত হাজার টাকা তুলতে হবে। আপনারা সবাই দয়া করে হেলপ করুন...।'

রোশনের কথায় পলানের কনফিডেন্স নড়ে গেল। এই নতুন ছেলেটা বলে কী! গনিরামের শ্রাদ্ধের খরচ জোগাড় করতে ও এখন ববিনকে নিয়ে আশাপুরের সব জায়গায় ভিক্ষে করে বেড়াবে! তাহলে তো পলানের গোডাউন ফাইটের নেগেটিভ প্রচারের আর কিছু বাকি থাকবে না!

এমনিতেই রোশনকে মারার ঘটনাটা অনেকে জেনে গেছে। রোশন নিজেই বিনা কারণে ওর মার খাওয়ার ব্যাপারটা একে-তাকে বলে বেড়িয়েছে। পলানের কাছে সে-খবর এসেছে। এর ফলে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। তার মধ্যে প্রধান প্রশ্ন : একটা নির্দোষ ছেলেকে পলানরা শুধু-শুধু মারল কেন?

আসলে পলানের পকেট মারার গল্পটা শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি।

না, রোশনকে খুব সাবধানে সাইজ করতে হবে। এমনভাবে ওর ইমেজটাকে দাঁড় করাতে হবে যাতে পাবলিকের সিমপ্যাথি ওর দিকে না যায়। বরং পাবলিক যেন এই অচেনা ছেলেটাকে অপছন্দ করতে শেখে। ঘেন্না করতে শেখে। আশাপুরে এসে আলটপকা গজিয়ে ওঠা ওই অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেটা যেন কিছুতেই ওর পায়ের তলায় শক্ত জমি তৈরি করতে না পারে।

পলান রোশনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল অথচ রোশনকে দেখছিল না। ওর মনের কোণে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করছিল। বুঝতে পারছিল, বুদ্ধি দিয়ে এই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

হঠাৎই পলান বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে! আর ঝামেলা বাড়াতে হবে না। আমি সাতহাজার টাকাই দিচ্ছি—এ নিয়ে আর কোনও ক্যাজরা করিস না।'

পলান টাকা গুনতে শুরু করল। সাতহাজার টাকা হতেই টাকাটা রোশনের দিকে বাড়িয়ে ধরল : 'এই নে —পুরো সাতহাজার আছে...।'

রোশন টাকাটা নিল। ওর পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ববিনের দিকে একবার তাকাল। তারপর ছেলেটাকে বলল, 'অ্যাই, পলানকাকুকে প্রণাম কর...।'

পলান কিছু বুঝে ওঠার আগেই ববিন বাধ্য ছেলের মতো ওকে টকাটক প্রণাম করে ফেলল।

রোশন বলল, 'বৃহস্পতিবার গনিরামের ঘাটকাজ, শুক্রবার শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধের দিন দুপুরে বারো নম্বরে ববিনদের ঘরে আসবেন। আপনার নামে হিসেবে তিনজন গেস্ট ধরলাম...।'

পলান সামান্য ঠোঁট চওড়া করে হাসল। বলল, 'যাব...।'

ঠিক তখনই রোশনের পিঠের কাছে জামাটা কে যেন খামচে ধরল।

রোশন ঘুরে তাকাল। নোনতা। ওর দু-চোখ রাগে জ্বলছে। ঠোঁট সরে গিয়ে হলদেটে দাঁত দেখা যাচ্ছে। ওর দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে সোমেন আর তাতান।

রোশন চট করে ঘুরে দাঁড়াল। সেই ঝটকায় জামাটা নোনতার হাত থেকে ছুটে গেল।

পলান কিছু একটা আঁচ করেছিল। তাই তাড়াহুড়ো করে ধমকে উঠল, 'অ্যাই, নোনতা! না, একদম না! সরে যা! সরে যা!'

নোনতা হিংস্র রাগে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

'না, পলানদা! এই জানোয়ারের বাচ্চাটা আমার গায়ে হাত তুলেছে। একে আমি ছাড়ব না...।'

এরপর নোনতা যেসব নোংরা শব্দ ব্যবহার করতে লাগল তাতে কাঁচা ড্রেনের কালো থকথকে নোংরা জলও লজ্জা পাবে।

রোশন কিন্তু প্রতিক্রিয়া দেখাতে একটুও দেরি করল না। শূন্যে হাত ঘুরিয়ে সপাটে এক রাম থাপ্পড় বসিয়ে দিল নোনতার বাঁ গালে।

বোমা ফাটার মতো তীব্র শব্দ হল একটা। নোনতার শরীরটা দুবার লাট খেয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

রোশন ওর শরীরটার দিকে ঘেন্নার চোখে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, 'একবার তো বললাম, বাচ্চা ছেলের সামনে গালাগাল দিবি না। আর যখন-তখন যার-তার গায়ে হাত তোলার অভ্যেসটা ভালো না। তাতে শরীর খারাপ হতে পারে।'

রোশন এমনভাবে কথাবার্তা বলছিল যেন চড় খেয়ে নোনতার রাস্তায় ছিটকে পড়ার ঘটনাটা খুবই স্বাভাবিক।

পলান রোশনের স্পর্ধা আর হিম্মত দেখে ভেতরে-ভেতরে অবাক হচ্ছিল। কোথা থেকে উড়ে এসে আশাপুরে জুড়ে বসা একটা আনচাক্কা ছেলে...সে কি না পলানের ছেলের গায়ে হাত তুলছে!

মারপিটের এই ঘটনার ঝলক দু-চারজন লোকের চোখে পড়েছিল। তারা 'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রোগা মতন একজন ভদ্রলোক একটা ঝরঝরে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নোনতার পড়ে যাওয়া দেখে পলানদের বেঞ্চি ঘেঁষে, পলানের একেবারে কাছে, সাইকেল দাঁড় করিয়ে দিলেন। এক পা প্যাডেলে, অন্য পা রাস্তায়।

ভদ্রলোকের মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। শার্ট-প্যান্ট যথেষ্ট ময়লা। দু-এক জায়গায় তালিমারা। ওঁর চোখ দুটো বড়-বড় কিন্তু ছলছলে, ঘোলাটে। মুখ থেকে বাজে গন্ধও বেরোচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, সাতসকালে চড়িয়ে এসেছেন।

রোশন তখন পলানকে বলছে, 'পলানদা, আজ চলি। শুক্রবারে আপনারা আসবেন কিন্তু...।'

রোশনের আচরণ একেবারে স্বাভাবিক—যেন কিছুই হয়নি।

পলান অল্প হেসে ঘাড় নাড়ল : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—নিশ্চয়ই যাব।'

একইসঙ্গে মনে-মনে বলল, 'দাঁড়াও, তোমাকে ঠিকানায় লাগানোর বন্দোবস্ত করছি। এমন বন্দোবস্ত, যাতে পাবলিক তোমাকে ধরে পেটায়...।'

রোশন ববিনের হাত ধরে হাঁটা দিল।

নোনতা তখন বন্ধুদের হাতে ভর করে রাস্তা থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। একইসঙ্গে বাঁ-গালে হাত বোলাচ্ছে। পলানদার ওপরে ওর খুব রাগ হচ্ছিল। বাইরের একটা উটকো ছেলেকে পলানদা এইভাবে টলারেট করছে!

সাইকেল-আরোহী ভদ্রলোক একদৃষ্টে পলানের দিকে চেয়েছিলেন। পলান সে-দৃষ্টির মোকাবিলা করতে পারছিল না। বারবার চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল।

ভদ্রলোক হঠাৎ হাসলেন। তারপর বললেন, 'কী পলান, কেমন আছ? বোম-টোম আর তৈরি করছ না?'

ভদ্রলোকের এই অদ্ভুত প্রশ্নে পলান কিংবা ওর দলের কেউ অবাক হল না। কারণ, ভদ্রলোককে ওরা ভালো করে চেনে। ওঁর নাম কিশোরীমোহন সামন্ত। ওঁর একটিমাত্র ছেলে ছিল—সায়ন। সায়ন তিনবছর আগে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।

সায়ন লেখাপড়া ছেড়ে পলানের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। বাবা-মায়ের শত বারণ শোনেনি। কতই বা বয়েস তখন ওর? চোদ্দো কি পনেরো। পলান তখন ওর হাতে নিয়মিত হাতখরচের পয়সা দিচ্ছে। কখনও-কখনও রেস্তোরাঁ থেকে ফ্রায়েড রাইস আর চাউমিন আনিয়ে খাওয়াচ্ছে। এ ছাড়া হাতে তুলে দিচ্ছে রোমাঞ্চকর অস্ত্রশস্ত্র। নেপালা, ভোজালি, চপার, এমনকী রিভলভার পর্যন্ত।

অস্ত্রগুলো হাতে নিয়ে সায়নের গায়ে কাঁটা দিত। নিজেকে দশফুট লম্বা মনে হত। মনে হত, ওর শরীরে কীভাবে যেন এক মারাত্মক শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। ওর কথায় এখন বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাবে। ওর কথাই এখন শেষ কথা।

তখন সায়ন একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তখন ওর মাথায় শুধু পলানদা, পলানদা আর পলানদা। বাবা-মায়ের যে-কোনও কথাতেই ওর বিরক্ত লাগত। বাড়ির বাইরে-বাইরে ওর দিন কাটত। কখনও-কখনও খেতে আসত, আবার কখনও-কখনও আসত না। তবে রাতে কখনও সায়ন বাইরে থাকত না।

সায়নকে ওর মা অনেক বোঝাতেন। পলানের দলের সঙ্গে আড্ডা না মেরে লেখাপড়ায় মন দিতে বলতেন। কিশোরীও ছেলেকে কিছু কম বোঝাতেন না। কিন্তু সেসব কথা সায়নের কানে ঢুকত না।

এরপর সায়ন বোমা বাঁধার কাজ শুরু করল। পলান ওকে যখন এই দায়িত্ব দিল তখন সায়ন যেন খুশিতে আকাশে পা ফেলে হাঁটছে।

আশাপুরে চাল-ডালের বড়-বড় তিনটে পুরোনো গোডাউন ছিল। গোডাউনগুলো টিনের তৈরি। কালো রং করা। শোনা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সেগুলো নাকি মিলিটারিদের রসদের গোডাউন ছিল। তারপর টানা সত্তর বছর বিনা ব্যবহারে পড়ে থেকে-থেকে ওগুলোর অবস্থা এখন ভূতুড়ে বাড়ির চেয়েও ভয়ংকর। সেই গোডাউনগুলোর একটার ভেতরে চলে পলানের 'বোমার কারখানা'।

সায়ন খুব তাড়াতাড়ি সব শিখে নিচ্ছিল। পলানের দেওয়া 'রোমাঞ্চকর' শিক্ষা ও মন-প্রাণ দিয়ে একেবারে শুষে নিচ্ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই ও জেনে গেল, হাতবোমার আর-এক নাম 'পেটো'। ওগুলো তৈরি করতে দুটো কেমিক্যাল লাগে : পটাশিয়াম ক্লোরেট আর আর্সেনিক সালফাইড—যাদের সংক্ষেপে বলা হয় পটাশ আর মোমছাল। এ ছাড়া পটাশিয়াম ক্লোরেটের কোড-নেম 'সাদা' আর আর্সেনিক সালফাইডের কোড-নেম 'লাল'।

বোমা তৈরি করতে গেলে এই দুটো কেমিক্যালের সঙ্গে লাগে স্টোনচিপস, পেরেক, লোহার বাবরি, কাগজ আর পাটের দড়ি। কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে খুব সাবধানে বোমা বাঁধতে হয়। তা ছাড়া বোমা বাঁধতে গেলে চাই ধৈর্য আর হানড্রেড পারসেন্ট মনোযোগ।

বোমা বাঁধার সময় সায়ন এই নিয়ম মেনে চলত। পলান প্রায়ই ওর কাজের প্রশংসা করত। বলত, সায়নের বাঁধা বোমা কোনওদিনও 'মিসফায়ার' হয়নি। এসব কথায় সায়নের বুক চওড়া হয়ে যেত।

কিন্তু একদিন...।

একদিন সায়নের ধৈর্য আর মনোযোগের অঙ্কে ভুল হয়ে গেল।

যখন ও একটা বোমা বাঁধছিল তখন বোমাটা ওর মুখের সামনে ফেটে গেল।

এক ঝলক সাদা আলো সায়নকে পলকের জন্য অন্ধ করে দেয়। একইসঙ্গে গোডাউনের জং ধরা টিনের দেওয়ালের খানিকটা অংশ উড়ে গিয়েছিল।

'জানো তো, পলান, পেটো তৈরি করতে গেলে পটাশ আর মোমছাল লাগে। সাদা আর লাল। এ দুটো ভালো করে মেশালে কমলা রঙের দেখায়। তারপর ওই পাউডারের মধ্যে খুচরো নাট-বোলটু, কাচের টুকরো, স্টোনচিপস, পেরেক, লোহার বাবরি দিতে হয়। ওগুলো সপ্লিনটার। বোমা ফাটলে ওগুলো ছিটকে গিয়ে পাবলিকের গায়ে-মুখে-মাথায় লাগবে...' কিশোরীমোহন উত্তেজিতভাবে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন। চোখ বড়-বড় করে পলান, কাটা নগেন, নোনতা, সোমেন, তাতান ওদের দিকে পালা করে তাকাচ্ছিলেন। হাতের আঙুল ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে অদৃশ্য একটা বোমা বাঁধার ভঙ্গি করছিলেন। আর ঠোঁট চওড়া করে নিঃশব্দে হাসছিলেন।

'দ্যাখো তো, পলান, বাঁধাটা ঠিক হচ্ছে কি না—' মাথা ঝাঁকিয়ে পলানের এক্সপার্ট ওপিনিয়ান চাইলেন কিশোরীমোহন। তারপর : 'সায়নটা একেবারে অপদার্থ! ঠিকমতো বোমা বাঁধতে পারে না। দ-ড়া-ম! ব্যস, মরেই গেল। ছেলেটা আমার মরেই গেল...।'

হঠাৎই হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন কিশোরী। রোগা-রোগা দু-হাতে নিজের বুক চাপড়াতে লাগলেন।

একজন দুজন করে লোক জমতে শুরু করল। ময়লা শার্ট-প্যান্ট পরা কান্নাকাটি করা লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সামনের ব্যস্ত রাস্তায় এদিক-ওদিক ছুটে চলেছে গাড়ি, সাইকেল, সাইকেল-রিকশা, মিনি ট্রাক, মোটরভ্যান। শুকনো রাস্তায় ধুলো উড়ছে। এতক্ষণ বেশ রোদ ছিল, কিন্তু এখন সূর্য মেঘে ঢাকা পড়েছে। মেঘের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বৃষ্টির দিকে এগোলেও এগোতে পারে।

পলান আর দেরি করেনি। বেঞ্চি ছেড়ে উঠে এসেছে কিশোরীমোহনের কাছে। লোকটা দিনদাহারে এরকম ক্যাচাল করলে তো মুশকিল! সায়নের কেসটা আরও বড় সাইজে বিলা হয়ে যাবে!

পকেট থেকে পাঁচশো টাকা বের করল পলান। টাকাটা কিশোরীর হাতে দিয়ে পিঠে হাত রাখল। দরদ মাখা গলায় বলল, 'কিশোরীদা, এবার বাড়ি যান। ভালো করে খাওয়াদাওয়া করুন। আস্তে-আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগবান সব ঠিক করে দেবেন...।'

কিশোরীমোহনের উত্তেজনা পাগলামো একটু শান্ত হল। কিন্তু তিনি তখনও মরা ছেলের জন্য ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। পলান যখন বলল, 'ভগবান সব ঠিক করে দেবেন...' তখন কিশোরী মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে...সব ঠিক হয়ে যাবে...।'

কিশোরী চোখের জল মুছলেন। পলানের দিকে বড়-বড় সরল চোখে তাকিয়ে বললেন, 'পলান, সায়ন ভালো আছে তো?'

পলান কিশোরীর পিঠে আলতো দুটো চাপড় মেরে বলল, 'হ্যাঁ, কিশোরীদা, ভালো আছে। খুব ভালো আছে।'

'আর সায়নের মা?'

'সায়নের মা ভালো আছে। সায়নের কাছেই আছে।'

সায়ন মারা যাওয়ার চারদিন পর শোক-তাপে উদভ্রান্ত সায়নের মা গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে নিজেকে দাহ করেছিলেন।

তার পরই কিশোরীমোহন পাগল হয়ে যান। পলানের সঙ্গে দেখা হলেই সবসময় বোমা বাঁধার কথা বলেন।

পলান কিশোরীকে শান্ত করে পিঠ-ফিট চাপড়ে সাইকেলে করে রওনা করিয়ে দিল। ভাঙাচোরা মানুষটা ভাঙাচোরা সাইকেল চালিয়ে পলানদের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে চলে যেতে লাগল।

কিশোরীমোহনকে দেখলেই পলানের মধ্যে কেমন একটা পাপবোধ জেগে ওঠে। যেন ও চুরিচামারি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে।

সায়ন ছেলেটা খুব ভালো ছিল। চোখ দুটো কিশোরীদার মতোই বড়-বড়। আর সেই চোখের মধ্যে ছিল কিশোর বয়েসের প্রাণবন্ত উজ্জ্বলতা। ছেলেটা কথা বলত ধীরে-ধীরে, নীচু গলায়। সবসময় নতুন কিছু একটা করতে চাইত—নতুন-নতুন এক্সপেরিমেন্ট। কে জানে 'বল' বাঁধার সময় নতুন ধরনের কোনও এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়েছিল কি না। তারপরই 'দ-ড়া-ম'!

পলান সায়নকে খুব ভালোবাসত। ছেলেটা তাতানের সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত। গত বছরে স্বাধীনতা দিবসের ফ্ল্যাগ তোলার ফাংশানে সায়ন এসেছিল। বিবেকানন্দ মূর্তির মোড় থেকে বাঁ-দিকে শ'খানেক মিটার গেলেই চিলড্রেন্স পার্ক। সেখানে সকাল-বিকেল বাচ্চারা খেলে। পার্কের এক কোণে সিমেন্টের সিঁড়িভাঙা বেদিতে একটা জি-আই পাইপ পারমানেন্টলি গাঁথা আছে। তার মাথায় লোহার আংটা ঝালাই করা। আংটার ভেতর দিয়ে তার গলিয়ে পাইপের গোড়ায় পেঁচিয়ে রাখা আছে। সারা বছর নানান কারণে এখানে নানান ফ্ল্যাগ তোলা হয়। কখনও ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, কখনও ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানের ফ্ল্যাগ, আবার ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপের সময় আর্জেন্টিনা কিংবা ব্রাজিলের পতাকা। তবে যখন যে-পতাকাই তোলা হোক না কেন সেই পতাকা-উদ্যোগের পিছনে থাকে পলান আর তার চ্যালারা। পতাকা যেদিন তোলা হয় সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও করে পলানরা।

তো স্বাধীনতা দিবসের পতাকা তোলার অনুষ্ঠানে সায়ন এসেছিল। রাতে খাওয়াদাওয়ার আসরে তাতান ওকে নেমন্তন্ন করেছিল। সেই রাতেই সায়নের সঙ্গে পলানের প্রথম আলাপ। পলানের ছেলেটাকে ভালো লেগেছিল। কিন্তু তখন ও সায়নকে দলে টানার কথা ভাবেনি।

পলান জানে, একটা দল চালাতে গেলে দু-একটা করে লোকাল ছেলেকে নিয়মিতভাবে দলে টানা দরকার। এই ছেলেগুলোই দলের ভিতটাকে ধরে রাখে। কিন্তু সায়নকে সেরকম মেটিরিয়াল বলে পলানের মনে হয়নি। তবে সায়নের খুব কৌতূহল ছিল। তাতানকে আর পলানকে নানান প্রশ্ন করত। পলানের ফাইফরমাশ খাটার জন্য সবসময় এক পা বাড়িয়েই থাকত ছেলেটা।

পলান তখন খুব সিগারেট খেত। ওর সিগারেটের প্যাকেট কিনে আনার জন্য সায়ন হয়ে উঠল এক নম্বর লোক।

একদিন পলান মুচকি হেসে ওকে জিগ্যেস করেছিল, 'কী রে, সায়ন—সিগারেট টানতে ইচ্ছে করে?'

সায়ন এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়েছিল : 'না—।'

'কেন? ইচ্ছে করে না কেন?'

'আমার বাপি সিগারেট খায়। খুব কাশে। মাঝে-মাঝে রক্ত পড়ে মুখ দিয়ে। মা বাপিকে সিগারেট খেতে মানা করে...।'

পলান মুচকি হাসিটাকে মুখ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। ওর কপালে ভাঁজ পড়েছিল। কিশোরীদার কি তা হলে টিবি হয়েছে? সেইজন্যই কি ওঁর চেহারাটা অমন রোগা?

পলান পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে লাইটার দিয়ে ধরাল। পরপর দুটো টান মেরে খুকখুক করে কাশল। কাশিটাকে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ও খেয়াল করেছে। পলান মনে-মনে ভাবল, 'না, না—এটা নরমাল কাশি। এর সঙ্গে মুখ দিয়ে ব্লিডিং হওয়ার কোনও রিলেশান নেই।'

তারপর ধোঁয়া ছাড়ল। এপাশ-ওপাশ হাত নেড়ে ধোঁয়া তাড়াল। সায়নের বড়-বড় উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'তোর তা হলে কী ইচ্ছে করে?'

সায়ন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর পলানের কোমরে উঁচু হয়ে থাকা একটা জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওটা—ওটা খুব টাচ করতে ইচ্ছে করে। একবার...একবার টাচ করতে দেবে, পলানদা?

জিনসের প্যান্টের ওপরে একটা লাল রঙের রাউন্ড নেক টি-শার্ট পরেছিল পলান। টি-শার্টের নীচে কোমরে গোঁজা ছিল একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন মডেল সিক্স নাইন ফোর সিক্স ডাবল অ্যাকশন রিভলভার। ক্যালিবার নাইন এম-এম, বারো রাউন্ড গুলি ছোড়া যায়। ওজন সাড়ে সাতশো গ্রাম মতন। আমেরিকান জিনিস। এসব বিদেশি মাল পলান অনেক কষ্ট করে, অনেক খরচ করে জোগাড় করে। এই অস্ত্রটা ওকে আশাপুরের শাসন কায়েম রাখতে সাহায্য করে। এই আমেরিকান জিনিসটাকে সবাই ভয় পায়। আর এই ভয়টাকে পলান সবসময় জিইয়ে রাখে।

এই ছোট ছেলেটা সেই ভয়ংকর অস্ত্রটাকে টাচ করতে চায়!

পলান টি-শার্ট তুলে কোমর থেকে মেশিনটা বের করে নিল। আঙুলের চাপে ম্যাগাজিন ক্যাচ খুলে গুলি ভরতি ম্যাগাজিনটা বের করে মেশিনটা বাড়িয়ে দিল সায়নের দিকে।

'নে, হাতে নে—ভালো করে টাচ করে দেখ...।'

সায়ন কাঁপা দু-হাত বাড়িয়ে রিভলভারটা নিল। অস্ত্রের হাতলটা মুঠো করে ধরতেই ওর গায়ে কাঁটা দিল। শিরায়-শিরায় বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। ওর বিশ্বাসই হচ্ছিল না ওর হাতের মুঠোয় একটা গোটা আসল রিভলভার।

পলান চোখ নাচিয়ে বলল, 'একেবারে সাচ্চা আমেরিকান আইটেম। অনেক নোট খসিয়ে কিনতে হয়েছে। বুলেটও একসঙ্গে অনেকগুলো কিনে নিয়েছি—পরে পাওয়া যাবে না বলে...।'

সায়ন অস্ত্রটা হাতে নাচিয়ে ওটার ওজন আঁচ করার চেষ্টা করছিল। ওর কিশোর মুঠোয় অস্ত্রটা বেশ ভারীই লাগছিল। তাও তো পলানদা ম্যাগাজিনটা খুলে নিয়েছে!

পলানের হাতে ধরা ম্যাগাজিনটার দিকে আকাঙ্ক্ষার চোখে তাকাল সায়ন। ওটা রিভলভারে বাঁটের ভেতরে ঢুকিয়ে তালু দিয়ে ঠুকে সেট করে নিলে কেমন হয়? তারপর পলানদার পারমিশান নিয়ে একবার—মাত্র একটিবার—ফায়ার করবে ও। আচ্ছা, ঠিক আছে, ও না হয় আকাশের দিকেই ফায়ার করবে।

ব্যাপারটা ভাবতেই সায়ন শরীরে রোমাঞ্চ টের পেল। রিভলভারটার ট্রিগারে বারকয়েক আঙুলের চাপ দিল ও।

পলান সায়নের অবস্থাটা লক্ষ করেছিল। বোধহয় বুঝতেও পারল খানিকটা। তাই হেসে জিগ্যেস করল, 'কীরে, ফায়ার করতে ইচ্ছে করছে তো?'

'হ্যাঁ, পলানদা...।' কেমন একটা ঘোর লাগা গলায় বলল চোদ্দো-পনেরোর কিশোর।

'কোনও চিন্তা করিস না। সময় হোক, সব শিখিয়ে দেব।'

সায়ন তৃষ্ণার্ত চোখে পলানদার দিকে তাকিয়েছিল। মনে-মনে ভাবছিল, কবে? কবে? কবে?

কিশোর ছেলেগুলোকে ওর কাছাকাছি নিয়ে এসে এভাবেই 'ক্ষমতা' হাতের মুঠোয় তুলে দেওয়ার লোভ দেখায় পলান।

ও সায়নের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। চপার, নেপালা, ভোজালি এবং রিভলভার—তবে লোডেড নয়। সায়ন অস্ত্রগুলো হাতে নিয়ে শুধু স্পর্শের রোমাঞ্চটুকু অনুভব করেছিল—কাউকে ও কখনও আঘাত করেনি। একইসঙ্গে ও বোমা তৈরির প্রথম পাঠ নেওয়া শুরু করেছিল এবং 'ট্রেনিং পিরিয়ড' দ্রুত শেষ করে সরাসরি বোমা তৈরির কাজে নেমে পড়েছিল। বোমা শুধু ও তৈরিই করত—কাউকে লক্ষ্য করে ও কখনও বোমা ছোড়েনি।

সায়নের এই ব্যাপারটা কিশোরীমোহনকে দু-একদিনের জন্য হলেও মিথ্যে সান্ত্বনা জুগিয়েছিল। ওঁর ছেলে কখনও কাউকে আঘাত করেনি। একফোঁটাও রক্ত ঝরায়নি কারও। শুধুমাত্র বোমা তৈরির অপরাধের দাগ লেগেছিল ছেলেটার গায়ে। কিশোরী আর ওঁর স্ত্রী সায়নকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্ট সব ওলট-পালট করে দিল।

পলানের দলের সবাই সায়নের ব্যাপারটা জানে। তাই ওরা কিশোরীমোহনকে দেখলেই কম-বেশি অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। ওদের মধ্যে তাতান কষ্ট পায় সবচেয়ে বেশি। কারণ, সায়ন ওর খুব ভালো বন্ধু ছিল।

মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য আবার উঁকি মেরেছে। একটা মোলায়েম মিঠে রঙের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। সেই রোদের একফালি এখন কিশোরীমোহনের মুখে।

কিশোরীর জন্য পলানের একটু-একটু খারাপ লাগছিল। মানুষটার সঙ্গে যখনই দেখা হয় তখনই পলানের এই খারাপ লাগাটা শুরু হয়। সায়নের মুখটা স্পষ্ট মনে পড়ে যায়। মনে হয়, পলান যেন ছেলেটাকে জিগ্যেস করছে, 'কীরে, তোর কী ইচ্ছে করে?'

আর শুনতে পায়, সায়ন যেন বড়-বড় উজ্জ্বল চোখ মেলে ওপার থেকে বলছে, 'বাঁচতে ইচ্ছে করে, পলানদা—আমার খুব বাঁচতে ইচ্ছে করে...।'

খারাপ লাগাটা কাটাতে পলান পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল। সেটায় লম্বা টান দিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা সোমেন আর নোনতার দিকে এগিয়ে দিল : 'নে, তোরা কে খাবি খা—।'

পলান সিগারেটে টান দিল আবার। হঠাৎই ওর কাশির দমক এল। মাথা ঝুঁকিয়ে কয়েকবার কাশল। ওয়াক তুলে থুতু ফেলল রাস্তায়। তারপর কী ভেবে থুতুর দলাটার দিকে তাকাল। মাথা এপাশ-ওপাশ করে খুব খুঁটিয়ে দলাটাকে দেখতে লাগল। কোমর থেকে শরীরটা ভাঁজ করে মাথা নামিয়ে চোখের নজর জোরালো করতে চাইল।

তাতান জিগ্যেস করল, 'অমন করে কী দেখছ, পলানদা?'

পলান থুতুর দলাটার দিকে চোখ রেখেই মাথা নাড়ল, বলল, 'না, কিছু না।'

পলান আবার সিগারেট টানতে লাগল। চোখ মেলে দিল সামনের ব্যস্ত রাস্তা ছাড়িয়ে দু-চারটে বাড়ির ফাঁক দিয়ে অনেক দূরের গাছপালা আর আকাশের দিকে।

মনে-মনে ভাবল, সিগারেট খাওয়াটা ছাড়তে হবে।

ববিনকে নিয়ে হেঁটে বারো নম্বর বস্তির দিকে ফিরছিল রোশন। নোনতার টুঁটি টিপে ধরতে ওর ভালো লাগেনি, ওকে থাপ্পড় মারতেও ভালো লাগেনি—বিশেষ করে ববিনের সামনে। কিন্তু প্রতিঘাতের এই ভাষা

ছাড়া অন্য কোনও ভাষা কি নোনতা বুঝত? হয়তো বুঝত না, কিন্তু তা সত্ত্বেও রোশনের খারাপ লাগছিল।

ববিন হঠাৎ বলল, 'কাকু, খুব জলতেষ্টা পেয়েছে—'

রোশন একটা টিউবওয়েলের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল। না, নেই।

মিউনিসিপ্যালিটির একটা কল দেখতে পেল ববিন। একজন লোক বালতি আর মগ নিয়ে স্নান করছে সেখানে। ওলটানো 'জ্র' অক্ষরের মতো বাঁকানো একটা লোহার পাইপ। সেই পাইপের মুখ দিয়ে জল পড়ছে বালতিতে। জলের প্রেশার কমে যাবে বলে পাইপটাকে আরও উঁচু না করে বালতি বসানোর জায়গাটাকে এক ফুট ডিপ একটা চৌকো গর্ত মতন করা হয়েছে।

ববিন রোশনের দিকে মুখ তুলে বলল, 'কাকু, ওই যে কল—কল থেকে জল খাব—।'

রোশন বকুনি দিল ওকে : 'না, ওই কলের জল খেতে হবে না!'

'কেন? কেন খাব না?'

ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রোশন বলল, 'চল, তোকে একটা কোল্ড ড্রিংক কিনে দিচ্ছি। তুই হাফ খাবি, আমি হাফ খাব।' একটা পান-সিগারেটের দোকানের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

দোকানের একপাশে ফ্রিজ। তার ভেতরে সুন্দর করে সাজানো কোল্ড ড্রিংকের বোতল।

আঃ, দেখলেই তেষ্টা বেড়ে যায়! অন্তত ববিনের তাই হল। সেইজন্যই ও একটু আগের প্রশ্নটা ভুলে গেল।

মিউনিসিপ্যালিটির কলের জল কেন খাওয়া যাবে না সেটা বুঝিয়ে বললেও ববিনের মতো বাচ্চা ছেলে বুঝবে না। ওই জলের পাইপের নানান জায়গায় লিক আর ছোট-ছোট ফাটল রয়েছে। যখন পাম্প চালিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি প্রথমবারের জন্য জল সাপ্লাই করেছিল, তখন কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সেই পাইপে দেখা দিয়েছে অনেক লিক আর ফাটল। পাইপগুলো পাম্প হাউস থেকে বেরিয়ে মাটির তলা দিয়ে নানান দিকে গেছে। তার মধ্যে বেশ কিছু পাইপ গেছে কাঁচা ড্রেনের মধ্যে দিয়ে। তাই এখন যেই জল পাম্প করা বন্ধ হয় তখন বিভিন্ন নালার নোংরা জল হরেক ফুটো আর ফাটল দিয়ে ঢুকে যায় ফাঁকা পাইপের ভেতরে। পরে আবার যখন পাম্প চালু করা হয় তখন সেইসব নোংরা জল ভালো জলের সঙ্গে মিশে যায়। তাই আশাপুরের সবাই মিউনিসিপ্যালিটির কলে স্নান করে, কাপড় কাচে, বড়জোর হাত-টাত ধোয়—কিন্তু সেই জল খায় না, কিংবা রান্নার কাজে ব্যবহার করে না।

এখানকার লোকজনের মুখে রোশন শুনেছে, বহুবছর ধরেই নাকি কথা চলছে, খারাপ সব পাইপ পাল্টানো হবে। টাকা স্যাংশান হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে সেসব কাজ আর হয়নি।

পান-সিগারেটের দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রোশন আর ববিন। দোকানে পান-সিগারেট, কোল্ড ড্রিংক ছাড়াও বিস্কুট আর লজেন্সের কৌটো সাজানো রয়েছে।

দোকানে আর কোনও খদ্দের-টদ্দের ছিল না। রোশন একটা কোল্ড ড্রিংকের বোতল চাইল। এই দোকানটায় রোশন আগেও এসেছে—তাই দোকানদার মুখ-চেনা।

লোকটির মাথায় কদমছাঁট চুল। মাথার পিছনে টিকি। মোটা গোঁফ। ফরসা নাদুসনুদুস শরীর। একটা লুঙ্গি পরে বাবু হয়ে বসে আছে। গায়ে লাল রঙের একটা গামছা জড়ানো।

দোকানদার রোশনের দিকে তাকিয়ে একচিলতে হাসল। তারপর একটা ঠান্ডা বোতলের ছিপি খুলে তাতে একটা স্ট্র ফেলে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। রোশন একটু হেসে বোতলটা নিয়ে ববিনের হাতে দিল।

'আমি পুরোটা খেয়ে নেব? তুমি যে বললে হাফ খাবে—।' ববিন বোতলের গায়ে হাত বুলিয়ে ঠান্ডা ভাবটা অনুভব করছিল।

'তুই আগে হাফ তো খা। পারলে পুরোটা খেয়ে নে...।'

ববিন তাড়াতাড়ি স্ট্র-তে টান দেওয়া শুরু করল।

'এই খোকার বাবা না মা মারা গেছে?' দোকানদার ববিনের অশৌচের পোশাকের দিকে দেখিয়ে জিগ্যেস করল।

'বাবা—ওর বাবা, গনিরাম। গোডাউন ফাইটের সময় হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে...।'

'হাঁ—অ্যায়সা হি সুনেছিলাম যে বারা নম্বর বস্তির কে একজন মারা গেছে।'

'হ্যাঁ। শুক্রবার শ্রাদ্ধ। এই তো, আমরা পলানদার কাছে গিয়েছিলাম। গনিরামের শ্রাদ্ধের জন্যে পলানদা ডোনেশন দিয়েছে...।'

দোকানদার অবাক চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'পোলান পয়সা দিয়েছে! আমার তো তাজ্জব লাগছে। পোলান তো সহজে কাউকে টাকা-পয়সা দেয় না। উপরসে সুনেছিলাম কে কুছু দিন আগে ''আশাপুর লজ''-এর সামনে আপনাকে...।'

রোশন দোকানদার লোকটিকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমাকে ওর দলের গুন্ডাগুলো রাস্তার ওপর ধরে পিটিয়েছিল...।'

রোশন গড়গড় করে সবিস্তারে বলে গেল ওর মার খাওয়ার কাহিনি। সেইসঙ্গে মার খাওয়ার কারণটাও বলল। বলল, 'বিশ্বরূপ জোয়ারদার সপ্তাহে-সপ্তাহে পলানকে টাকা দেন। প্রোটেকশন মানি—যার ডাকনাম হল ''তোলা''।'

'আমিও তো টাকা দিই—' দোকানদার বলল।

ছোট দোকান বলে এই দোকানদার লোকটি সপ্তাহে একশো টাকা করে দেয়।

ববিন স্ট্র-তে ঠোঁট চেপে টান দিচ্ছিল আর রোশনদের কথা চোখ বড়-বড় করে শুনছিল।

বোতলটার দিকে তাকিয়ে রোশন দেখল, বোতলে কোল্ড ড্রিংক আর খুব বেশি পড়ে নেই। ও ববিনের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে সেটুকু শেষ করল। ওর খিদে পাচ্ছিল। তখনই ওর হঠাৎ খেয়াল হল, ববিনটাও অনেকক্ষণ কিছু খায়নি। ও দোকানদারের কাছে চারটে বিস্কুট চাইল। দুটো নিজে নিল, দুটো ববিনকে দিল। বলল, 'এ দুটো এখন খেয়ে নে। পরে ঘরে গিয়ে চানাচুর-মুড়ি খাবি—।'

ববিন কোনও কথা না বলে বিস্কুট দুটো খেতে শুরু করল।

কোল্ড ড্রিংক আর বিস্কুটের দাম মিটিয়ে রোশন ববিনকে নিয়ে হাঁটা দিল আবার।

এই রাস্তাটা সরু। লোকজনের চলাচল কম। বাঁ-দিকটায় গাছপালা আর আগাছার জঙ্গল। দূরে-দূরে ছাড়া-ছাড়া কয়েকটা ঘর-বাড়ি। তার মধ্যে দুটো দোতলা পাকা বাড়ি, আর বাকিগুলো একতলা—টিন অথবা টালির চালে ছাওয়া।

আকাশের দিকে তাকাল রোশন। মেঘটা আগের চেয়ে আরও গাঢ় হয়েছে। বৃষ্টি হলে পরই মুশকিল। ববিনটা ভিজে যাবে। তখন ওর ঠান্ডা না লেগে যায়!

রোশন তাড়াতাড়ি পা চালাল। ববিনের হাত ধরে টান দিল : 'একটু তাড়াতাড়ি পা চালা। বৃষ্টি আসতে পারে—।'

সাইকেল রিকশা নিয়ে ফেরা যেত, কিন্তু বারবার রিকশা ভাড়ার ব্যাপারটা বড় গায়ে লাগে। আচ্ছা, কিছুদিনের জন্য একটা সাইকেল ভাড়া করে নিলে কেমন হয়? রোশন ভালোই সাইকেল চালায়। আর আশাপুরে বেশ কয়েকটা সাইকেল সারানোর দোকান আছে—সেগুলো আবার সাইকেলও ভাড়া দেয়। নাঃ, কাল থেকেই রোশন একটা সাইকেল ভাড়া নিয়ে নেবে। তা হলে ওর এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

ওরা একটা বড় বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বাগানটা পুরোনো, তার পাঁচিল এখানে আছে তো ওখানে নেই। বাগানের ভেতরে এলোমেলো গাছগাছালি। চারপাশটা মোটামুটি চুপচাপ। শুধু কয়েকটা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে।

তারই মধ্যে একটা অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে এল। আওয়াজটা রোশনের চেনা লাগল। আর সেই আওয়াজটা ভেসে আসছিল বাগানের ভেতর থেকেই।

রোশন থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে ববিনও। আওয়াজটা কীসের খতিয়ে দেখা দরকার।

রোশন আড়চোখে আকাশের দিকে তাকাল। নাঃ, বৃষ্টি আসে তো আসুক। বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার চেয়ে আওয়াজটা খতিয়ে দেখা অনেক বেশি জরুরি।

রোশনের অন্তত তাই মনে হল।

ববিনকে সঙ্গে নিয়ে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে বাগানটার ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। কান পেতে আঁচ করতে চাইল, আওয়াজটা ঠিক কোন দিক থেকে আসছে।

ভেতরে ঢুকতেই ছোট্ট একটু ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ল রোশনের। মাটিতে এখানে-ওখানে ঘাস গজিয়ে রয়েছে। তার ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে গাছের শুকনো পাতা। জায়গাটাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকটা বড়-বড় গাছ। সেই গাছগুলোর গণ্ডি পেরিয়ে বেশ খানিকটা বড় জায়গা। জায়গাটা মাঠের মতো দেখতে হলেও তার মাঝখানটা নীচু—অনেকটা বাটির মতো। হয়তো এককালে ডোবা ছিল, পরে সেটা শুকিয়ে এরকম হয়ে গেছে।

সেই শুকনো ডোবার মধ্যিখানে সাত-আটটা ছেলে জড়ো হয়েছে। তাদের বয়েস বারো থেকে বড়জোর পনেরো-ষোলোর মধ্যে। পোশাক আধময়লা শার্ট বা টি-শার্ট, আর বারমুডা কিংবা ফুলপ্যান্ট। তবে দুজন ছেলের গায়ে লাল রঙের ময়লা হাতকাটা গেঞ্জি। চোখের ওপরে ছেঁড়া গামছার টুকরো দিয়ে পটি বাঁধা। ওরা 'বাটি'-র ঠিক মাঝখানটায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়ছে। একজন মুখে 'হুঃ!', 'হুঃ!' শব্দ করছে—কারণ, তার এখন মার খাওয়ার পালা। আর অন্যজন তখন মাটিতে পড়ে যাওয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে।

বাগানের বাইরে থেকে 'হুঃ!', 'হুঃ!', আওয়াজটাই শুনতে পেয়েছিল রোশন।

লম্বা মতন একটা ছেলে ফাইটারদের কাছে দাঁড়িয়ে রেফারির কাজ করছে। বাকি চার-পাঁচজন ছেলে একটু দূরে বসে ব্লাইন্ড ফাইট দেখছে আর নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, হাসাহাসি করছে।

রোশন একটা বড় গাছের আড়াল থেকে বালক অথবা কিশোরদের ব্লাইন্ড ফাইট দেখছিল। ওর শরীরের ভেতরে কতকগুলো ঠান্ডা স্রোত হিলহিলে সাপের মতো নানান দিকে বয়ে যাচ্ছিল। একবার ও ভাবল, পাশে দাঁড়ানো ববিনের চোখে হাত চাপা দেবে—কিন্তু তারপরই ওর মনে হল, ও কতক্ষণ হাত চাপা দেবে? ক'দিন হাত চাপা দেবে?

ব্লাইন্ড ফাইটের অসুখ মহামারীর মতো আশাপুরকে দখল করে নিয়েছে। এলাকার কিশোর ছেলেরা ধীরে-ধীরে শক্তির এই জুয়াখেলার নেশার ফাঁদে জড়িয়ে যাবে। তারপর দেখতে-দেখতে ক্ষয়ে যাবে।

এই এলাকাটা যত ক্ষয়ে যায় পলানের ততই লাভ। ওর দল ক্রমশ মাপে বড় হবে। তা ছাড়া, এই যে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে আয়োজন করে ব্লাইন্ড ফাইট প্র্যাকটিস করছে, হয়তো এদের মধ্যে থেকেই উঠে আসবে আগামীদিনের ফাইটাররা। তারা পলানের গোডাউন ফাইটে নাম লেখাবে। তাদের লড়াকু চেহারা আর লড়াইয়ের কলাকৌশল দেখে দর্শকরা তারিফ করবে এবং তাদের পয়সা উশুল হবে।

পলানের ওপরে রোশনের খুব রাগ হল। একইসঙ্গে ওর মনে হল, আশাপুর প্রকৃতির তৈরি করা একটা কোমল শরীর। সেই শরীরের ধমনী, শিরা-উপশিরায় নিয়মিত বিষদাঁতের কামড় বসাচ্ছে পলান। ওর বিষে কোমল শরীরটা ক্রমশ নীল থেকে আরও নীল হয়ে যাচ্ছে।

রোশন স্তম্ভিত হয়ে দেখছিল। ওর ভাবনা গড়াতে-গড়াতে খারাপ দিকে চলে যাচ্ছিল। ও যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিল, কলাবতী নদীর তীরে ওই হতচ্ছাড়া গোডাউনের ভিতরে টগবগে তরুণ ববিন ব্লাইন্ড ফাইট লড়ছে।

ও ববিনের হাত ধরে টান মারল, বলল, 'চল, বাড়ি চল—দেরি হয়ে যাচ্ছে...। এরপর পিসি খুব বকাবকি করবে।'

রোশন যখন ববিনকে নিয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে এল তখন ওর মনে হল, ছোটদের এই ব্লাইন্ড ফাইট দেখে ওর বোধহয় জ্বর এসেছে।

ও আনমনাভাবে পথ হাঁটতে লাগল।

ওর মনের পরদায় এলোমেলো সিনেমা চলছিল। কখনও সেখানে কুশানকে দেখতে পাচ্ছিল, কখনও মা-কে কিংবা বাবাকে। কখনও দেখতে পাচ্ছিল জেলে ওর সঙ্গী কয়েদিদের—তার মধ্যে কিছু বন্ধু, কিছু শত্রু। আবার কখনও দেখতে পাচ্ছিল ওর আশাপুরের জীবন, দেখতে পাচ্ছিল আচমকা বম্ব ব্লাস্টে সায়নের শরীরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে যাচ্ছে চারিদিকে।

হঠাৎই শিসের শব্দে ঘোর কাটল রোশনের। সামনেই একটা ডুমুর গাছ। সেটার একটা সরু ডালে বসে রয়েছে দুটো সিপাহি বুলবুল। হালকা-পলকা শরীর, দু-গালে লাল রং, মাথায় ছুঁচলো ঝুঁটি। ওরা পালা করে শিস দিচ্ছে। ছটফট করছে। ওদের ভারে ডুমুরের চিকণ ডালটা মৃদুমন্দ দুলছে।

ও ববিনকে দৃশ্যটা দেখাল : 'দেখ, দেখ—কী সুন্দর!'

কাকুর কথায় ববিন তাকাল পাখিদুটোর দিকে। মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল।

প্রকৃতির এইসব সুন্দর 'ছবি'-ই রোশন দেখতে চায়। সবাইকে দেখাতে চায়।

ওরা গাছটার খুব কাছাকাছি এসে পড়তেই পাখিদুটো চট করে উড়ে কোথায় যেন চলে গেল।

ববিনকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ামাত্রই রোশনের ওপর দিয়ে ছোটখাটো একটা ঝড় বয়ে গেল। ঝড়ের নাম 'সাবিত্রী'।



'এইটুকু একটা বাচ্চা সেই সকাল থেকে না খেয়ে না দেয়ে তোমার সঙ্গে টো-টো করে ঘুরছে! তোমার একটা আক্কেল নেই। বললাম, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, তো সে-কথা কে আর কানে তোলে! গনিটাও এইরকম ছিল। এই দিদিটা কিছু বললে সে-কথা ওর এক কান দিয়ে ঢুকত, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যেত। পলানের ওই গোডাউনে গিয়ে মারপিট করতে ওকে কম বারণ করেছি! শেষ পর্যন্ত ওই গোডাউনই ওকে খেল। গোঁয়ার শয়তানটা আমাকে আর ববিনকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। একবারও কি ভাবল আমাদের কথা!' একটানা কথা বলতে-বলতে সাবিত্রী কেঁদে ফেলল। কান্না চাপতে শাড়ির আঁচল গুঁজে দিল মুখে। ফোঁপাতে লাগল।

রোশন ছোট্ট ধমক দিল, 'দিদি কী হচ্ছে! ববিনের সামনে এমনি কোরো না। দাও, ওকে তাড়াতাড়ি খেতে দাও—।'

সাবিত্রী নিজেকে সামলে নিল। চোখ-টোখ মুছে ওদের ঘরের ভেতরে আসতে বলল। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে ববিনের জলখাবারের আয়োজন করতে লাগল।

রোশন একটা টুলে বসল। পলানের দেওয়া টাকাটা সাবিত্রীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'দিদি, এটা রাখো। সাতহাজার টাকা আছে—পলানদা দিয়েছে...।'

সাবিত্রী কী একটা কাজের মাঝে থমকে গেল। চট করে ঘুরে তাকাল রোশনের দিকে : 'পলান সাতহাজার টাকা দিয়েছে!'

সাবিত্রী ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। ও অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল। তারপর গনিরামের ফটোর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'আমার...আমার ভাইটার শেষ কাজ এবার ভালো করে করা যাবে...।'

তখন বিকেল। সাইকেল চালাচ্ছিল রোশন। গায়ে টি-শার্ট আর ব্লু জিনস। খুব ধীরে-ধীরে ও প্যাডেল করছিল। কারণ, চলার পথে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আশাপুরের দৃশ্যগুলোকে ও শুষে নিচ্ছিল। ছোট-ছোট দোকানপাট, একটুকরো খেলার মাঠ, দুটো পুকুর, রাস্তার পাশে ফল কিংবা সবজির দোকান, টাইম-কলে জল নেওয়ার ভিড়, স্কুল ছুটি হওয়া ছেলেমেয়ের ঝাঁক হেঁটে বাড়ি ফিরছে—গায়ে সাদা-নীল পোশাক।

বিকেলের এই দৃশ্যগুলো রোশনকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। কারণ, দৃশ্যগুলো শান্ত, স্বাভাবিক—তাই সুন্দর। সবাই চায় তাদের জীবনধারা প্রশান্তরেখায় বয়ে চলুক। সেটাই তাদের কাছে সুন্দর। বিক্ষুব্ধ প্রবাহকে সবাই এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু বিক্ষুব্ধ প্রবাহের যদি মোকাবিলা না করা যায় তা হলে প্রশান্তরেখায় বয়ে চলা জীবন পালটে যাবে অশান্তরেখায়। কিশোরীমোহন সামন্তের কথা মনে পড়ল রোশনের, মনে পড়ল সায়নের কথা।

একটু পরেই চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেল। একটা চায়ের দোকানের পাশ ঘেঁষে সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করাল। সামনেই বিবেকানন্দের মূর্তি। প্রায় আট-ন' ফুট লম্বা। এককালে হয়তো সাদা ধবধবে ছিল—এখন ধুলো ধোঁয়ায় অফহোয়াইট হয়ে গেছে।

মূর্তিটাকে ঘিরে লোহার খাটো রেলিং। তার গায়ে লেপটে বসে আছে বুড়িমাসি—পাশে রঙিন কাপড়ের তালিমারা পুঁটলি।

চায়ের দোকান থেকে চা-বিস্কুট কিনল রোশন। তারপর রাস্তা পার হয়ে পৌঁছে গেল বুড়িমাসির কাছে। সামনে একটা ময়লা কাঁথা পেতে ছোটখাটো বুড়িমাসি বসে আছে। কাঁথার ওপরে আট-দশটা কয়েন পড়ে আছে : একটাকা, দু-টাকা, পাঁচটাকা। মাসি সবসময় একটা কথাই বলে, 'দুটো টাকা দাও না, বাবা—চা খাব।' আর মাঝে-মাঝে গানের মতো কী একটা গায়। এখন মাসি মিহি গলায় গানের মতো সেই কিছু একটা গাইছে :

*'আমার জীবন গেল, জনম গেল*
*শান্তি পাইলাম না।*
*শান্তির তরে ভ্রান্তি নিয়ে হলেম খ্যাপা—*
*তবু মন শান্তি পাইল না।'*

মাসির গলায় সুর-টুর কিছু নেই, তবু ইনিয়েবিনিয়ে গেয়ে চলেছে।

রোশন ডাকল, 'মাসি! ও বুড়িমাসি!'

বুড়িমাসি গান থামিয়ে চোখ তুলে তাকাল। চোখ সরু করে নজর তীক্ষ্ন করতে চাইল। রোশনকে চিনে নিল গলার স্বরে। স্নেহমাখানো নরম গলায় বলল, 'কে? ভালো খোকা?'

'মাসি, তোমার জন্যে চা-বিস্কুট এনেছি...।' কথা বলতে-বলতে বুড়িমাসির দিকে চা-বিস্কুট বাড়িয়ে দিল রোশন।

বুড়ি কাঁপা হাতে সেটা নিল। বিড়বিড় করে বলল, 'তোর ভালো হোক, ভালো খোকা। তোর ভালো হোক...।'

বিস্কুটে কামড় দিয়ে চায়ে চুমুক দিল মাসি। তেরছা আলো লোহার রেলিং-এর পিছন থেকে বুড়ির মাথায়, গালে এসে পড়েছে। পাকা চুলগুলো সোনালি রঙের দেখাচ্ছে। আর রেলিং-এর ছায়া এমনভাবে মাসির গায়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন জেলের গরাদের আড়ালে বন্দি।

রোশন পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে বুড়িমাসির কাঁথার ওপরে ঝুঁকে পড়ল। নোটটা সেখানে রাখতে-রাখতে বলল, 'মাসি, আজ আমি আসি—।'

রোশন আবার সাইকেলের কাছে ফিরে এল। সাইকেলে উঠে দু-চাকার গাড়িটা চালিয়ে দিল জগন্ময়ী কালীমন্দিরের দিকে।

সাইকেলটা রোশন ভাড়া নিয়েছে 'মোহন সুইটস'-এর পাশের একটা দোকান থেকে। দোকানটার নাম 'বাবুন সাইকেল মার্ট'। সাইকেল সারানোর দোকান—তার সঙ্গে সাইকেলের পার্টসও বিক্রি করে।

দোকানের মালিকের নাম বাবুন। মোটা মতন মাঝবয়েসি লোক। 'মোহন সুইটস'-এ রোশন যে প্রায়ই সকালে লুচি-তরকারি খেতে আসে সেটা বাবুন লক্ষ করেছিল। তারপর সে রোশনের মার খাওয়ার ঘটনাটার কথা শুনেছে। এও শুনেছে যে, ছেলেটা কোন এক অচেনা-অজানা জায়গা থেকে 'উড়ে এসে জুড়ে বসেছে' এই আশাপুরে—আস্তানা গেড়েছে বিশ্বরূপ জোয়ারদারের 'আশাপুর লজ'-এ। আর ক'দিনের মধ্যেই ছেলেটা পলানদের সঙ্গে ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। এসব নিয়ে 'মোহন সুইটস'-এর মালিকের সঙ্গে বাবুনের কয়েকবার কথাও হয়েছে।

তো সেই বিতর্কিত ছেলেটা তিনদিন আগে দুপুরবেলা বাবুনের সাইকেল মার্টে এল। বলল, একটা সাইকেল ভাড়া নিতে চায়—একমাসের জন্য।

বাবুনের দোকান টিন দিয়ে ঘেরা। মাথার ওপরে টালির ছাউনি। দোকানের একদিক ঘেঁষে সার দিয়ে বেশ কয়েকটা সাইকেল দাঁড় করানো। আর অন্য দিকটায় মেঝেতে বল বেয়ারিং, রিম, প্যাডেল এরকম নানান পার্টস ছড়ানো। তারই মাঝে একটা রোগামতন ছেলে হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে উবু হয়ে বসে কাজ করছে। দোকানের ভেতরে কোথাও একটা রেডিয়ো বাজছে। রেডিয়ো জকির নিপুণ একঘেয়ে বকবকানি শোনা যাচ্ছে।

'একমাসের জন্যে!' রোশনের কথায় অবাক হয়ে গিয়েছিল বাবুন।

'হ্যাঁ—' হেসে বলেছিল রোশন, 'আশাপুরের এরিয়াটা অনেকটা বড়। পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখাটা প্র্যাকটিক্যালি ইমপসিবল। আর গাড়ি-টারি চড়ে ঘুরে দেখার মতো ভলিয়ুম আমার নেই। তাই সাইকেলে

চড়ে ঘোরাটাই সবচেয়ে ভালো। শুধু চালিয়ে যাও...কোনও তেল-টেল খরচা নেই...।'

'আপনি কি আশাপুরে বেড়াতে এসেছেন?' বাবুন ঠাট্টার গলায় জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ—অনেকটা তাই। জায়গাটা আমার বেশ ভালো লেগে গেছে। গাছপালা, নদী, পুকুর, নানারকম মানুষ। সব মিলিয়ে দারুণ।'

বাবুন ছেলেটাকে দেখছিল। ফরসা, সুঠাম চেহারা। স্পষ্ট চোখ, চোখে স্বপ্ন মাখা। তার ওপরে টানা ভুরু। সামান্য কোঁকড়ানো চুল—ছোট করে ছাঁটা।

ছেলেটা অন্যরকম—ভাবল বাবুন। কিন্তু ওকে সাইকেল ভাড়া দেবে কী করে? যদি সাইকেল নিয়ে ভেগে যায়? মিনিমাম একজন তো গ্যারান্টার চাই!

সে-কথাই বলল বাবুন।

রোশন একপলকের জন্য একটু থমকে গেল। তারপর ওর বিশ্বরূপদার কথা মনে হল। ও বিশ্বরূপদার কথা বাবুনকে বলল, 'আপনি বিশ্বরূপদার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারেন। উনি আমার গ্যারান্টার হবেন—।'

এইভাবে কথাবার্তা পাকা হয়ে সাইকেলটা হাতে পেয়েছে রোশন। ভাড়া একটু কমসম করে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে মাসে আড়াইশো টাকা। সাইকেলটা পুরোনো হলেও সেটা ভালো করে চেক-টেক করে দিয়েছে বাবুন। বেল ছিল না বলে নতুন একটা বেলও লাগিয়ে দিয়েছে।

এখন সাইকেল চালাতে-চালাতে সেই বেলটা বাজাল। সামনে দুজন লোক আর একটা গোরু রাস্তা পার হচ্ছে। সাইকেল-বেলের 'টিং-টিং-টিং' মিষ্টি আওয়াজে রোশন ছোটবেলায় ফিরে গেল। ওর সাইকেল চালানো শেখার দিনগুলো মনে পড়ে গেল। দোকান থেকে সাইকেল ভাড়া নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি একটা ছোট মাঠে সাইকেল শিখত ও। ওর দুজন বন্ধু ছিল ওর ট্রেনার। সেইসব ভাড়ার সাইকেলগুলোর কোনওটার ব্রেক ছিল না, কোনওটার বেল ছিল না। তাই সাইকেল চালানোর সময় সামনে লোকজন পড়ে গেলে ক্রমাগত চেঁচাতে হত 'সরে যান! সরে যান!' বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষ শিক্ষানবিশ রোশনের সাইকেলে যেমন ধাক্কা খেয়েছিল, তেমন রোশনও দেওয়াল, কংক্রিটের পিলার, পুজো-প্যান্ডেলের খুঁটিতে অগুনতি ধাক্কা মেরেছিল। কিন্তু তারপর...এই দুর্ঘটনাবহুল ট্রেনিং পিরিয়ডের পর রোশন মোটামুটি উঁচুদরের সাইক্লিস্ট বনে গিয়েছিল।

এখন কাঁচা রাস্তা ধরে সাইকেল চালাতে-চালাতে পুরোনো অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

একটু পরেই জগন্ময়ী কালীমন্দিরের রাস্তায় এসে পড়ল রোশন। রাস্তা না বলে সেটাকে পথ বললেই বেশি মানায়। মেঠো পথের দুপাশে ছোট-বড় গাছপালা।

হঠাৎই একজায়গায় চোখে পড়ল একটা বাঁশের খুঁটিতে লাগানো একটা ছোট সাইনবোর্ড। তাতে হলদে রঙের ওপরে লাল হরফে লেখা : 'শ্রীশ্রী জগন্ময়ী কালীমন্দির'। লেখাটার নীচে একটা তিরচিহ্ন আঁকা রয়েছে।

সাইকেলের চাকা আর কয়েক পাক গড়াতেই মন্দিরটা রোশনের চোখে পড়ল।

লালরঙের ছোট মন্দির। তার কোথাও-কোথাও হলদে রঙের ছোঁয়া। মন্দিরের পিছনে দুটো বড়-বড় গাছ। মন্দিরের চূড়া ছাড়িয়ে অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। গাছের পাতায়-পাতায় সূর্যের পড়ন্ত আলো।

মন্দিরের কাছাকাছি গিয়ে সাইকেল থামাল রোশন। দুটো বড় ঝোপের গা ঘেঁষে সাইকেলটা একপাশে দাঁড় করাল। ওটা লক করে সামনে পা বাড়াল।

মন্দিরের সামনেটায় খানিকটা ফাঁকা জায়গা—অনেকটা উঠোনের মতন। উঠোনের মধ্যিখানে দুটো বড় মাপের বেলগাছ। সেই গাছদুটোর গুঁড়িতে তিন-চার ফুট করে লাল সালু জড়ানো। সেই সালুর গায়ে সিঁদুরের দাগ। তার ওপরে অসংখ্য লাল আর হলদে সুতো জড়ানো রয়েছে। তারই মাঝে-মাঝে রয়েছে ছোট-ছোট সাদা কড়ি। গাছদুটোর ডাল থেকেও সুতো বাঁধা অনেক কড়ি ঝুলছে।

বেলগাছের নীচ দিয়ে পা ফেলে মন্দিরের কাছে এগিয়ে গেল রোশন। মন্দিরের দরজার মাথায় একটা ঘণ্টা ঝুলছে। কিন্তু কোনও লোকজন চোখে পড়ল না। নিশ্চয়ই সন্ধেবেলা আরতির সময় ভক্তদের ভিড়-টির হয়।

মন্দিরটা দেখে রোশনের মনে হল, এটার পিছনে খরচ আর যত্নের বেশ খামতি রয়েছে। মন্দিরের দেওয়াল জায়গায়-জায়গায় ভাঙা আর ফাটল ধরা হলেও রঙের আস্তরটা বেশ নতুন এবং ঝকঝকে।

মন্দিরের দরজার ঠিক ওপরে দেওয়ালে লাল অক্ষরে লেখা 'শ্রীশ্রী মাতা জগন্ময়ী'। দরজার সামনে কিছুটা জায়গা জুড়ে সিমেন্ট বাঁধানো চাতাল। চাতালের ওপরে গাড়িবারান্দার মতো ঢালাই ছাদ—ছ'টা পিলারের ওপরে দাঁড় করানো। চাতালে বসানো দুটো প্রণামীর বাক্স—একটা ছোট, আর একটা মাপে বেশ বড়। দুটো বাক্সই কাঠের তৈরি। দুটোতে তালা ঝুলছে। ছোট বাক্সটার গায়ে সাদা রং দিয়ে লেখা : 'প্রণামী', আর অন্যটার গায়ে বড়-বড় লাল হরফে লেখা : 'মহাপ্রণামী'। সাদা লেখার রং জায়গায়-জায়গায় উঠে গিয়ে খানিকটা আবছা হয়ে গেলেও লাল লেখার হরফগুলো দিব্যি জ্বলজ্বল করছে।

দুটো প্রণামীর বাক্স দেখে রোশন একটু অবাক হল। ও মনে-মনে 'প্রণামী' ও 'মহাপ্রণামী'-র তফাতটা আঁচ করার চেষ্টা করল।

ও জুতো খুলে চাতালে উঠল। আলতো পা ফেলে ধীরে-ধীরে মন্দিরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সামনেই কালো রঙের দেবীমূর্তি—তাঁর চোখ আর জিভ লাল। দেবীর পায়ের কাছে একটা প্রদীপ জ্বলছে। রোশন চোখ বুজে জোড়হাত করে প্রণাম জানাল। তারপর দরজার ঠিক ওপরে ঝোলানো ঘণ্টাটা হাত উঁচিয়ে একবার বাজাল।

মন্দিরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। এখনও কোনও আলো জ্বালানো হয়নি। তাই ভেতর থেকে একজন মানুষ যখন হঠাৎ করে বেরিয়ে এল তখন রোশন একটু চমকে গেল। ভদ্রলোক হয়তো ঘণ্টার শব্দ শুনে বেরিয়ে এসেছেন।

ভদ্রলোকের পোশাক দেখে বোঝা যায় তিনি এই মন্দিরের পুরুতমশাই। পরনে হাঁটু পর্যন্ত সাদা ধুতি, গায়ে গেরুয়া উড়ুনি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে লাল টিপ পইতের ওপরে।

পুরুতমশাইয়ের গায়ের রং কালো, চেহারা অসম্ভব রোগা, মাথাজোড়া টাক। পাঁজরাসর্বস্ব বুকে কয়েক খাবলা কাঁচাপাকা লোম।

ভদ্রলোকের বাঁ-হাতে একটা ছোট পিতলের সরা—তাতে তেল-সিঁদুর মাখা। তিনি রোশনের কাছে এসে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ওর কপালে সিঁদুরের টিকা লাগিয়ে দিলেন। তারপর সরু চোখে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমাকে তো, বাবা, এ-মন্দিরে আগে দেখিনি...।'

'না, দেখেননি। জগন্ময়ী কালীমন্দিরে আমি এই প্রথম এলাম।' একটু থেমে রোশন আরও যোগ করল, 'আসলে আশাপুরে আমি নতুন...মাত্র পনেরো-কুড়ি দিন হল এসেছি। এখানে একটু কাজের খোঁজ-টোজ করছি—' শেষ কথাটা রোশন বলল যাতে পুরুতমশাইয়ের মনে কোনওরকম সন্দেহ না তৈরি হয়।

আশাপুরে দু-আড়াই সপ্তাহ থাকার অভিজ্ঞতা থেকে রোশন দেখেছে, আশাপুর জায়গাটা স্রেফ ভালো লেগেছে বলে ও যে এখানে থাকছে এই সরল সত্যিটা কেউ বিনা সন্দেহে মেনে নিতে পারছে না। ভাবছে, রোশন মিথ্যে কথা বলছে। সেইজন্যেই ও ক'দিন ধরে এই কাজ-টাজ খোঁজার ব্যাপারটা লোকজনকে বলছে।

পুরুতমশাই রোশনের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন : 'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক—।'

রোশন ওঁকে প্রণাম করে জিগ্যেস করল, 'ঠাকুরমশাই, মন্দিরে কোনও লোকজন নেই কেন? ভক্তরা এখানে আসা-যাওয়া করে না?'

'আসে—ওই সন্ধেবেলায়—পুজো-টুজো আর আরতির সময়।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই মন্দিরটা একশো উনতিরিশ বছরের পুরোনো—এটাই এর যত মানসম্মান। এ ছাড়া আর আছেটা কী! প্রাইভেট অনুদান-টনুদান থেকে কোনওরকমে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে টিকে আছে। এই তো, একমাস আগে এক

ভক্তের টাকায় একটু রং-টং করানো গেল। রিপেয়ার-টিপেয়ার করানোর জন্যে কতদিন ধরে মন্দির-কমিটিকে বলছি—কিন্তু তাতে কাজ-টাজ আর হচ্ছে কই! তা ছাড়া ডোনেশন-টোনেশনের টাকা-ফাকা সরাসরি হাতে পাওয়া খুব মুশকিল—।'

'কেন? মুশকিল কেন?'

বিরক্তির তেতো হাসি হাসলেন পুরুতমশাই : 'আছে, মুশকিল আছে। তুমি এখানে নতুন এসেছ—একটু পুরোনো-টুরোনো হও, সব জানতে-টানতে পারবে...।'

রোশন মুখে কিছু বলল না, কিন্তু মনে-মনে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল।

পকেট থেকে একটা পঞ্চাশটাকার নোট বের করল। তারপর এগিয়ে গেল প্রণামীর বাক্সের দিকে।

গিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল। কোন বাক্সে দেবে প্রণামী? ছোট বাক্সটায়, না বড় বাক্সে?

পুরুতমশাইয়ের দিকে একবার তাকাল রোশন। তারপর মহাপ্রণামীর বাক্সে টাকাটা ফেলতে গেল।

'ওটায় ফেলো না, বাবা!' পুরুতমশাই যেন আর্ত আবেদন জানালেন।

রোশন চমকে ফিরে তাকাল পুরুতমশাইয়ের দিকে। চোখে প্রশ্ন।

'ছোট বাক্সটায় প্রণামী দিলে সেটা মন্দিরের কাজে লাগবে...।'

'আর বড় বাক্সটায় দিলে?'

'সেটা আমাদের মায়ের সেবায় লাগবে না।'

'কার সেবায় লাগবে তা হলে?'

পুরুতমশাই কিছু বলে ওঠার আগেই মোটরবাইকের শব্দ শোনা গেল।

পুরুতমশাই চাপা গলায় বললেন, 'এসে গেছে—!'

রোশন পঞ্চাশটাকার নোটটা হাতে নিয়ে জলছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই একটা মোটরবাইক গরগর করতে করতে মন্দিরের উঠোনে ঢুকে পড়ল। ওটার পিছনে তাড়া করে এল মেঠো পথের ধুলো।

বাইকটা বেলগাছের নীচ দিয়ে এসে একবারে গাড়িবারান্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

লাল আর কালো রঙের মোটরবাইক। বাইকের গায়ে যেরকম ধুলো আর কাদা লেগে আছে তাতে বোঝা যায় গাড়িটা নিয়মিত ঝাড়পোঁছ হয় না। ওটার যত্ন নেওয়ার কেউ নেই।

মোটরবাইক থেকে যে-দুটো ছেলে নেমে দাঁড়াল ওদের অবস্থাও ওদের বাহনের মতন। জামাকাপড় ময়লা। মলিন চেহারা। চুল উসকোখুসকো। দেখে মনে হয়, 'ঝাড়পোঁছ'-এর ব্যাপারটা বহুদিন ধরে পেন্ডিং হয়ে আছে।

ছেলে দুটোকে দেখেই রোশনের টিভিতে কার্টুন নেটওয়ার্কে দেখা 'মোটু-পাতলু'-র কথা মনে পড়ল।

বাইক যে-চালাচ্ছিল সে যথেষ্ট মোটা, মাথায় টাক, চোখে চওড়া কালো ফ্রেমের চশমা। বয়েস পঁয়ত্রিরিশ কি চল্লিশও হতে পারে। ফলে ওকে 'ছেলে' না বলে 'লোক' বললেই ব্যাপারটা মানানসই হয়।

লোকটার গায়ে সবুজ রঙের একটা রাউন্ড নেক ময়লা টি-শার্ট। টি-শার্টটা এত টাইট যে, তার ভেতরে লোকটার বডি ফুলে-ফুলে রয়েছে। এবং ভুঁড়িটা বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। হঠাৎ করেই ছোটবেলায় ভূগোল বইয়ে পড়া পামীরের মালভূমির কথা রোশনের মনে পড়ল।

লোকটার পায়ে হদ্দ ময়লা একটা জিনসের প্যান্ট—তার আবার নানান জায়গা ছেঁড়া। প্যান্টের শেষে একজোড়া ময়লা স্পোর্টস শু।

লোকটার গায়ের রং কালো। তার ওপরে কোথাও-কোথাও গাঢ় কালচে ছোপ। গলায় একজোড়া চেন—একটা সোনার, একটা রুপোর। বাঁ-হাতে একটা স্টিলের বালা, ডানহাতের কবজিতে বাঁধা বিপত্তারিণীর পুজো দেওয়া লাল সুতো।

মোটার পিছনে যে-শাগরেদটি বাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ওকে দেখে প্যাঁকাটিও লজ্জায় মুখ লুকোবে। ছোটবেলা জ্যামিতি বইয়ে পড়া সরলরেখার কথা মনে পড়ল রোশনের। এবং ছেলেটির মাথা ওর শরীরে তুলনায় এতই বড় যে, রোশনের আলুর দমের কথাও মনে পড়ল।

প্যাঁকাটির বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ কি বড়জোর আটাশ হতে পারে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চুলের একপাশটা লালচে রং করা। গায়ে হালকা নীল আর হলদে চেক কাটা একটা ঢোলা হাফশার্ট। সেটা প্যান্টের মধ্যে গুঁজে পরেছে। প্যান্টটা কালো রঙের, সরু। পায়ে সস্তার চপ্পল। তবে ময়লা জামা-প্যান্টের সঙ্গে চপ্পলজোড়া দিব্যি মানিয়ে গেছে।

প্যাঁকাটির মুখটা বড়, ছড়ানো। চোখদুটো ড্যাবাড্যাবা, দাঁতগুলো চওড়া, হলদেটে।

মোটু বাইকটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর 'ঠাকুরমোসাই! ঠাকুরমোসাই!' বলে ডাকতে-ডাকতে মন্দিরের চাতালে উঠে পড়েছিল। পা থেকে জুতো না খুলেই।

পাতলু মোটুর পিছন-পিছন আসছিল। ও কখন যেন পকেট থেকে একটা রিংসমেত চাবি বের করে নিয়েছে। সেটা আঙুলে ঘোরাচ্ছে।

মোটুর জুতো পায়ে চাতালে উঠে পড়াটা পুরুতমশাইয়ের ভালো লাগেনি। কিন্তু কী আর করা! ওরা ওইরকম।

পুরুতমশাই মন্দিরের দরজার পাশ ঘেঁষে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মোটু আর পাতলুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দু-সপ্তাহ পরপর ওরা দুজন বাইক নিয়ে আসে। 'মহাপ্রণামী'-র বাক্সটা খুলে টাকাপয়সা সব নিয়ে যায়। তবে বাক্সটা একেবারে খালি না করে একটা দু-টাকার কয়েন বাক্সে রেখে যায়।

মোটুর 'ঠাকুরমোসাই' ডাক শুনে পুরুতমশাই দরজার পাশ ছেড়ে সামনের চাতালে কয়েক পা এগিয়ে এলেন। মোটু-পাতলুর দিকে ওঁর নজর থাকলেও রোশনের দিকে একপলক দেখে নিলেন।

পাতলু জুতো পায়ে চাতালে উঠল। পুরুতমশাইয়ের দিকে হাসিমুখে তাকাল। জিগ্যেস করল, 'কী ঠাকুরমোসাই, সব খবর-সমাচার ঠিকঠাক আছে তো?'

পুরুতমশাই প্রায় ষাট ডিগ্রি ঘাড় হেলিয়ে বোঝালেন, সব ঠিকঠাক আছে। একটু হাসার চেষ্টাও করলেন। রোবটের হাসি। পানের ছোপধরা দাঁত দেখা গেল।

রোশন সবকিছু খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল। স্লো মোশনে গড়িয়ে চলা একটা সিনেমা দেখছিল যেন।

বিকেল ক্রমে হেলে পড়েছিল সন্ধের দিকে। বেলগাছ থেকে কাকের কোলাহল শোনা যাচ্ছিল। সন্ধের মুখে ঘরে ফিরে পাখিদের রোজকার সাংসারিক কথাবার্তা আর ঝগড়াঝাঁটি।

মোটু এবার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। পাতলুকে লক্ষ করে বলল, 'লে-লে, জলদি মাল খালাস কর...।'

পাতলু গুনগুন করে হিন্দিগানের একটা সস্তা সুর ভাঁজছিল। 'মহাপ্রণামী'-র বাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে ও পকেট থেকে লাল রঙের একটা মোটা পলিথিনের প্যাকেট বের করে ফেলেছে। তারপর চাবি ঘুরিয়ে খুলে ফেলল বাক্সের তালা। বাক্সের ভারী ঢাকনাটা তুলে হেলিয়ে দিল পিছনদিকে।

মোটু এবার রোশনকে লক্ষ করে হাত নেড়ে বলল, 'আবে, তোর নোটটা ধরে পাঁচুর মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বাসকে ফ্যাল!'



রোশন পঞ্চাশটাকার নোটটা হাতে নিয়ে ফ্রিজশটের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেদুটোর এই লেভেলের হরকত ওর একেবারেই পছন্দ হচ্ছিল না। মোটু আর পাতলুকে রোশন আগে না দেখলেও আন্দাজ করতে পারল ওরা নিশ্চয়ই পলানের ছেলে। কারণ, আশাপুরে পলানের একচেটিয়া রাজত্বে কেউ এখনও কামড় বসাতে পারেনি। এ-কথাটা ও প্রথম জানতে পারে বিশ্বরূপ জোয়ারদারের কাছে। তারপর 'মোহন সুইটস'-এর কাউন্টারে দাঁড়িয়ে সকাল কি সন্ধেবেলা জলখাবার খাওয়ার সময় লোকজনের নানান টুকরো কথা ওর কানে এসেছে—তার মধ্যে পলান যে আশাপুরে রাজ করে সে-খবরও ছিল।

মোটু আর পাতলুর দিকে তাকিয়ে রোশনের গা ঘিনঘিন করে উঠল। পলান এত নোংরা! ওর চ্যালারা জুতো পরেই মন্দিরের চাতালে উঠে পড়ছে! মন্দিরের প্রণামীর নাম করে ওরা পাবলিকের কাছ থেকে তোলা আদায় করছে! তারপর হয়তো এই টাকা দিয়েই দলবল নিয়ে রাতবিরেতে মওজ-মস্তি করবে।

রোশনের খুব রাগ হল। ও মনে-মনে ওর শরীরের মাসলগুলোর সঙ্গে কথা বলল। ওরা জানাল যে, কিছুদিন আগে পাবলিক প্লেসে ওরা যে দিনদাহারে মার খেয়েছিল তার জন্য সেরকম কোনও ব্যথা ওদের গায়ে আর নেই। ওরা নতুনভাবে মার খাওয়ার অথবা দেওয়ার জন্য তৈরি।

ঠিক এরকম একটা সময়ে পাতলু গুনগুন গান থামিয়ে রোশনকে লক্ষ করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'কী বে ক্যালানে কাত্তিক! সুবুদা কী বলল শুনতে পাসনি? নোটটা বাসকে ডাল—জলদি!'

রোশন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে পাতলুর দিকে তাকাল। মা কালীর এই অসম্মান ও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সহ্য করবে!

ঠিক তখনই পাতলু ওর সামনে এসে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'এ কানে কালা ন্যাকাচৈতন! নোটটা ছাড়...!'

কথাগুলো বলার সঙ্গে-সঙ্গে পাতলু পঞ্চাশটাকার নোটটা রোশনের হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে নিয়েছে এবং 'মহাপ্রণামী'-র বাক্সে টাকাটা ফেলে দিয়েছে।

রোশনের ডানহাত বিদ্যুৎগতিতে বাতাস কাটাল। পলকে পৌঁছে গেল প্যাঁকাটির মাথার কাছে। ওর চুলের মুঠি খামচে ধরে এমন ঝাঁকুনি দিতে লাগল যে, ওর হাত-পা-শরীর ন্যাকড়ার পুতুলের মতো ল্যাক-প্যাক করতে লাগল। ওর হাত থেকে লাল পলিথিনের প্যাকেটটা খসে পড়ল।

রোশন যে আচমকা এমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে সেটা পাতলু বা সুবু কেউই আঁচ করতে পারেনি। ওরা দুজনেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। পাতলু মোটেই কথা বলার মতো অবস্থায় ছিল না, আর সুবু কথা বলার মতো অবস্থায় থাকলেও কথা বলতে পারছিল না। শুধু হাঁ করে ওর শাগরেদের হেনস্থা দেখছিল।

প্রায় পাঁচ-ছ'সেকেন্ড পর রোশন ঝাঁকুনি থামাল, কিন্তু ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ছাড়ল না।

রোশন ঠান্ডা গলায় বলল, 'পঞ্চাশটাকার নোটটা তুলে আমার হাতে দে—এক্ষুনি। নইলে তোর প্যাংলা বডি চার ভাঁজ করে একেবারে ইস্তিরি করে ছেড়ে দেব। তোল নোটটা!'

প্যাঁকাটির মাথা ঝিমঝিম করছিল। ও সাপোর্টের আশায় ওর 'সুবুদা'-র দিকে তাকাল। একইসঙ্গে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'অ্যাই শুয়োর, চুল ছাড় বলছি! নইলে চব্বিশঘণ্টার মধ্যে তোর লাশ নামিয়ে দেব! ছাড়!'

উত্তরে রোশন অল্প হাসল। প্যাঁকাটির চুলের মুঠি ধরে আবার একদফা রামঝাঁকুনি দিল। রোগা ছেলেটার ড্যাবা-ড্যাবা চোখ আরও বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। ওর মুখ দিয়ে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরোতে লাগল।

রোশন এবার জোরালো গলায় বলল, 'পঞ্চাশটাকার নোট। এক্ষুনি!'

সুবু এতক্ষণে নিজের চরিত্র আর কর্তব্য বোধহয় খুঁজে পেয়েছিল। ও ওর মোটা শরীর নিয়ে ছুটে এল রোশনের দিকে।

রোশনের কাছে এসে মোটু ডানহাতটা শূন্যে তুলেছিল রোশনকে মারবে বলে। কিন্তু রোশন সে সুযোগ দিল না। শরীরটাকে ডানদিকে সামান্য হেলিয়ে বাঁ-হাত দিয়ে ও সুবুকে আক্রমণ করল। বাঁ-হাতটাকে শক্তভাবে মুঠো করে বুড়ো আঙুলটাকে ছুরির ছোট ফলার মতো সামনে বাড়িয়ে ধরল। তারপর ব্ল্যাক মাম্বা সাপের ক্ষিপ্রতায় ছোবল মারল সুবুর গলায়।

সুবুর মুখ থেকে 'উঁক' করে একটা শব্দ বেরোল। কিন্তু ওর মোটা শরীরের ভরবেগ যথেষ্ট থাকায় ওর শরীরটা পলকের জন্য থমকে গিয়ে সামনের দিকেই মুখ থুবড়ে পড়ল। চশমা ছিটকে গেল চোখ থেকে। ও চাতালে পড়ে গলায় হাত চেপে ছটফট করতে লাগল।

পাতলুর চুলের মুঠি তখনও রোশনের হাতে বন্দি ছিল। সুবুর হাল দেখে পাতলু কঁকিয়ে উঠল।

রোশন ওর মাথাটাকে এবার হালকা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'পঞ্চাশ টাকা! জলদি!'

এরপর আর দেরি করার কোনও মানে হয় না। প্যাঁকাটি ঝুঁকে পড়ল 'মহাপ্রণামী'-র বাক্সের ওপরে। রোশনের পঞ্চাশটাকার নোটটা তুলে নিয়ে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

রোশন পাতলুর চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে নোটটা ছিনিয়ে নিল। তারপর দু-পা ফেলে পৌঁছে গেল 'প্রণামী' লেখা বাক্সটার কাছে। বাক্সের ডালার লম্বাটে গর্ত দিয়ে টাকাটা ফেলে দিল বাক্সের ভেতরে।

পুরুতমশাই মন্দিরের দরজার গায়ে প্রায় লেপটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। একইসঙ্গে মানুষটা যেন বিব্রত হয়ে রয়েছে। যেন রোশনের সঙ্গে গুন্ডাদুটোর হাতাহাতি মারপিট দেখে সে পাপের বোঝা যথেষ্ট বাড়িয়ে ফেলেছে।

পুরুতমশাইয়ের হাত-পা অল্প-অল্প কাঁপছিল। রোশনকে 'মহাপ্রণামী' লেখা বাক্সে পঞ্চাশটাকার নোটটা ফেলতে তিনিই বারণ করেছেন। বলেছেন, ছোট বাক্সটায় প্রণামী দিলে সেটা মন্দিরের কাজে লাগবে।

যদি এসব কথা গুন্ডাগুলো জানতে পারে?

এর আগেও তিনি এই দুরকম প্রণামীর বাক্সের 'মহিমা'-র কথা মন্দিরে পুজো দিতে আসা কয়েকজনকে বলেছেন, কিন্তু তারা কথাগুলো শুনে চুপচাপ হজম করে নিয়েছে। 'প্রতিবাদ' শব্দটার 'প'-ও তাদের অন্তর থেকে বেরোয়নি। কিন্তু এই ছেলেটা? এই নাম-না-জানা ছেলেটা? এই ছেলেটা অন্যরকম। ওর মধ্যে ভক্তিও আছে, শক্তিও আছে।

পুরুতমশাই জগন্ময়ী মায়ের মূর্তির দিকে তাকালেন। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালেন, আশাপুরে আসা এই নতুন ছেলেটা যেন হেরে না যায়। কিছুতেই যেন না হেরে যায়।

আকাশের দিকে তাকালেন পুরুতমশাই। সন্ধ্যাদেবী মাটিতে পা রাখলেন বলে। আর পাঁচ-দশমিনিটের মধ্যেই ভক্তরা একে-একে ভিড় করবে মন্দিরে। কিন্তু তার আগেই যদি গুন্ডাদুটো ছেলেটার ওপরে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে! প্রথম রাউন্ডে রোশন জিতে গেছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডে? রোশনের কাছে কোনও হাতিয়ার নেই, কিন্তু গুন্ডাদুটোর কাছে তো ছুরি-চাকু অথবা অন্য কোনওরকম অস্ত্রশস্ত্র থাকতেও পারে!

পুরুতমশাই এক ধর্মসংকটে পড়লেন যেন।

একদিকে পলানের ভয়। মনে-মনে ওঁর যা-ই থাক বাইরে পলানের বা তার দলবলের বিরোধিতা করা চলবে না। নিজেকে প্রাণে বাঁচতে হবে তো!

আবার অন্যদিকে পুরুতমশাইয়ের বিবেক চাইছে, রোশন এই মোকাবিলার সব রাউন্ডেই জিতে যাক। অহিংসা পরম ধর্ম। কিন্তু হিংসাকে প্রতিরোধ করতে গেলে কখনও-কখনও হিংসার ব্যবহার জরুরি। তা না হলে, মা-দুর্গার হাতে ত্রিশূল কেন? মা-কালীর হাতে কেনই বা খড়্গ?

কয়েকসেকেন্ড ধরে চলল রোগা ভিতু মানুষটার অন্তর্দ্বন্দ্ব। অস্থিরতা। তারপরই কী এক শক্তি যেন খুঁজে পেল সে।

পুরুতমশাই মন্দিরের ভেতরে ঢুকে মন্দিরের, চাতালের, সব আলো জ্বেলে দিলেন। তারপর ঘণ্টার কাছে এসে ঘণ্টাটা হঠাৎ করে পাগলের মতো বাজাতে শুরু করলেন।

চারপাশের গোধূলি-নিস্তব্ধতা চুরমার করে জগন্ময়ী কালীমন্দিরের ঘণ্টা বাজতে লাগল। বাজতেই লাগল।

ঢং ঢং ঢং ঢং!

রোজ সন্ধ্যায় পুজো শুরুর আগে পুরুতমশাই ঘণ্টা বাজান। ওঁর বিশ্বাস, পুজোর সময় মা-কালী জাগ্রত হন। ঘণ্টাধ্বনি তারই ইঙ্গিত। এখন এই রোগা জিরজিরে মানুষটা চাইছিল, ওর ঘণ্টাধ্বনিতে মা জেগে উঠুন। নিয়মিত হয়ে চলা এই অন্যায়ের একটা বিহিত হোক। এই অচেনা-অজানা নতুন ছেলেটা যেন হেরে না যায়।

পুরুতমশাই যেভাবে ঘণ্টা বাজাচ্ছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল, মন্দিরের ঘণ্টা নয়—জেলের পাগলাঘণ্টি বাজছে।

পুরুতমশাই খুব চাইছিলেন, ওঁর এই ঘণ্টার আওয়াজে আশপাশ থেকে ভক্তজন ছুটে আসুক।

সত্যি-সত্যিই লোকজন আসতে শুরু করল। একজন...দুজন... তিনজন। তারা ঘণ্টার শব্দ শুনে ভাবছিল, আজ বোধহয় মন্দিরে মায়ের আরাধনা একটু তাড়াতাড়ি শুরু হবে।

একটু পরেই পুরুতমশাই ঘণ্টা বাজানো থামিয়ে হাঁফাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে সুবু সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চশমা নেই বলে চোখ পিটপিট করে দেখছে। বাঁ-হাতে গলায় হাত বোলাচ্ছে, আর ডানহাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছে পকেটে।

এবং পরের সেকেন্ডেই ওর হাতটা একটা সুইচব্লেড সমেত বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

পকেট-ছুরিটার মেটাল সুইচ টিপল সুবু। স্প্রিং-এর টানে একঝটকায় খুলে গেল ছুরির ফলা। ছ'ইঞ্চি লম্বা, চকচকে, ধারালো।

'অ্যাই শুয়োরের বাচ্চা!' হিংস্র স্বরে গর্জে উঠল সুবু, 'এবার তোকে কোতল করব! আয়...আয় এবার...।'

ছুরির ফলাটা রোশনের দিকে বাড়িয়ে অস্ত্রটা ও নাচাচ্ছিল। পাতলু ততক্ষণে পলিথিনের প্যাকেটটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তাতে 'মহাপ্রণামী' বাক্সের টাকাপয়সা সব ভরতি করে ফেলেছে। বাক্সটার মেঝেতে পড়ে আছে শুধু একটা দু-টাকার কয়েন।

রোশন পাতলুর দিকে আঙুল দেখিয়ে সুবুকে বলল, 'এগুলো মা-কালীর প্রণামীর পয়সা। সেগুলো নিতে তোমাদের লজ্জা করে না?'

সুবু হাসল। সে হাসিতে কোনও শব্দ হল না, তবে দাঁত দেখা গেল। রোশনের দিকে দু-পা এগিয়ে এল ও। 'এক্স' চিহ্নের মতো সাঁইসাঁই করে বাতাসে ছুরি টানল।

'হারামজাদা, আমাদের লজ্জা শেখাতে এসেছে!'

সুবুর এই কথায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পাতলু হেসে উঠল। তারপর জিগ্যেস করল, 'সুবুদা, গামা-লিলুয়া-পরানি, ওদের ডাকব? ফোন লাগাব?'

রোশনের দিকে নজর স্থির রেখে এপাশ-ওপাশ মাথা নড়ল সুবু : 'কোনও দরকার নেই। এ-মালকে আমি একা লিপটে নেব...।'

সুবুর ছুরির দিকে চোখ রেখেও রোশন দেখতে পেল মন্দিরের চাতাল ঘিরে আট-দশজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুরুতমশাইয়ে ঘণ্টা বাজানো শুনে এরাই তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছে মন্দিরে।

তাদের দিকে না তাকিয়ে রোশন সেইসব মানুষজনকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনারা সবাই জেনে রাখুন, মন্দিরের ওই ''প্রণামী'' লেখা বাক্সের...' বাক্সটার দিকে আঙুল দেখাল : '...টাকাপয়সা মন্দিরের কাজে খরচ হয়। কিন্তু তার পাশে রাখা ''মহাপ্রণামী'' লেখা বাক্সের টাকা কিন্তু মন্দিরের কাজে খরচ হয় না। পুরুতমশাই নিজে আমাকে একটু আগে এ-কথা বলেছেন। সেই টাকা-পয়সাগুলো কারা নেয় সেটা আপনারা নিজের চোখে দেখুন...' রোশন সুবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এই যে, এই লোকটার নাম সুবু। আর ওর শাগরেদ—ওই রোগা ছেলেটার নাম...' পাতলুর দিকে আঙুল দোখাল রোশন : '...ওর নাম আমি জানি না। এই দুজন ওই মোটরবাইক চেপে...' আবার আঙুল দেখাল : '...ওই ''মহাপ্রণামী''-র বাক্সের টাকা নিতে এসেছে—।'

জমা হওয়া লোকজনের মধ্যে দুজন মহিলাও ছিলেন। তাদেরই একজন সুবুর দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অ্যাই, তুই শ্যাম মল্লিকের মোটর কারখানায় কাজ করিস না? এসব কী হচ্ছে? জুতো পায়ে চাতালে ওঠা! মন্দিরের মধ্যে মারামারি!'

একজন মোটাসোটা বয়স্ক ভদ্রলোক সুবুকে পলানের দলের ছেলে বলে চিনতে পারলেন। তাই বেশ মোলায়েম গলায় বললেন, 'ভাই, এসব ছোরা-ছুরির কী দরকার! নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করে মিটিয়ে নাও না!'

লোকজন জড়ো হয়ে যাওয়াতে পাতলু একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। রোশনের হাতে হেনস্থা হওয়ার অপমান ভুলে গিয়ে ও সুবুকে লক্ষ করে বলল, 'অ্যাই সুবুদা, চলো ফুটে যাই। পাবলিকের ক্যাওড়া ক্যাচাল হয়ে গেলে পলানদার কাছে আবার ঝাড় খাব।'

সুবু পাতলুর পরামর্শ কানে তুলল না। ছুরিটা সামনে বাগিয়ে ধরে রোশনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রোশন পলকে শরীরটাকে কাস্তের মতো অবতল রেখায় বাঁকিয়ে নিল। ওর কোমরটা পিছিয়ে গেল। আর সুবুর ছুরি

টার্গেট মিস করে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল।

রোশন লক্ষ করল, মন্দিরের চাতালের পাশে জমির ওপরে চার-পাঁচটা পুরোনো ইট পড়ে রয়েছে। তার মধ্যে দু-একটা আবার আধলা ইট। বাঁ-দিকে চারহাত ঝাঁপিয়ে পড়লেই ওগুলোর নাগাল পাওয়া যেতে পারে।

পাবলিকের গুঞ্জন বাড়ছিল। পুরুতমশাই মন্দিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন। মিনমিনে স্বরে বলছিলেন, 'তোমরা থামো—থামো। মায়ের থানে পাপ করতে নেই—।'

রোশন আচমকা ইটগুলোর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—যেভাবে গোলকিপার ঝাঁপিয়ে বল ধরে গোল আটকায়।

বডিটা কুঁকড়ে গুটিয়ে রোল করে পৌঁছে গেল ইটগুলোর পাশে। একটা আধলা ইট আঁকড়ে ধরে যুযুধান ভঙ্গিতে ইটটা উঁচিয়ে দাঁড়াল। এই বুঝি আধলা ইটটা ও ছুড়ে দেবে সুবুর দিকে।

রোশনকে হঠাৎ ওভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে সুবু একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা পলকের জন্য। তারপরই ও সামনে ঝুঁকে ছুরিটা বাড়িয়ে ধরল। এপাশ-ওপাশ চালাল এলোমেলো রেখায়। রোশন চেষ্টা করেও এবার নিজেকে বাঁচাতে পারল না।

ওর টি-শার্ট চিরে গেল। চিরে গেল পেটের চামড়া।

রোশন এক পা পিছিয়ে গেল। দু-চার সেকেন্ডের মধ্যেই টের পেল জ্বালা শুরু হয়েছে। রক্তের ছোপ লাগছে টি-শার্টে।

রোশনের মাথায় ভেতরে আগুন জ্বলে গেল। ও চোখের নিমেষে সুবুর হাঁটু লক্ষ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল চিতাবাঘের মতো। আধলা ইটটা সপাটে বসিয়ে দিল মোটুর বাঁ-পায়ের হাঁটুতে।

নোংরা শব্দ হল একটা। মোটুর মালাইচাকি ফেটে চৌচির হয়ে গেল কি না কে জানে! মোটু গোড়া কাটা কলাগাছের মতো কাত হয়ে খসে পড়ল মন্দিরের চাতালে। তবে ওর স্প্রিং-ছুরিটা ধরা রইল ডানহাতের শক্ত মুঠোয়।

রোশনের টি-শার্টে রক্ত দেখে পুরুতমশাইয়ের মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল। তিনি পাগলের মতো 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করতে লাগলেন আর একইসঙ্গে মন্দিরের ঘণ্টার কাছে গিয়ে আবার পাগলাঘণ্টি বাজানো শুরু করলেন।

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং!

জমায়েত লোকজনের মধ্যে তিনজন মোবাইল ফোন বের করে ক্রমাগত ফটো তুলছিল। আবার কেউ-কেউ চিৎকার করে মারামারি থামানোর জন্য বলছিল।

'সুবুদা' পড়ে যেতেই পাতলু ভয় পেয়ে গেল। কারণ, পলানের চ্যালাদের মধ্যে হাট্টাকাট্টা শক্তিমান বলে সুবুর খ্যাতি আছে। ওর শরীরে যেমন রস আছে, তেমনই কষ আছে।

পাতলু 'সুবুদা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ছুটে এল মোটুর কাছে। কিন্তু ততক্ষণে লড়াইখ্যাপা রোশন ওর হাতের আধলা ইটটা আবার ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে। ও সুবুর গায়ের ওপর হামলে পড়েছে। ওর ছুরি ধরা ডানহাতের মুঠোর ওপরে আধলা ইটটা আছাড় মারছে বারবার। যেন কেউ নোড়া দিয়ে পাথরের শিলের ওপরে কচি আদা থেঁতো করছে।

সুবুর গলা থেকে যন্ত্রণার যে-চিৎকার বেরোচ্ছিল সেটা এতই বিকৃত যে, সেটা কোনও মরণাপন্ন শুয়োরের চিৎকার বলে মনে হচ্ছিল।

রোশন যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। ও প্রবল হাঁফাচ্ছিল আর চাপা গর্জন করে বলছিল, 'মহাপ্রণামী! ইয়ারকি করার আর জায়গা পাওনি! মা-কালীর নাম করে সবাইকে ঠকানো! আশাপুরের মানুষ কি এতই বোকা! মহাপ্রণামীর নাম করে চুরি!'

সুবু বাঁ-হাত দিয়ে রোশনকে গায়ের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না। দুটো লড়াকু শরীর জট পাকানো অবস্থায় এলোমেলোভাবে ছটফট করছিল।

পাতলু ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, ও 'সুবুদা'-র জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, না পালাবে। একইসঙ্গে এটাও ভাবছিল, ও পালিয়ে গেলে 'সুবুদা'-র কী হবে, 'সুবুদা'-র মোটরবাইকটার কী হবে।

এই নতুন ছেলেটার জন্য এতবড় একটা ক্যাচাল বেধে যাবে পাতলু ভাবেনি। এই ক্যাচালের কথা শুনলে পলানদাও হয়তো সুবু আর পাতলুকে একহাত নেবে।

পুরুতমশাইয়ের ঘণ্টার আওয়াজে আরও লোকজন এসে জড়ো হচ্ছিল মন্দিরে। তাদের মধ্যে দু-পাঁচজন ফটো তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেও চার-পাঁচজন লোক ছুটে এল রোশন আর সুবুর কাছে। জোর করে দুটো শরীরকে আলাদা করল।

সুবুর হাত থেকে ছুরি অনেক আগেই খসে পড়েছিল। ওর ডানহাতটা থেঁতলানো, রক্তাক্ত। ওর সবুজ টি-শার্টে রোশনের রক্তের ছোপ।

রোশনের হাত থেকে আধলা ইটটা কেউ একজন কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল।

সুবুকে তিনজন শক্ত করে ধরে রেখেছে। সেই হাতের বাঁধনে সুবু হাঁফাচ্ছে, ফুঁসছে, যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। বাঁ-হাত দিয়ে ডানহাতের কবজিটাকে চেপে ধরেছে।

হাঁফাচ্ছিল রোশনও। বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল। ওর গায়ে রক্ত। পেটের কাছটায় জ্বালা করছে।

জনতার কেউ-কেউ বলছিল পুলিশে খবর দেওয়ার কথা। কেউ-কেউ আবার পলানকে খবর দেওয়ার কথা বলছিল। একজন থানায় ফোন করেও দিয়েছিল।

পাতলু পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে পলানকে ফোন করল।

সুবু রোশনের দিকে আঙুল তুলে শাসাল, 'তোর বড্ড বেশি চর্বি জমে গেছে। পলানদা এসে তোর চর্বি খালাস করবে! কোত্থেকে শুয়োরটা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে আশাপুরে!'

রোশন এখন অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছিল। ও ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমি উড়ে এসে জুড়ে বসিনি—মা-কালী বোধহয় আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছেন—।'

কথাটা বলে মন্দিরের দরজার দিকে ঘুরল রোশন। হাতজোড় করে মা-কালীকে প্রণাম করল।

পুরুতমশাই তখনও মন্দিরের ঘণ্টা বাজাচ্ছিলেন।

রোশন মন্দিরের মূর্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল পায়ে-পায়ে। বাঁ-হাতটা পেটের ওপরে চেপে ধরা। জ্বালা করছে, তবে রক্ত বেশি বেরোচ্ছে না। ওর বেশ খারাপ লাগছিল। সুবুকে আধলা ইটটা দিয়ে ওভাবে না মারলেই ভালো হত। কিন্তু ছুরির ছোবল খেয়ে রোশনের মাথাটা হঠাৎ কেমন গরম হয়ে গিয়েছিল। তাই রাগের মাথায় হিংসা দিয়ে হিংসার মোকাবিলা করে ফেলেছে।

মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছিল রোশনের। ও মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়াল। তাকাল মায়ের মূর্তির দিকে। একহাতে খড়্গ, একহাতে ছিন্নমুণ্ড। চোখ লাল, জিভ লাল। মা-কালীও তো প্রয়োজনে খড়্গ ব্যবহার করেন!

হাতজোড় করে মা-কালীকে আবার প্রণাম করল রোশন। ও টের পাচ্ছিল, জমা হওয়া লোকজনের ভিড় ওর কাছ থেকে খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছে।

'আমি নিজের চোখে দেখেছি, ওই চশমা পরা টাকমাথা লোকটা ওই ছেলেটাকে ছুরি নিয়ে অ্যাটাক করল।'

'ছেলেটাকে এখুনি ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া দরকার। কতটা ডিপ হয়ে কেটেছে কে জানে!'

'অতক্ষণ আগে ফোন করলাম...কই, পুলিশ তো এখনও এল না!'

'আসবে কী করে? আগে পলানদার পারমিশন নিক, আসবে কি না!'

'ওই টাকমাথা লোকটা কি পলানের গ্যাঙে আছে, নাকি....?'

'আছে, আছে! আমি সাইকেল নিয়ে ''জনপ্রিয়''-র পাশ দিয়ে যাতায়াতের সময় লোকটাকে তো প্রায়ই দেখি বেঞ্চে বসে আছে...।'

রোশনের মাথাটা হঠাৎ একটু টলে উঠল। ও চট করে মন্দিরের দরজার ফ্রেম ধরে ফেলল। পুরুতমশাই ঘণ্টা বাজাচ্ছিলেন। কিন্তু তাকিয়ে ছিলেন রোশনের দিকে। ভাবছিলেন, 'একটা অচেনা অজানা ছেলে কোথা থেকে এসে...কী আশ্চর্য!'

রোশনকে হঠাৎ বেসামাল হয়ে যেতে দেখেই তিনি ঘণ্টা বাজানো থামিয়ে ছুটে গেলেন ওর কাছে। ওকে একেবারে জাপটে ধরলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী হল, ভাই, মাথা ঘুরছে?'

'সেরকম ঠিক না। মাথাটা একটু চক্কর কাটল যেন...।'

'তোমাকে এখুনি ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে যেতে হবে। সুধীরডাক্তারের চেম্বারে। ডাক্তার সুধীর পাঠক...ভালো ডাক্তার। মূর্তির মোড় থেকে পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে ওনার চেম্বার...।'

রোশন মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে গেল, কিন্তু পুরুতমশাই শুনলেন না। ভিড়ের মধ্যে চেনা দু-চারজনকে বললেন, রোশনকে সুধীরডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে যেতে।

সঙ্গে-সঙ্গে উৎসাহী লোকজন জুটে গেল। রোশনকে সাবধানে জড়িয়ে ধরে ওরা মন্দিরের চাতাল পেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে হাঁটা দিল।

রোশন একটু-আধটু আপত্তি করতে যাচ্ছিল। বলতে যাচ্ছিল, 'আমার সেরকম কিছু হয়নি—' কিন্তু রোগা-সোগা পুরুতমশাই ওকে একেবারে দাবড়ে দিলেন : 'কোনও আপত্তি-টাপত্তি শুনব না। ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট-ঠিটমেন্ট না করলে পরে ঘা-টা হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া সুধীরডাক্তার খুব ভালো ডাক্তার। পয়সার খাঁই নেই। ভিজিটের টাকা থাকলে-টাকলে দিয়ো, না থাকলে দিয়ো না। ওতে ডাক্তারবাবু কিছু মনে-টনে করেন না। মানুষটা বড় ভালো...।'

লোকজন রোশনকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'তুমি ভাই পেটের ওপরটা শক্ত করে হাত দিয়ে চেপে রাখো। বড় রাস্তার দিকে যেতে-যেতেই আমরা রিকশা পেয়ে যাব—।'

রোশন পেটের কাটা জায়গাটার ওপরে আরও জোরে হাত চেপে ধরল। এখন জায়গাটা একটু বেশি জ্বালা করছে। পুরুতমশাই ঠিকই বলেছেন। কাটা জায়গাটা ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট না করলে ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে।

কাঁচা রাস্তা ধরে একটু এগোতেই রোশন ওর সাইকেলটা দেখতে পেল।

'ওই যে আমার সাইকেল!' মাথা নেড়ে ইশারায় সাইকেলটা দেখাল রোশন। দুটো ঝোপের পাশে দাঁড় করানো। ও সঙ্গী-সাথীদের বলল, 'ওটা যদি "আশাপুর লজ"-এ কেউ পৌঁছে দেয় তা হলে খুব ভালো হয়। আমি বিশ্বরূপদার লজে থাকি...।'

'ও তুমি চিন্তা কোরো না—তোমার সাইকেল বিশুর লজে পৌঁছে যাবে।' একজন বয়স্ক ভদ্রলোক জবাব দিলেন। তাঁর মাথার সব চুল সাদা। চোখে চশমা। সামনের দুটো দাঁত ভাঙা। রোগা চেহারা। গায়ে রঙিন টি-শার্ট আর টেরিকটনের প্যান্ট। চোখের মণিতে টগবগে উৎসাহ ফুটছে। রোশনের বলতে গেলে পাশে-পাশেই তিনি হাঁটছেন।

তিনি লোকজনের জটলার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিয়ে বললেন, 'অ্যাই ডিলন, আমাদের ভাইটির এই সাইকেলটা বিশুর লজে গ্যারেজ করে দিবি। এক্ষুনি অ্যাকশান নে—।'

রোশন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, কিন্তু ডিলন কে সেটা বুঝতে পারল না। ও কোনওরকমে পকেট থেকে সাইকেলের চাবিটা বের করে ভদ্রলোকের হাতে দিল। তারপর সেটা ওঁর হাত থেকে রিলে রেসের মতো এ-হাত সে-হাত হয়ে কোথায় পৌঁছে গেল কে জানে!

ওকে আঁকড়ে ধরে থাকা ভরসার হাতগুলোর উষ্ণতা টের পাচ্ছিল রোশন। এই হাতগুলোর মালিকদের ও চেনে না। অথচ সেই অচেনা মানুষগুলো চেনা উষ্ণতা দিয়ে ওকে ঘিরে ধরেছে।

রোশনের ভেতরে একটা বিচিত্র অনুভূতি তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। ও অচেনা হাতগুলোর কাছে নিজেকে সঁপে দিল।

রোশনকে যেমন কয়েকজন সুধীরডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তেমনই সুবুকে কয়েকজন ঘিরে ধরেছিল ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সুবু কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। ওইরকম আহত অবস্থাতেই ও কোণঠাসা বেড়ালের মতো দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চেঁচাচ্ছিল, 'অ্যাই, সরে যা...সর...সর! ছেড়ে দে আমায়...।'

ওর দাঁতখিঁচুনিতে সাহায্যের হাত যারা বাড়িয়ে দিতে চাইছিল তারা সরে গেল। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ের চোখে সুবুকে দেখতে লাগল।

সুবু তাকিয়ে ছিল পাতলুর দিকে। দেখছিল, ও ফোনে কথা বলছে। নিশ্চয়ই পলানদার সঙ্গে কথা বলছে।

সুবুর ডানহাতটা এমনভাবে জ্বলছিল যেন কাঠের আগুনে ওটাকে ঝলাসানো হচ্ছে। বাঁ-পায়ের হাঁটুটা দপদপ করছিল। ওর বেশ বুঝতে পারছিল, ও ভালোই চোট পেয়েছে। ডাক্তার দেখানো দরকার এক্ষুনি। কিন্তু পলানদা কী ইনস্ট্রাকশন দেয় সেটা না জেনে এইসব ফালতু পাবলিকের কথায় ডাক্তারখানায় যাওয়া যায় না।

পাতলুর ফোন শেষ হতেই ও সুবুর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে ইশারা করল। বলল, 'অ্যাই সুবুদা, বাইক নিয়ে জলদি চলো। পলানদা ঠেক-এ ডাকছে...কুইক!'

সুবু আর দেরি করল না। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটা দিল বাইকের দিকে। পাতলু বাইক চালাতে জানে না—জানলে ও-ই বাইকের সামনে বসত। এখন ও প্যাসেঞ্জার সিটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এমন সময় সুবুর হাত থেকে খসে পড়া সুইচব্লেডটার ওপরে পাতলুর নজর পড়ল। অস্ত্রটা কিছুতেই এখানে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না। ওটা হাতে পেলে থানার সাব-ইনস্পেকটর দাসবাবুর কেসটা হাপিস করতে প্রবলেম হবে।

পাতলু ছুটে চলে গেল ছুরিটার কাছে। ওটা তুলে নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাল। তখনই খেয়াল করল, ছুরিটার ডগায় রক্ত লেগে রয়েছে।



'সুবুদা' ততক্ষণে বাইকে বসে ডানপায়ে কোনওরকমে কিকস্টার্ট দিয়েছে।

পাতলু চটপট গিয়ে 'সুবুদা'-র পিছনে বসে পড়ল। বাইক গরগর আওয়াজ তুলে অন্ধকার কাঁচা রাস্তা ধরে এগোল। পাতলু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, জগন্ময়ী কালীমন্দিরের আলো ক্রমশ পিছনদিকে চলে যাচ্ছে।

বিবেকানন্দের মূর্তির মোড়ের কাছে এসে রোশনের সাইকেল রিকশা বাঁ-দিকে ঘুরে গেল। ওর সাইকেল রিকশার পিছন-পিছন আসছে আরও তিনটে সাইকেল। সেইসব সাইকেলের আরোহীরা রোশনের সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারখানায় চলেছে। ওরা মন্দিরের ঘটনার সময় হাজির ছিল।

রাস্তায় লোকজনের সেরকম ভিড় নেই, যানবাহনের ব্যস্ততাও নেই। চোখে পড়ছে এদিক-ওদিক চলে যাওয়া সাইকেল, কয়েকটা সাইকেল রিকশা, কখনও-কখনও স্কুটার কিংবা মোটরবাইক, আর কদাচিৎ একটা কি দুটো গাড়ি। গাড়ির হর্নের আওয়াজের তুলনায় সাইকেল রিকশার 'প্যাঁক-প্যাঁক' কিংবা সাইকেলের 'কি-রি রিং, কি-রি রিং' শব্দগুলোই বেশি কানে আসছে।

রাস্তাটা বেশ সরু এবং যথেষ্ট অন্ধকার। রাস্তায় আলো বলতে একপায়ে খাড়া হয়ে থাকা কংক্রিটের পিলারের মাথায় বসানো মলিন টিউবলাইট। তারা এমনিতেই নিজেদের মধ্যে অনেকটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে কয়েকটা আবার খারাপ।

রাস্তার দুপাশে ছোট-ছোট একতলা বাড়ি। তারই মাঝে-মাঝে কয়েকটা দোতলা কাঠামো। সেইসব ঘরবাড়ির ফাঁকে-ফাঁকে মাথা তুলে রয়েছে নারকেলগাছ অথবা সুপুরিগাছ। অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে আরও-অন্ধকার গাছগুলোর ওপরদিকটা ঝাঁকড়াচুলো মাথার মতো দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকাতেই চাঁদের দিকে চোখ পড়ে গেল রোশনের। আর একইসঙ্গে ও চাঁদের আশেপাশে আলোর ফুটকির মতো দু-একটা তারা দেখতে পেল। সবচেয়ে বড় মাপের যে-তারাটা, সেটাকে 'বাবা' বলে ভাবল রোশন। মাঝারি তারাটা ওর 'মা'। আর সবচেয়ে ছোট যে কুট্টি তারাটা, সেটা নিশ্চয়ই 'কুশান'। রোশন চোট পেয়েছে, ডাক্তারখানায় যাচ্ছে—তাই মা, বাবা আর কুশান ওর পাশে-পাশে ভেসে চলেছে।

রোশনের পেটে জ্বালা করছিল, তবে রক্ত সেরকম আর বেরোচ্ছিল না। ওর পাশে বসেছেন সেই বয়স্ক ভদ্রলোক, যাঁর মাথার সব চুল সাদা, চোখে চশমা, গায়ে রঙিন টি-শার্ট। ভদ্রলোকের নাম রতনমণি মাঝি। এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে, 'মহামায়া কটন মিল'-এর কাছে, ওঁর স্টেশনারি দোকান আছে। উনি আর ওঁর ছেলে মিলে চালান। অনেক ঠেলাঠেলি আর চেষ্টা করা সত্ত্বেও ছেলেটা লেখাপড়ার লাইনটা ধরে রাখতে পারেনি। তাই রতনমণি ওকে শেষমেশ দোকানেই লাগিয়ে দিয়েছেন।

আশাপুরের প্রায় সবজায়গাতেই ছোট-ছোট দোকান। রোশন এটা এই ক'দিনে লক্ষ করেছে। স্টেশনারি দোকান, লুচি-পরোটা ভাজার দোকান, তেলেভাজার দোকান, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান—এরকম নানানধরনের দোকান, তবে মাপে আর ব্যাবসার ভলিয়ুমে সেগুলো খাটো।

রতনমণি রোশনের পরিচয় জিগ্যেস করেছিলেন শুরুতেই। রোশন সংক্ষেপে যা বলার বলেছে। তার সঙ্গে এও বলেছে যে, আশাপুরে ও একটা কাজ-টাজের খোঁজে এসেছে। ও গাড়ি চালাতে জানে। ও একসময় ট্যাক্সি চালাত—ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে।

রতনমণি বললেন, 'ঠিক আছে। যদি আমার কাছে কেউ ড্রাইভার-টাইভার খোঁজে আমি তোমাকে ফোন করে দেব। তোমার ফোন-নাম্বারটা আমাকে বলো...।' এ-কথা বলে রতন নিজের মোবাইল ফোনটা পকেট থেকে বের করলেন।

রোশন কিন্তু-কিন্তু করে জানাল যে, ওর কোনও মোবাইল ফোন নেই।

এতে রতনমণি একটুও দমে গেলেন না। একইরকম উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'নো প্রবলেম। আমি বিশুকে, মানে বিশ্বরূপকে ফোন করে জানিয়ে দেব।'

সাইকেল রিকশায় রোশনের পাশে বসার পর থেকেই রতনমণি মাঝি ওর সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছেন। ও আগে কোথায় থাকত, বাড়িতে আর কে-কে আছে, এসব খবরও প্রশ্ন-টশ্ন করে জেনে নিয়েছেন। তারপরই এসেছে কালীমন্দিরের বিশ্রী ঘটনার প্রসঙ্গ।

রোশন রতনমণিকে সব বলেছে। তারপর জিগ্যেস করেছে, 'আশাপুরের সবাই পলান আর ওর দলবলের এইসব টরচার সহ্য করছে কেমন করে?'

উত্তরে হাসলেন। হতাশার তেতো হাসি : 'সহ্য করছি কারণ, আমরা সহ্য করার ট্রেনিং নিয়ে-নিয়ে অসহ্য জিনিসও সহ্য করতে শিখে গেছি।'

রোশন অবাক হয়ে রতনমণির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সহ্য করার ট্রেনিং! সেটা আবার কী!

রতন মাঝি বললেন, 'তুমি অবাক হচ্ছ বুঝতে পারছি। তা হলে শোনো, কী করে পলান আশাপুরের ''দাদা'' হয়ে বসল। শুরু-শুরুতে ছেলেটা খারাপ ছিল না। ভদ্রঘরের ছেলেরা যেমন হয় সেরকমই ছিল। কিন্তু তারপর...।'

পলান নস্কররা আশাপুরের মিত্তিরবাগান অঞ্চলের বাসিন্দা। ও বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাই ছোটবেলা থেকেই আদরে আশকারায় মানুষ হয়েছে। ওদের টাকা-পয়সা ভালোই ছিল। তাই যখন যা বায়না করত তাই পেত। পলান যখন ক্লাস এইটে পড়ে তখন ওর বাবা হঠাৎ করেই গুলেনবেরি সিনড্রোমে মারা যায়। পলানের মা বরাবর রুগ্ন ছিল। স্বামী চলে যাওয়ার বছর খানেকের মধ্যে সেও চলে যায়। পরিবারে ওর মা-বাবা ছাড়া ছিল এক বিধবা পিসি। পলান অনাথ হওয়ার পর সেই পিসিই ওকে কমবেশি মানুষ করার চেষ্টা করেছে। তার কী রেজাল্ট হয়েছে সেটা তো সবাই জানে।

পলান লেখাপড়ায় ততটা ভালো ছিল না, তবে খেলাধুলোয় রীতিমতো চ্যাম্পিয়ান ছিল। স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টসে তিন-চারটে করে মেডেল পাওয়াটা ওর কাছে বলতে গেলে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একশো মিটার রেস, দুশো মিটার, চারশো মিটার, হাইজাম্প, লংজাম্প—কোনটাতে ও ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়নি বা মেডেল পায়নি!

সেই স্পোর্টসম্যান পলান একদিন ঝামেলায় জড়িয়ে গেল।

পলান 'আশাপুর হাই স্কুল'-এ পড়ত। যখন ও ক্লাস টেন-এ পড়ে তখনই ঝামেলাটা হয়েছিল। ক্লাস নাইনে ওঠার পথে দু-দুবার ফেল করায় পলানের বয়েসটা ক্লাসের তুলনায় একটু বেশিই ছিল। সে আজ প্রায় ষোলো কি সতেরো বছর আগের কথা।

আশাপুরের পরেই সাতঘড়িয়া—চলতি কথায় সবাই সাতঘড়া বলে। সাতঘড়ার 'কেশবচন্দ্র বিদ্যালয়'-এর সঙ্গে 'আশাপুর হাই স্কুল'-এর ফুটবল ম্যাচ ছিল। ছোটবেলা থেকেই পলানের চেহারা বেশ গাট্টাগোট্টা, আর ফুলব্যাক পজিশনে ওর খেলা ছিল দেখার মতো। বলতে গেলে দলের দশজন প্লেয়ার ওই একটা ফুলব্যাকের ঠিকঠাক খেলার ওপরে ভরসা করে থাকত।

যে-খেলায় ঝামেলাটা হয় সেটা ছিল সাতঘড়ার মাঠে—জুনিয়র স্কুল লিগের একেবারে ফাইনাল খেলা। তা ছাড়া 'কেশবচন্দ্র বিদ্যালয়'-এর সঙ্গে 'আশাপুর হাই স্কুল'-এর বরাবর একটা রেষারেষি ছিল। তো সেই ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল। রতনমণি মাঝি সেদিন খেলা দেখতে গিয়েছিলেন।

খেলায় প্রচণ্ড মারামারি হয়। 'কেশবচন্দ্র'-এর ছেলেরা প্রথম থেকেই অল আউট মেরে খেলতে থাকে। খেলায় শেষ পর্যন্ত ওরা দুই-এক গোলে জিতেও যায়। রেফারির কাছে বারবার কমপ্লেন করেও 'আশাপুর'-এর কোনও লাভ হয়নি। ফলে যা হওয়ার তাই হল। খেলার শেষে দু-দলের মধ্যে ভয়ংকর হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়।

ওদের গোলকিপার ছিল জনাই। জনাই আবার ক্যাপ্টেন। তার সঙ্গে পলানের মারপিট লেগে যায়। সেসময়ে স্কুলের নাম তুলে ওরা নাকি একজন আর-একজনকে গালিগালাজ করছিল। সাংঘাতিক জেদ নিয়ে পশুর মতো লড়াই করছিল দুজনে।

জনাই একসময় 'আশাপুর হাই স্কুল'-এ পড়ত। যখন ও ক্লাস সিক্সে তখন ও কী একটা কারণে একজন টিচারের মাথা ফাটিয়ে দেয়। ফলে স্কুল থেকে ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই থেকে 'আশাপুর' স্কুলের ওপরে জনাইয়ের রাগ ছিল।

সাতঘড়িয়ার জনাইয়ের বাজে টাইপের ছেলে বলে বেশ বদনাম ছিল। ও নাকি নানান ধরনের কুকাজে বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছিল। ওর সঙ্গে আট-দশজনের একটা দলও ছিল। আর ওর স্বভাব ছিল খুব হিংস্র ধরনের।

লড়াইটা শেষ পর্যন্ত দুটি স্কুলের টিচারদের চেষ্টায় মিটে গিয়েছিল।

কিন্তু ভেতরে-ভেতরে যে মেটেনি সেটা বোঝা গেল দু-সপ্তাহ পর।

দিনটা ছিল দোলের আগের দিন। সেদিন গভীর রাতে কোনও একসময় কেউ বা কারা 'আশাপুর হাই স্কুল'-এর বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দেয়। আশপাশের লোকজন সেটা টের পাওয়ার আগেই আগুন অনেকটা ছড়িয়ে পড়ে। আশাপুরের সবচেয়ে কাছাকাছি দমকলের ঘাঁটি ছিল বাইশ কিলোমিটার দূরে। পাড়ার লোকজন জল, বালতি আর বালি নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিল—সেটা শেষ করল দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে।

আগুন নিভে গেলেও স্কুল-বাড়িটার অনেকটাই ক্ষতি হয়েছিল। অফিসের বহু কাগজপত্র, খাতা, ফাইল সব পুড়ে গিয়েছিল। তবে কোনও মানুষের কোনও ক্ষতি হয়নি, কারণ, সে-রাতে বাড়িটায় কেউ ছিল না।

দোলের পরের দিনটা ছিল রবিবার। সেদিন খবর পাওয়া গেল যে, স্কুল-বাড়িটায় আগুন লাগার ব্যাপারে নাকি সাতঘড়ার জনাইয়ের হাত রয়েছে।

মুখে-মুখে খবরটা আশাপুরে রটে গেল।

এর প্রায় দিনদশেক পর সবাই খবর পেল যে, জনাই জলে ডুবে মারা গেছে।

যেটুকু জানা গেল সেটা হল, সাতঘড়ার একটা ঝিলের ধারে পলানের সঙ্গে জনাইয়ের মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় এবং পুরোনো রাগ থেকে হাতাহাতি মারপিট শুরু হয়ে যায়। এমনই হিংস্র ছিল সেই লড়াই যে, পলানের দুজন সঙ্গী আর জনাইয়ের একজন শাগরেদ রীতিমতো ভয় পেয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও তারা সেই লড়াই থামাতে পারেনি।

কিছুক্ষণ পর আপনাথেকেই পলান আর জনাইয়ের লড়াই থেমে যায়। কারণ, শেষ পর্যন্ত পলান হেরে গিয়েছিল। ঘাস-পাতা ছাওয়া জমিতে চিত হয়ে পড়ে ছিল, হাঁপাচ্ছিল। ওর ঠোঁট ফুলে গেছে, ঠোঁটের কোণে রক্ত, বাঁ-দিকের ভুরুর শেষদিকটা ফেটে গেছে—রক্ত বেরোচ্ছে।

জনাই তখন আঙুল তুলে পলানকে শাসাচ্ছিল। বলছিল, আর কোনওদিন রোয়াবি দেখাতে এলে ও পলানের বডিটা নেপালার কোপে কুচিকুচি করে কলাবতী নদীতে ভাসিয়ে দেবে।

তখন পলান নাকি জনাইয়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চায়, কান্নাকাটি করে। এমনকী জনাইকে 'জনাইদা' বলে ডাকতে থাকে। বলে যে, ওরকম ভুল আর কখনও ও করবে না।

যখন সবকিছু একটা মিটমাটের চেহারা নিয়েছে তখন পলান উঠে দাঁড়িয়ে জনাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে হ্যান্ডশেক করে এবং সেই সময়েই জনাইকে আচমকা এক ধাক্কা দিয়ে ঝিলের জলে ফেলে দেয়।

জনাই সাঁতার জানত না। সেটা জনাইয়ের বন্ধুটি জানত, কিন্তু পলান বা ওর বন্ধুরা জানত না। অন্তত পুলিশকে ওরা তাই বলেছিল। ওরা ভেবেছিল জনাই সাঁতার জানে।

জনাইকে বাঁচাতে পলান ঝিলের জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। ডুবে যাওয়া ছেলেটাকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনাইকে বাঁচানো যায়নি।

ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছিল। কিছুদিন চলেও ছিল ব্যাপারটা। তারপর প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী থিতিয়ে পড়ে। পলানের বিরুদ্ধে কোনও কেস পুলিশ দাঁড় করাতে পারেনি। তা ছাড়া এজাহার দেওয়ার সময় পলান এবং ওর বন্ধুরা শুরু থেকে সেই এককথা বলে গেছে : 'জনাই যে সাঁতার জানে না

সেটা আমরা জানতাম না' এবং 'মারপিট করতে-করতে জনাই আচমকা জলে পড়ে গেছে। এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

জনাইয়ের বন্ধুটি বিতর্ক তুলে বারবার বলেছিল, 'পলান ছেলেটা ঝগড়া মিটমাট করে জনাইয়ের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার পর হঠাৎই জনাইকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেয়।' কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। 'বেনিফিট অফ ডাউট' পলানের ফরে গিয়েছিল।

পুলিশের কেস-টেস মিটে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর পলান বন্ধুদের আড্ডায় বড়াই করে বলে যে, পুলিশকে ও কেমন বুরবাক বানিয়েছে। জনাইয়ের কেসটা আসলে মার্ডার। পলান আগে থেকেই ভালো করে জানত যে জনাই সাঁতার-টাতার জানত না। পলান খবর পেয়েছিল, 'আশাপুর হাই স্কুল'-এ দোলের আগের দিন রাতে জনাইরাই আগুন লাগিয়েছিল। তাই জনাইকে মার্ডার করে পলান বদলা নিয়েছে।

ব্যাপারটা 'হুইসপারিং ক্যাম্পেইন'-এ ধীরে-ধীরে আশাপুরে ছড়িয়ে গেল। এবং আশাপুরের মানুষ মনে-মনে দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল পলানকে 'খুনি' ঠাওরাল। আর-একদল ভাবল পলান 'বীর', 'বিপ্লবী'—'আশাপুর হাই স্কুল'-এর ওপরে অন্যায় আক্রমণের বদলা নিয়েছে।

এইভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছিল পলান নস্করের ক্রাইম-জীবন।

জনাইয়ের ঘটনার পরই ও লেখাপড়া পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিল, আর খারাপ কাজের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিল। ওর সঙ্গীসাথী যারা ছিল তারা ওর কুকাজের শাগরেদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

লেখাপড়া না শিখলে কী হবে, পলানের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি মানে কুবুদ্ধি। এই যেমন ধরা যাক, ওর নিয়মিত তোলা আদায়ের ব্যাপারটা। আশাপুরে যার-যার কাছ থেকে ও তোলা তোলে তাদের প্রত্যেককে ও বিল কেটে দেয়। বিলে লেখা থাকে 'আশাপুর উন্নয়ন সমিতি'। আরও লেখা থাকে যে, আশাপুরের উন্নয়নের কাজে চাঁদা হিসেবে টাকাটা নেওয়া হচ্ছে।

বোঝাই যাচ্ছে, 'আশাপুর উন্নয়ন সমিতি' একটা ঢপের সংস্থা এবং পলান নস্করই এর সব। অর্থাৎ, পলানই হচ্ছে এর সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, ক্যাশিয়ার—সব। সুতরাং, যখন কেউ 'স্বেচ্ছায়' আশাপুরের উন্নয়নের কাজে চাঁদা দিচ্ছে তখন পুলিশের কিছু বলার থাকতে পারে না। তা ছাড়া পলানও তো পুলিশকে মাসে-মাসে 'চাঁদা' দেয়। তাই পুলিশ আশাপুরের স্রেফ অঙ্গসজ্জা হয়ে বেঁচে রয়েছে। পলানের 'ব্লাইন্ড ফাইট' গেম নিয়েও পুলিশের কোনও মাথাব্যথা নেই। ওটা তো নিছকই একটা গেম—তার বেশি তো কিছু নয়!

সাইকেল রিকশায় যেতে-যেতে রতনমণি মাঝি রোশনকে পলানের 'সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনি' শোনাচ্ছিলেন। রোশন একমনে শুনছিল। শুনতে-শুনতে ও এমন ঘোরের মধ্যে ঢুকে গেল যে, পেটের কাটা জায়গাটার জ্বালা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেল।

সাইকেল রিকশা চলতে-চলতে বাঁ-দিকে ঘুরেছে আবার। একটা সরু রাস্তায় ঢুকে পড়েছে। আগের রাস্তাটার তুলনায় এই রাস্তাটা আরও বেশি অন্ধকার এবং বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। কয়েকটা মাঠ আর একটা পুকুর চোখে পড়ল রোশনের। কোত্থেকে যেন হাওয়া ছুটে আসছিল—রোশেনের মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছিল বারবার।

একটু পরেই রিকশা থামল। ডক্টর সুধীর পাঠকের চেম্বার এসে গেছে। সামনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তারপর চেম্বার। চেম্বারের মাথায় সাইনবোর্ড। তাতে লেখা : 'সুনিরাময়'। তার নীচে ডাক্তারবাবুর নাম লেখা রয়েছে 'ডক্টর সুধীর চন্দ্র পাঠক, এম. বি. বি. এস.'।

রোশনের সাইকেল রিকশা থেমে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রিকশার অনুসারী হয়ে আসা তিনটে সাইকেলও দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুধীরডাক্তারের চেম্বারে টিউবলাইট জ্বলছে। ঘরটা বেশ বড়। দু-পাশে দুটো লম্বা-লম্বা বেঞ্চি পাতা রয়েছে। সেখানে চারজন পেশেন্ট বসে রয়েছে। ঘরের পিছনের দেওয়াল ঘেঁষে ডাক্তারবাবু বসে রয়েছেন। ফরসা, মোটাসোটা চেহারা। কালো চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। চোখে মোটা ফ্রেমের সেকেলে চশমা।

ডাক্তারবাবুর সামনে একটা ছোট টেবিল। ওঁর মুখোমুখি চেয়ারে একজন পেশেন্ট বসে রয়েছে। পেশেন্টের মুখ কাচুমাচু। ডাক্তারবাবু মাথা নীচু করে নিজের প্যাডে একটা প্রেসক্রিপশন লিখছেন। সেই অবস্থাতেই জোরালো গলায় বললেন, 'এই ট্যাবলেটটা সাতদিন একটা করে খাবেন। দু-চারদিন খেয়ে ছেড়ে দেবেন না।'

ডাক্তারবাবুর পাশে দেওয়ালে একটা ইংরেজি ক্যালেন্ডার ঝুলছে—তাতে বড়-বড় হরফে তারিখ লেখা। ক্যালেন্ডারের পাশেই ঠাকুরের ফটো। ফটোর সামনে ঠাকুরের আসনে ছোটমাপের দুটো ধূপকাঠি জ্বলছে। ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে আছে চেম্বারে।

সুধীরডাক্তারের চেম্বারটা বেশ মলিন। দেওয়ালে অনেকদিন কলি পড়েনি। ফার্নিচারগুলোও বেশ পুরোনো। ডাক্তারবাবুর পাশে একটা খাটো আলমারি দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাল্লায় কাচ বসানো। সেটা দেখে বেশ নতুন বলে মনে হয়। তার পাশটিতে একটি সরু খাটে বিছানা পাতা রয়েছে—পেশেন্টদের চেক-আপের জন্য।

রতনমণি রোশনের কাঁধে হাত রেখে ওকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ির ধাপগুলো উঠলেন। ওঁদের পিছনে তিনজন সঙ্গী।

পেশেন্টরা সকলে রোশনদের দিকে তাকাল। ডাক্তারবাবুও প্রেসক্রিপশন লেখা থামিয়ে মুখ তুলে তাকালেন।

রতনমণি মাঝি বললেন, 'ভাই সুধীর, একটা এমার্জেন্সি কেস নিয়ে এসেছি। এই ছেলেটি—রোশন—চোট পেয়েছে। কালীমন্দিরের ওখানে। তুমি শিগগিরই একটু দ্যাখো...।'

সুধীরডাক্তার চেয়ার ছেড়ে চট করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আসুন রতনদা, এদিকে নিয়ে আসুন। একটু আগে আমি ফোনে খবর পেয়েছি। আমার একজন পেশেন্ট স্পটে ছিল। সে সব দেখেছে...আমাকে ফোনে সব বলেছে...।'



ডাক্তারবাবুর সামনের চেয়ারের রুগিটিও উঠে দাঁড়াল। রোশনকে জায়গা করে দিতে চাইল।

রতনমণি মাঝি রোশনকে আগলে নিয়ে গিয়ে সুধীরডাক্তারের সামনের চেয়ারটায় বসিয়ে দিলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'না, না—চেয়ারে না। ওর তো পেটে উন্ড আছে। ওকে এই বেডটায় শুইয়ে দিন—।'

রতনমণি রোশনকে বিছানায় শুয়ে পড়তে বললেন। ওর কাঁধের কাছটা ধরে শুতে সাহায্যও করলেন।

সুধীরডাক্তার এগিয়ে এসে রোশনের ওপরে ঝুঁকে পড়লেন। চাপা গলায় বললেন, 'পলানটা বড্ড বেড়েছে...।'

ঠিক সেই সময় পলান দুজন শাগরেদকে নিয়ে কালীমন্দিরে পৌঁছে গেছে।

পুরুতমশাই আরতি করছিলেন। বাইকের আওয়াজে আরতি করতে-করতেই পিছনদিকে তাকালেন।

দুটো মোটরবাইক মন্দিরের চাতাল ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের ইঞ্জিন গরগর করছে। তারই একটায় বসে আছে পলান। দু-হাত বাইকের দু-হাতলে। গায়ে লাল রঙের রাউন্ড নেক টি-শার্ট। টি-শার্টের দু-হাতার নীচে পলানের পেশি অহংকারে টগবগ করে ফুটছে।

পলান বাইকের ইঞ্জিন অফ করল।

মন্দিরে হাজির ভক্তের দলকে চমকে দিয়ে ছোটলোকের মতো চেঁচিয়ে উঠল।

'এ ঠাকুরমোসাই! ঠাকুরমোসাই! কয়েকটা পেন্ডিং কাজ সারতে চলে এলাম।' পলান জনগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে উঁচিয়ে ধরল। তারপর : 'অ্যাই, সব ফোট! পুরুতমোসাই ছাড়া সব পাতলা হয়ে যা! ফোট, সব ফোট...!'

পলানের কথায় পুরুতমশাইয়ের আরতি থমকে গেল। একজন মাঝবয়েসি মানুষ মন্দিরের ঝোলানো ঘণ্টাটা বাজাচ্ছিলেন—তাঁর হাতের আন্দোলন থেমে গেল। বেশ কয়েকজন মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে ঠাকুরমশাইয়ের পাশে জড়ো হয়ে গেল।

ঠাকুরমশাইয়ের একহাতে পঞ্চপ্রদীপ—তার পাঁচটা শিখা জ্বলছে। বাঁ-হাতে ধরা ছোট ঘণ্টাটা থেমে থাকলেও তার ছোট ধাতুর পেন্ডুলামটা তিরতির করে দুলছে। মন্দিরের ভেতরে দুটো জ্বলন্ত ধুনুচি মেঝেতে রাখা ছিল। সেগুলো থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে ওপরে উঠছে। ধোঁয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধুনোর গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছিল বাতাসে। কারও-কারও চোখ অল্প-অল্প জ্বালা করছিল।

পলান বাইক থেকে নেমে বাইকটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করাল। ওর দুজন শাগরেদ দ্বিতীয় বাইকটায় বসে ছিল। ওদের বাইকের ইঞ্জিন তখনও গরগর করছিল। শাগরেদদের একজনের চোয়াল নড়ছিল। বোধহয় চুইংগামজাতীয় কিছু চিবোচ্ছিল।

'এ তুমি কী করছ, পলান!' পুরুতমশাই আহত গলায় বলে উঠলেন, 'ভুলে যেয়ো না এটা মন্দির—জাগ্রত মা-কালীর মন্দির। তুমি তো এই আশাপুরেরই ছেলে! জগন্ময়ী কালীমন্দিরকে শ্রদ্ধা বা সম্মান করতে শেখোনি!'

পলান ঠাকুরমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। কুমির যদি হাসতে পারত তা হলে বোধহয় এমনটাই দেখাত।

পুরুতমশাইয়ের কথার পিঠে আরও দু-তিনজন বলে উঠল, 'কালীমন্দিরে এসব রক্তারক্তি ব্যাপার...এসব কি ভালো হচ্ছে?'

পলান সেসব কথায় কোনও পাত্তা না দিয়ে টুসকি দিয়ে বলল, 'অ্যাই, বললাম না, সব ফোট—সোজা ন' দো গিয়ারা হো যা...!'

পলানের হুমকিতে দু-চারজন করে ভিড় পাতলা হতে লাগল।

পলান এবার পুরুতমশাইয়ের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'আবে কেলে চিংড়ি, অনেক জ্ঞান দিয়েছিস—এবার শাটার বন্ধ কর! এখানে কিচ্ছু হয়নি! পুলিশ ছানবিন করতে এলে ভাট বকবি না—যা সত্যি তাই বলবি। এখানে কিচ্ছু হয়নি—সব ঠিকঠাক আছে...।'

'কী বলছ? কিচ্ছু হয়নি!' পুরুতমশাইয়ের মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে গেল। অসহায় মানুষটা মা-কালীর মুখের দিকে তাকাল।

তখনও যে-কয়েকজন ভক্ত পুরুতমশাইয়ের চারপাশে এদিকে-ওদিকে দাঁড়িয়ে ছিল তারা অবাক ভয়ে পলানকে দেখছিল।

পলান শাগরেদদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল, 'অ্যাই, নে, অ্যাকশন শুরু কর...।'

সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় বাইকটার ইঞ্জিন থেমে গেল। শাগরেদ দুজন বাইক থেকে নেমে পড়ল। বাইকটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে দিল একজন। তারপর বাইকের কেরিয়ারের ডালা খুলে দুটো ন্যাকড়া আর একটা জলের বোতল বের করে নিল।

এবার যা শুরু হল তা সত্যিই অবাক করার মতো। পলানের একজন চ্যালা বোতলের ছিপি খুলে মন্দিরের চাতালে এদিক-ওদিক বেশ ভালো করে জল ছিটিয়ে দিতে লাগল। আর অন্যজন একটা ন্যাকড়া দিয়ে চাতালের ওপরে হুমড়ি খেয়ে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল এবং চটপটে হাতে চাতালটা মুছতে লাগল।

বোতালের জল খালি হয়ে যেতে দ্বিতীয়জন খালি বোতলটা ওদের বাইকের কেরিয়ারে ঢুকিয়ে দিল। তারপর দ্বিতীয় ন্যাকড়াটা দিয়ে চাতাল মোছার কাজ শুরু করে দিল।

চাতালের যে-অংশে রোশন আর সুবুর সংঘর্ষ হয়েছিল সেখানে রক্তের কয়েকটা ফোঁটা পড়ে ছিল। এ ছাড়া ছিল ইটের ছোট-ছোট দু-তিনটে টুকরো আর ধুলো, মাটি, রক্তের দাগ। পলানের চ্যালা দুজন মুখ বুজে ক্ষিপ্র হাতে চাতালটা মুছে পরিষ্কার করতে লাগল।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ওদের কাজ শেষ। চাতালটা এখন ঝকঝকে তকতকে। লড়াইয়ের কোনও চিহ্নই সেখানে আর নেই।

কাজ শেষ হতে ওরা উঠে দাঁড়াল। প্রশ্ন নিয়ে তাকাল পলানের দিকে। যার অর্থ : 'দাদা, দ্যাখো তো, ঠিকঠাক সাফা হয়েছে কি না—।'

পলান চোখ সরু করে সেই নজর দিয়ে চাতালটা একবার চেটে নিল। তারপর বলল, 'নে, জলদি এপিসোড শেষ কর...।'

এ-কথা বলামাত্রই শাগরেদ দুজন ভিজে ন্যাতা দুটো বাইকের কেরিয়ারে গুঁজে দিল। একজন বাইকটা স্ট্যান্ড থেকে নামিয়ে তাতে চড়ে বসল। দু-হাতের মুঠোয় হাতল দুটো ধরে কিক স্টার্ট দিল।

অন্যজন 'মহাপ্রণামী' লেখা বাক্সটা চাগিয়ে তুলে নিল।

সেটা দেখে ভক্তদের একজন মোবাইল ফোন বের করে ক্যামেরা তাক করল তার দিকে।

পলান দু-লাফে লোকটির কাছে পৌঁছে গেল। সপাটে এক থাপ্পড় কষাল তার গালে।

লোকটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। আর হাতের মোবাইল ফোনটাও কোথায় যেন ছিটকে পড়ল।

'সুয়োরের বাচ্চা!' চোখ কটমটিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল পলান, 'তোর সাহস তো কম নয়! ফটো তোলা একেবারে কামফুট করে দেব। অ্যাই, সবাই কান খুলে শুনে রাখ—কারও ফোনে যেন আজকের ক্যাচাল কেসকামারির কোনও ফটো-টটো না থাকে। সব ফটো ডিলিট করে দিবি। নইলে আমি সবক'টা হারামির অওলাদকে দুনিয়া থেকে ডিলিট করে দেব!' মারার ভঙ্গিতে হাত তুলে শরীরের একটা ঝটকা দিল পলান : 'ফোট—ফোট এখান থেকে!'

পলানের হুমকিতে সবাই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সটকে গেল। ভাগশেষ হিসেবে পড়ে রইলেন শুধু পুরুতমশাই।

ততক্ষণে মোটরবাইক রওনা হওয়ার জন্য রেডি। চুইংগাম চিবোনো ছেলেটা পাইলটের সিটে বসে হাতল ঘুরিয়ে ইঞ্জিনের গর্জন ওঠা-নামা করাচ্ছে, আর দ্বিতীয়জন তার পিঠে পিঠ লাগিয়ে বাইকের উলটোমুখী সওয়ারি হয়ে বসেছে। মহাপ্রণামীর বাক্সটা তার দু-হাতে ধরা—তার কোলের ওপরে বাক্সের লোডটা ব্যালান্স করা।

পলান চ্যালা দুজনের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'হাঁ করে দেখছিস কী! কেটে পড় তোরা। বাক্সটাকে আমাদের তিননম্বর ঠেকে ছুপে লে। তারপর দেখি পুলিস কী কেস করে।'

ওদের বাইক গর্জন তুলে মন্দির থেকে রওনা হয়ে গেল।

পলান পুরুতমশাইয়ের কাছে গেল। মিষ্টি গলা করে বলল, 'ও ঠাকুরমোসাই—তাকিয়ে দ্যাখো ওই চাতালটার দিকে—একেবারে সাফসুফ থুতুপালিশ করা। এখানে কোনও ক্যাজরা হয়নি, কোনও মারপিট হয়নি, কেউ চোট পায়নি, কারও ব্লাড-ফাড খরচা হয়নি। আর পুলিস এলে দেখবে, এখানে প্রণামীর বাক্স ওই একটাই—''মহাপ্রণামী'' লেখা কোনও বাক্স কোনওদিন এখানে ছিল না—কী বলো, ঠাকুরমোসাই?' বাঁকা সুরে প্রশ্নটা করে 'হ্যা-হ্যা' করে হেসে উঠল পলান। যেন বেশ উঁচুদরের একটা জোক মেরেছে।

পুরুতমশাই তোতলাতে শুরু করলেন। ওঁর রোগা শরীরটা রাগে কাঁপছিল। কিন্তু ওই কাঁপা পর্যন্তই। অসহায় মানুষটা মা-কালীর মুখের দিকে তাকাল। তার চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কয়েকবার ঢোঁক গিলে পুরুতমশাই কোনওরকমে বললেন, 'মা-কালী সব দেখেছেন। তুমি যতই মিথ্যে বল, সত্যিটাকে কিছুতেই ঢাকা দিতে পারবে না...।'

পলান ঠাকুরমশাইয়ের খুব কাছে এগিয়ে গেল। ঠাকুরমশাইয়ের মুখের ওপরে মুখ এনে বলল, 'চুপ কর, সালা!' রিভলভারটা রোগা থরোথরো মানুষটার মুখের সামনে নিয়ে এল : 'এখুনি একটা দানা ঠুকে দিলে তোর লাইট অফ হয়ে যাবে!'

কথাগুলো বলার সঙ্গে-সঙ্গে এক ফুঁয়ে ঠাকুরমশাইয়ের হাতের পঞ্চপ্রদীপের একটা শিখা নিভিয়ে দিল পলান।

ঠাকুরমশাই ভয়ে পিছনে সরতে গিয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন। ওঁর শরীরের আন্দোলনে হাতের ছোট ঘণ্টাটা টুং-টুং করে বেজে উঠল।

পলান চারপাশে একবার দেখল। কেউ নেই—সব ফাঁকা। ওর হুমকিতে ভালোই কাজ হয়েছে। এবার পুলিশে ফোন করে দেওয়া যাক।

রিভলভারটা পকেটে ঢুকিয়ে মোবাইল ফোন বের করল পলান। তারপর সাব-ইনস্পেকটর সুরেন্দ্রনারায়ণ দাসকে ফোন করল।

'অ্যাই, সুরেনদা—পলান বলছি...।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলুন পলানদা। এতক্ষণ আপনার ফোনটার জন্যেই ওয়েট করছিলাম।'

'জগন্ময়ী কালীমন্দিরে একবার চলে আসুন। এখানকার ঠাকুরমোসাইয়ের সঙ্গে একবার কথা বলুন। মালটা কীসব ভুলভাল বকছে...।'

'আর বলবেন না, পলানদা—' একেবারে ইয়ারদোস্তের সুরে বলল সুরেন দাস, 'তখন থেকে কয়েকটা পাবলিক বারবার থানায় ফোন করে একেবারে জ্বালিয়ে মারছে। বলছে, মন্দিরের চাতালে নাকি দু-দুটো প্রণামীর বাক্স—সে নিয়ে কীসব ফ্রিকশন লেগেছে। আমি তো গাড়ি নিয়ে বেরোইনি। আপনার গ্রিন সিগন্যাল না পেলে তো আমি বেরোই না আপনি জানেন। তাই আপনার ফোনটার জন্যেই ওয়েট করছিলাম...।'

পলান হেসে বলল, 'ওসব কিচ্ছু নয়। পুরোটাই বলতে গেলে গুজব। কে একজন ফোন করে আমাকে খবর দিয়েছিল...তো এসে দেখছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভুল খবর। এখানে সবকিছু ঠিকঠাক...ঠাকুরমোসাইও তাই বলছেন। তবুও আপনি একবার রাউন্ড দিয়ে যান, কথা বলে যান...।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখুনি যাচ্ছি। আর...মানে, আমার ভিজিটের টাকাটা...।'

'কোনও চিন্তা করবেন না, সুরেনদা। ও-টাকা কালকের মধ্যেই আপনার ডানপকেটে পৌঁছে যাবে।'

ফোন শেষ করল পলান। ফোনটা পকেটে রেখে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকবার টান দিল। ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে কাশল দুবার। ঠাকুরমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে একবার নিঃশব্দে হাসল। তারপর বাইকের কাছে গিয়ে চড়ে বসল। একহাতে স্টিয়ারিং ধরে কিক স্টার্ট দিল। গরর গরর গর্জন তুলে পলানের বাইক চলতে শুরু করল।

রোশন ছোকরাটা ধীরে-ধীরে যেন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুবু আর পানকো—মানে, প্যাঁকাটির থেকে—এপিসোডের সব খবরই পেয়েছে পলান। বারবার 'মহাপ্রণামী'-র বাক্সের টাকা পানকো আর সুবুই কালেকশন করে। কখনও এ নিয়ে কোনও লাফড়া হয়নি। কিন্তু এবারে রোশন ছেলেটা কী করে যেন মাঝখানে ঢুকে পড়েছে। ঢুকে পড়েই একটা ঝামেলা বাধিয়েছে।

রোশনের সঙ্গে এতদিনে যে-ক'বার ঝামেলা হয়েছে প্রত্যেকবারই ব্যাপারটা বেশ ভালোরকম চাউর হয়ে গেছে। আজকের ঝামেলাটাও এতক্ষণে ছড়িয়ে গেছে আশাপুরে। এটা পলানের পক্ষে মোটেই ভালো হচ্ছে না। কারণ, সবসময় পাবলিক সিমপ্যাথি রোশনের দিকে যাচ্ছে। এর ফলে একটা সময় এমন আসবে যে, পাবলিক আর পলানের ভয় দেখানো শাসন মানবে না।

নিজের ওপরে রাগ হচ্ছিল পলানের। একটা অচেনা অজানা অজ্ঞাতকুলশীল ছেলে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল আশাপুরে আর পলানের সলিড পাথরের দুর্গে চিড় ধরতে শুরু করল।

রোশন! রোশন! রোশন!

পলানের মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল হঠাৎ। ছেলেটাকে আর বরদাস্ত করা যাচ্ছে না।

ও কোথা থেকে এল? ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কী? পলানকে সেসব জানতে হবে। ছেলেটার পাস্ট হিস্ট্রি খোঁড়াখুঁড়ি করে ওর গল্পটাকে বের করে আনতে হবে। তারপর...তারপর এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে আশাপুরের মানুষের কাছে রোশন অসহ্য হয়ে ওঠে। তা হলে এখানকার মানুষরাই রোশনকে হেনস্থা করবে, অপমান করবে, এমনকী গায়েও হাত তুলতে পারে।

হাতের সিগারেটটা অনেক ছোট হয়ে গিয়েছিল। পলানের বাইক তখন একটা অর্ধেক তৈরি হওয়া আধাখ্যাঁচড়া বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বাইক বেশ জোরে ছুটছিল। ওর মুখে মাথায় হাওয়ার ঝাপটা লাগছিল। সিগারেটের টুকরোটা এক টুসকিতে বাড়িটার দিকে ছিটকে দিল পলান। আগুনের বিন্দুটা বাতাসে সাঁতার কেটে উড়ে গেল। একটু পরেই মাটিতে পড়ল। আগুনের ফুলকি ঠিকরে গেল এদিক-ওদিক।

পলানের মনে পড়ল, সাত-আটমাস আগে রেললাইনের ধারে ও একটা ছেলের লাশ নামিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটার বয়েস কত ছিল? পঁচিশ কি ছাব্বিশ। ছেলেটা গোডাউন ফাইটের এগেইনস্টে পাবলিসিটি করছিল। দলবাজি করছিল। বলছিল, পলান আর ওর দলবলকে পাবলিক চিরকাল বরদাস্ত করবে না।

ছেলেটার নাম ছিল সুভাষ। আশাপুরের দক্ষিণদিকে রয়েছে একটা গ্রাম, বইজুপুর। ছেলেটা সেই বইজুপুরে থাকত। ফরসা রোগা চেহারা ছিল ওর। নিজেকে বোধহয় নেতাজি সুভাষ ভাবত। তাই বড্ড বাড়াবাড়ি করছিল।

গোডাউন ফাইট নিয়ে মিউচুয়াল করার জন্য একদিন রাতে সুভাষকে রেললাইনের ধারে ডেকে এনেছিল পলান।

তারপর ওকে ঠুকে দিয়েছিল।

রোশনকেও সেরকম একটা কিছু করলে হয়।



বারো নম্বর বস্তির ভেতরের 'লুকোচুরি'-গলি ধরে নিতু ওর জীর্ণ সাইকেলটাকে 'হাঁটিয়ে' নিয়ে যাচ্ছিল। কোথাও-কোথাও গলির বাঁকগুলো এমন যে, সাইকেলটাকে পাস করাতে দুবার আগুপিছু করাতে হয়।

সকাল সবে সাড়ে সাতটা পেরিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই বস্তির অনেক ঘর থেকেই রান্নার গন্ধ আর ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। গন্ধগুলো নিতুয়ার খুব ভালো করে চেনা। আর এই বস্তিতে যারা থাকে তাদের রান্নার দৌড় কতটুকু সেটাও নিতুয়ার ভালো করে জানা। ভাত, জলের মতন একটু ডাল, আর আলুসেদ্ধ অথবা ডাঁটাচচ্চড়ির মতন কিছু একটা।

নিতুর রান্নাবান্নার পাট নেই। একা মানুষ—রোশনের মতোই। তাই রাস্তার ধারের ঝুপড়ি হোটেলে ডাল-ভাত খেয়েই দিন কাটে। আর রাতে তিনটে রুটি, সঙ্গে একটু আলুভাজা। সারাদিনে নিতু যে এসব ছাড়া আর কিছু খায় না তা নয়। রোজ ওর বরাদ্দ একপ্যাকেট বিড়ি আর দু-চার ঢোঁক সস্তার নেশা। প্রায়ই ভাবে ওই 'এইচ টু ও'-র নেশাটা ছেড়ে দেবে—অনেক চেষ্টাও করেছে ছেড়ে দেওয়ার—কিন্তু এখনও পর্যন্ত পেরে ওঠেনি। তবে চেষ্টাটা ছাড়েনি।

নিতুর নাকে রান্নার ঝাঁজ এল, ফোড়নের গন্ধ এল। ওর খিদে পেল, জিভে জল চলে এল। কিন্তু না, এখন খিদে পেলে চলবে না। নিজেকে শাসন করল নিতু : সকালে ও না একপিস পাঁউরুটি আর চা খেয়েছে! আবার সেই বেলা একটা-দুটোয় খাবে।

অভাব—অভাবটা বড় চেপে ধরেছে। অথচ যখন ও বাসে-ট্রেনে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে চুপিসাড়ে পকেট কাটার অপারেশন চালাত তখন ওর আয় নেহাত মন্দ ছিল না। ঠিকমতো 'কাজ' হলে হাতে ভালো টাকাই থাকত। বেশ ফুটানি করে দিন কাটত, ভালোমন্দ খেত। কিন্তু একটা সময়ে ওর ক্ষমতা কমতে

লাগল। যে-ক্ষমতা পকেটমারদের জন্য সবচেয়ে জরুরি। মার খাওয়ার ক্ষমতা, মার খেয়ে মার সহ্য করার ক্ষমতা।

পকেটমার কখনও না কখনও ধরা পড়বেই। তখন তার কপালে পাবলিক ধোলাই অনিবার্য। নিতু সেই ধোলাই দিব্যি সহ্য করতে পারত। এ ব্যাপারে বস্তিতেও ওর বেশ নামডাক ছিল। কিন্তু গত তিন-চারবছর ধরে ওর শরীর সেই ধকল আর নিতে পারছে না। একবার ও পয়সা খরচ করে ডাক্তারও দেখিয়েছিল। ডাক্তারবাবু যা বলেছিলেন তাতে ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর শিরদাঁড়ায় নাকি বেশ গোলমাল রয়েছে। যদি কখনও সেরকম চোট লাগে তা হলে স্রেফ বিছানায় শুয়ে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

সে-কথা শুনে নিতু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বলতে গেলে প্রায় পরদিন থেকেই লাইন ছেড়ে দিয়েছিল। এবং সেই থেকেই অভাব ওকে জড়িয়ে ধরতে শুরু করেছিল।

এ-গলি সে-গলি করে সাবিত্রীর ঘরের দরজায় এল নিতু। সাবিত্রী তখন উবু হয়ে বসে ঘর মুছছে। নিতুকে দেখে কাজ থামিয়ে তাকাল।

নিতু জিগ্যেস করল, 'বউদি, ববিন কোথায়?'

'কোথায় আবার? মাঠে—রোশনের সঙ্গে রোজ যেমন যায়...।'

'আমি তা হলে মাঠেই যাই। সকালের হাওয়া টানলে শরীরটা ভালো থাকবে।'

সাইকেল 'হাঁটিয়ে' রওনা হয়ে গেল নিতুয়া। ও আসলে জানতে চাইছিল রোশন ববিনকে নিয়ে মাঠে ফুটবল খেলাতে গেছে কি না।

কিছুদিন হল রোশন কয়েকটা ছোট-ছোট বাচ্চাকে নিয়ে মাঠে ফুটবল খেলা শুরু করেছে। বাচ্চাদের সেই লিস্টে ববিনও আছে। ববিনকে নিয়েই রোশন ব্যাপারটা শুরু করেছিল—পরে বারো নম্বর বস্তির আরও চারটে বাচ্চা ছেলে সঙ্গে জুটে যায়।

ববিনকে সুন্দর একটা ফুটবল কিনে দিয়েছিল রোশন—তার গায়ে লাল আর সাদা রঙের ছ'কোনা খোপ-খোপ নকশা। তারপর ওকে বলেছিল, 'তুই রোজ সকালে আমার সঙ্গে ফুটবল প্র্যাকটিস করবি...।'

ববিন তো ঘাড় হেলিয়ে এককথায় রাজি।

আশাপুরে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে। তার সঙ্গে লাগোয়া একটা বিশাল ফাঁকা মাঠ। মাঠের জায়গায়-জায়গায় ঘাস থাকলেও বাকিটায় ঘাসের আস্তর নেই। মাঠের তিনদিকের সীমানার কাছাকাছি লম্বা-লম্বা ঘাস আর আগাছা। চার-পাঁচটা বড়-বড় গাছও আছে। একটা গাছের গা ঘেঁষে রংচটা একটা ঘরের মতন। ঘরটা জরাজীর্ণ, ভাঙাচোরা। এককালে একটা টয়লেট তৈরির চেষ্টা হয়েছিল—এটা তারই অবশেষ। মাঠে খেলতে এসে ছোট-বড় সবাই নিরুপায় হলে এটাকেই ব্যবহার করে।

মাঠের তিনদিকের রাস্তা কাঁচা হলেও একদিকে রয়েছে সরু পিচরাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ি, মোটরবাইক, সাইকেল আর সাইকেল-রিকশা যাতায়াত করে। কখনও-কখনও বালি কিংবা স্টোনচিপ লোড করা লরিও যায়। সেইসব লরির চাপে রাস্তাটা জায়গায়-জায়গায় বসে গেছে, ফাটল ধরেছে। রাস্তার দুপাশে কোথাও-কোথাও খুচরো দোকানপাট—মুদিখানা দোকান, হার্ডওয়্যারের দোকান, মোবাইল ফোন রিচার্জের দোকান। এসবের মাঝে বেমানানভাবে একটা ব্যাংকও রয়েছে : সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আশাপুর ব্রাঞ্চ। ব্যাংকটা খেলার মাঠের ঠিক উলটোদিকে—একটা বড়সড় দোতলা বাড়ির গোটা একতলাটা জুড়ে। ব্যাংকে দু-দুটো টিনের সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে : একটা হরাইজন্টাল, আর-একটা ভার্টিক্যাল। দুটো সাইনবোর্ডই পুরোনো ধাঁচের, ফ্রেমের কোনা ভাঙা, টিন সামান্য তোবড়ানো।

নিতু সাইকেল চালিয়ে মাঠের কাছে চলে এসেছিল। একটা সরু নালা। তার ওপরে চওড়া কালভার্ট। সেটা পেরিয়ে ও রাস্তা থেকে ঢুকে পড়ল মাঠে। সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ল। সাইকেলটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর রোশন আর ববিনের দিকে দেখল।

সকালের রোদ এসে পড়েছে মাঠে। মাঠের কিনারায়, যেখানে কয়েকটা গাছপালার আড়াল রয়েছে, সেখানে গাছের পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে এসে রোদের টুকরো খুচরো পয়সার মতন ছড়িয়ে পড়েছে মাঠের ওপরে। আর ফাঁকা জায়গায় রোদের চাদর মোলায়েমভাবে বিছিয়ে আছে।

মাঠের মাঝখানে ববিন ওর বয়েসি আরও চারটে ছেলের সঙ্গে ছুটোছুটি করছে। ওদের পায়ে-পায়ে ঘুরছে একটা ফুটবল—লাল আর সাদা রঙের।

গনিরামের শেষ কাজের সময় ববিন নেড়া হয়েছিল। সেইজন্যই ওর মাথায় এখন ছোট-ছোট মিহি চুল।

বাচ্চাগুলো খেলছে আর কচি গলায় চেঁচামেচি করছে। ওদের 'কোচ' রোশন তখন বালি নিয়ে ব্যায়াম করছে।

মাঠের একপাশে বালির স্তূপ। তার পাশেই থাকে-থাকে সাজানো কয়েকশো নতুন ইট। মাঠ পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে, একটু নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। হয়তো তারই ইট আর বালি মাঠের এক পাশ ঘেঁষে রাখা হয়েছে।

রোশন ব্যায়াম করছিল।

বালির স্তূপের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল ও। হাতের চেটো দুটোকে লোহার পাতের মতো শক্ত করে ও একবার ডানচেটোটা বালির মধ্যে প্রচণ্ড জোরে গেঁথে দিচ্ছিল, আর-একবার বাঁ-চেটোটা ঢুকিয়ে দিচ্ছিল বালির ভেতরে। এই কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রোশনের মুখ থেকে ছোট-ছোট শব্দের টুকরো ছিটকে বেরোচ্ছিল।

ওর খালি পা। গায়ে পোশাক বলতে ছাই রঙের শর্টস আর নীল রঙের একটা পোলো নেক টি-শার্ট। টি-শার্টটা ঘামে ভিজে গেছে। হাতে ঘামের ফোঁটা, কপালে, গলায় ঘামের প্রলেপ। হাতের পেশি যেন পাকানো দড়ি। তার ওপর দিয়ে নীলচে শিরা এঁকেবেঁকে চলে গেছে।

নিতুয়া পায়ে-পায়ে রোশনের কাছে এগিয়ে এল। ওর শরীরচর্চা দেখতে লাগল।

এই মাসখানেকের মধ্যেই ছেলেটা কী করে যেন আপনজন হয়ে গেছে। সবসময় সবাইকে হেলপ করার জন্য এগিয়ে যায়, অন্যায় দেখলে প্রোটেস্ট করে। অবশ্য তার জন্য ওকে হেনস্থাও কম হতে হয় না!

রোশন ব্যায়াম করতে-করতে নিতুয়ার দিকে একবার তাকাল, একটু হাসল।

নিতুয়াও হাসল। হাসিটা কেমন যেন অপরাধীর মতো দেখাল। আসলে ও রোশনের কাছে ক'টা টাকা ধার চাইতে এসেছে। সাবিত্রীর কাছে ও এইজন্যেই ববিনের খোঁজ করার ছলে জানতে চেয়েছিল রোশন আজ মাঠে বেরিয়েছে কি না।

পকেটমারি লাইন ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে নিতু বেশ টানাটানির মধ্যে দিন কাটায়। তাই কিছু পয়সা সৎ পথে আয় করার জন্য ও যে-কোনও কাজের সুযোগ পেলেই সেটা আঁকড়ে ধরে। কারও বাগানের আগাছা সাফ করার কাজ, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ, কুয়োর বেড় বসানোর কাজ বা কারও বাড়ির টালি ছাওয়ার কাজে হেলপারি, কিংবা রং করার ছোটখাটো কোনও কাজ।

এককথায় নিতু এখন 'অড জব ম্যান'। ক'দিন হল ওর হাতে কোনও কাজ নেই, তাই সবকিছুতেই টান পড়েছে।

কিছুদিন আগে ওর টানাটানি অবস্থাটা টের পেয়ে রোশন নিজে থেকেই ওকে একশো টাকা দিয়েছিল। নিতু মিনমিন করে বলেও ছিল, 'কোনও কাজ-টাজ পেলেই টাকাটা আমি শিয়োর শোধ করে দেব...।' কিন্তু সেটা আর শোধ করে উঠতে পারেনি। আর রোশনও কখনও টাকাটা ফেরত চায়নি।

নিতু জোর করে জড়তা কাটিয়ে হেসে জিগ্যেস করল, 'কী রোশন, তোমার পেটের কী অবস্থা?'

রোশন বুঝতে পারল নিতুদা ওর পেটের চোটের কথা জানতে চাইছে।

ও এক্সারসাইজ থামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল, 'সেরে গেছে, তবে এখনও একটু ব্যথা আছে। ইনফেকশন হয়ে গেলে প্রবলেম হত—সেটা হয়নি বলে বাঁচোয়া।'

একটু পরে ও নিতুকে জিগ্যেস করল, 'নিতুদা, তোমার পেটের কী অবস্থা?'

নিতু প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর বুঝল, রোশনের কাছে ও ধরা পড়ে গেছে। একটু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'হ্যাঁ, ভীষণ টানাটানি...।'

রোশন বলল, 'হুঁ—বুঝেছি।'

দু-হাতে কয়েকবার তালি বাজিয়ে হাতে হাত ঘষে তালুতে লেগে থাকা বালি ঝেড়ে ফেলল রোশন। বালির স্তূপের একপাশে ওর একটা জিনসের প্যান্ট পড়ে ছিল। ও নিতুয়াকে ইশারা করে প্যান্টটা দিতে বলল। নিতু প্যান্টটা দিতেই ও প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে দুটো একশো টাকার নোট বের করে নিয়ে এল। তারপর নিতুর দিকে এগিয়ে দিল : 'এই নাও, নিতুদা। এই দিয়ে এখনকার মতো চেপেচুপে চালাও...।'

নিতু সংকোচের মলিন হাসি হাসল। টাকাটা নিয়ে পকেটে ঢোকাল।

'ঠিকমতো দু-চারটে কাজ-টাজ পেলেই তোমার এই টাকাটা শোধ দিয়ে দেব...।'

রোশন বলল, 'সে যখন হয় দিয়ো। তুমি বরং মন লাগিয়ে কাজ খোঁজার চেষ্টা করো। আর দেখো তো, আমার জন্যে কোনও প্রাইভেট কার চালানোর চাকরি জোটাতে পারো কি না।'

কথা বলতে-বলতে রোশন জিনসের প্যান্টটা শর্টসের ওপর দিয়ে পরে নিল। তারপর ববিনদের দিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়ল : 'অ্যাই, তোরা সব বলটা নিয়ে এদিকে আয়। জলদি আয়! আয় শিগগির!'

ববিনরা খেলা থামাল। ওদের একজন ফুটবলটা হাতে তুলে নিল। তারপর ওরা পাঁচজন ছুটে চলে এল রোশনের কাছে।

রোশন ওদের দেখছিল। পাঁচটা বাচ্চার মধ্যে অনেক মিল। ওদের প্রত্যেকের বয়েস দশ থেকে বারোর মধ্যে—কিংবা তার সামান্য এপাশ-ওপাশ। ওদের গায়ের রং মলিন। চোখগুলো বড়-বড়—সে-চোখে অনেক স্বপ্ন। ওরা হাসলেই সাদা দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। ওদের গায়ে ময়লা স্যান্ডো গেঞ্জি অথবা ফতুয়া, কিংবা রাউন্ড নেক টি-শার্ট। আর কোমরে বাঁধা একটু-আধটু ছেঁড়া ময়লা হাফপ্যান্ট।

বারো নম্বর বস্তি থেকে শ'তিনেক মিটার দূরে রয়েছে আশাপুর চিলড্রেন'স পার্ক। সেখানে এলাকারই দুজন পড়ুয়া ছেলে দুপুরবেলা বাচ্চাদের পড়ায়। গোটাদশেক বাচ্চা নিয়ে দুপুর-স্কুল। এই পাঁচটা বাচ্চাই সেই স্কুলে পড়ে। সেখানে খোলা আকাশের নীচে স্কুল চলে। তাই বর্ষাকালে স্কুল বন্ধ থাকে। আর স্কুল চলার সময় যদি আচমকা অকালবৃষ্টি শুরু হয় তা হলেও স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।

রোশনের তেতো হাসি পেল। বাচ্চাগুলো এতই গরিব যে, ওদের ভাগ্যে বিনাপয়সায় যেটুকু পড়াশোনা জোটে সেটুকুই অনেক।

ববিন ছাড়া বাকি চারটে বাচ্চার নাম রোশনের মনে আছে : রেমো, পটকা, পিনু, আর মুনিয়া। কিন্তু কে কোনটা সেটা এখনও ও নির্ভুলভাবে রপ্ত করতে পারেনি।

ছেলেবেলায় ফুটবল রোশনের পছন্দের খেলা ছিল। তাই ক'দিন ধরে ও এই পাঁচটা বাচ্চাকে নিয়ে ফুটবল প্র্যাকটিস শুরু করিয়েছে। বাচ্চাগুলোরও ফুটবল খেলায় যথেষ্ট ইন্টারেস্ট আছে। আর, একটা বাচ্চার পায়ের কাজ তো বেশ নজরে পড়ার মতো। কী যেন নাম ওর? পিনু, না রেমো?

পাখির ডাক শুনতে পেল রোশন। 'চোখ গেল' পাখি ডাকছে। পাখিটা মনে হয় মাঠের প্রান্তের কোনও একটা গাছে পাতার আড়ালে বসে আছে। পাখিটার ডাকের মধ্যে একলা থাকার একটা আর্তি ছিল। ডাকটা কেমন যেন লক্ষ্যহীন শূন্যতায় ভরা।

রোশন ওর বুকের ভেতরে 'একলা পাখি'-র নিঃসঙ্গতার ছোঁয়া টের পেল। পাখিটাকে ওর বন্ধু বলে মনে হল।

রোশনের মনটা কোথায় যেন চলে যাচ্ছিল। ও মনটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পাঁচটা বাচ্চার দিকে ফেরাল। ওদের আর-এক দফা প্র্যাকটিস শুরু করাল। প্র্যাকটিসের মধ্যে রয়েছে বল পায়ে নিয়ে দৌড়োনো—সোজা ছুটে গিয়ে আবার ফিরে আসা, খানিকটা দূরে-দূরে সাজানো আধলা ইটের ফাঁক দিয়ে বল পায়ে সাপের

মতো এঁকেবেঁকে দৌড়োনো, বলে শট মারা, হেড প্র্যাকটিস। এসব ছাড়া রয়েছে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ আর দৌড় প্র্যাকটিস।

রোশনের প্র্যাকটিস চলছিল। নিতু ওর সাইকেলের পাশটিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল। ওর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল। ফুটবল খেলতে নিতুও ভালোবাসত। স্কুলেও পড়াশোনা করতে যেত। তারপর কী করে যেন ঘুঁটিগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। সাদামাঠা লাইফটা রঙিন হওয়ার বদলে কালো হয়ে গেল। নিতুয়া সেটার রং আর পালটাতে পারল না।

ছেলেগুলো বল শট মেরে প্র্যাকটিস করছিল। প্র্যাকটিস করার সময় বলটা কখনও-কখনও ছিটকে চলে যাচ্ছিল পিচরাস্তায় অথবা রাস্তার ওপারে—ব্যাংকের কাছে, হার্ডওয়্যারের দোকানের কাছে, নয়তো মোবাইলের দোকানের সামনে। সেই বল কুড়িয়ে নিয়ে আসছিল হয় নিতুয়া নয়তো রোশন। কারণ, রাস্তাটায় যানবাহনের ব্যস্ততা রয়েছে—যত বেলা বাড়ছে সেই ব্যস্ততা ততই বাড়ছে। পিনু, মুনিয়া, ববিনরা বলটা নিয়ে আসার জন্য ছুট্টে রাস্তার ওপারে যেতে চাইছে, কিন্তু রোশন ওদের ধমকে বারণ করেছে। হুট করে যদি কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়!

পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে কিছুদিন মেশার পর রোশন বুঝতে পেরেছে, বয়েসের তুলনায় ছেলেগুলো অনেক বেশি ওস্তাদ আর চটপটে। অন্তত নিজের বারোবছর বয়েসের অবস্থাটা মনে করে রোশনের সেরকমই মনে হল। তবে ছেলেগুলো যদি লেখাপড়ার ব্যাপারটাকে রেগুলার চালু রাখতে পারত তা হলে আরও ভালো হত।

ব্যাংকের দেওয়ালের গা থেকে ফুটবলটা কুড়িয়ে নিয়ে রোশন ফিরে আসছিল। তখনই জেনারেটরের শব্দ কানে এল। দূরে কোথাও জেনারেটর চলছে। তার মানে সকালবেলাতেই লোডশেডিং। এই দেড়মাস ধরে রোশন দেখছে, আশাপুরে লোডশেডিং এখনও বেশ টিকে আছে। তাই ছোটখাটো সব দোকানেই—মানে, পানের দোকান হোক কি চায়ের দোকান হোক, কিংবা মুদিখানা দোকান হোক—মোমবাতি আর হাতপাখা বিক্রি করার চল রয়েছে।

রোশন ফুটবল হাতে রাস্তা পার হচ্ছিল। গাড়ি যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধুলো উড়ছে। সাইকেল-রিকশার প্যাঁকপ্যাঁক শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে বাইকের গর্জন।

বাইক দেখে পলানের কথা মনে পড়ল রোশনের।

সেই শুরুর দিন থেকেই পলানের সঙ্গে ওর গতিপথ বিপরীতমুখী। সংঘর্ষ গতিপথে ওরা যেন একে অপরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্ত রোশনের তো কোনও উপায় নেই। যেমন, শনিবারের গোডাউন ফাইট পলানের কাছে জরুরি—কিছু কাঁচা পয়সা রোজগার করার জন্য। আবার রোশনের কাছে গোডাউনের ব্লাইন্ড ফাইট বন্ধ করার চেষ্টা করাটা জরুরি—আশাপুরের মানুষের ভালোর জন্য। তারপর রয়েছে পলানের তোলাবাজি। এটার হাত থেকে ছোট, বড়, মাঝারি—কোনও ব্যবসায়ীরই নিস্তার নেই। এ ছাড়া দুর্গাপুজো, কালীপুজো, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি বিশেষ উৎসবকে ছুতো করে পলানের জোরজুলুম করে চাঁদা আদায়। সে-টাকার কতটা উৎসবে যায়, আর কতটা পলানের পকেটে সে-হিসেবটা কেউ জানে না। তারপর জগন্ময়ী কালীমন্দিরের 'প্রণামী' আর 'মহাপ্রণামী'-র দ্বন্দ্ব। সেদিন রাতে রতনমণি মাঝি পলানের অনেক কথাই রোশনকে বলেছেন।

পেটের কাছ সামান্য জ্বালা করে উঠল।

সুবুর ছুরি এখনও জানান দিচ্ছে। সুধীরডাক্তারবাবু অবশ্য বলেছেন, সেরকম কোনও চোট লাগেনি। ছুরির ডগায় স্কিনটা পারফোরেটেড হয়েছে শুধু। তা সত্ত্বেও ডাক্তারবাবু সেদিন চারটে স্টিচ করে দিয়েছিলেন। সে-সেলাই পাঁচদিন পর কাটাও হয়ে গেছে। তারপরেও ডাক্তারবাবুর কথা মতো কাটা জায়গাটায় দিনে দুবার করে মলম লাগায় রোশন। জায়গাটা এখন মাঝে-মাঝে ব্যথা করে, বা একটু জ্বালাও করে—তার বেশি কিছু নয়।

কালীমন্দিরের ঘটনার দু-দিন পর এক দুপুরে পলান সুবুকে সঙ্গে করে 'আশাপুর লজ'-এ এসেছিল। পলানের মুখ গম্ভীর। সুবুর মুখ কাচুমাচু। তারপর বিশ্বরূপদার টেবিল ঘিরে বসেছিল ওরা চারজন : একদিকে পলান আর সুবু, আর অন্যদিকে রোশন আর বিশ্বরূপ জোয়ারদার।

পলান খুব ধীরে-ধীরে শান্তভাবে কথা বলছিল। রোশন অবাক হয়ে পলানকে দেখছিল। এই পলানকে ও চিনতেই পারছিল না।

পলানের গায়ে খাদির পাঞ্জাবি, আর পায়ে পাজামা। ও মাথা নীচু করে কথা শুরু করেছিল।

'রোশন, আমি সুবুকে নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি কেন জানো? আমার মনে হয়েছে, সুবু সেদিন মন্দিরে যা করেছে সেটা একদম ঠিক করেনি। ও তোমার কাছে এখন ক্ষমা চাইতে এসেছে। আর আমিও সেদিন ওকে দু-চার ঝাপ্পড় কষিয়েছি। তা ছাড়া তোমাকেও ''থ্যাংক ইউ'' বলতে হয়, কারণ, তুমি সুবুর নামে কোনও এফ. আই. আর. করোনি।' বিশ্বরূপ জোয়ারদারের দিকে হাতের ইশারা করল পলান : 'আর বিশ্বদা তো আমাকে চেনেন—আমি অন্যায় বরদাস্ত করি না। অন্যায় করেছ কি ক্ষমা চাইতে হবে...এই হল আমার বিচার...।'

কথা বলতে-বলতেই আচমকা সুবুকে দু-থাপ্পড় কষিয়ে দিল পলান : 'চুপ করে আছিস কী? নে, ক্ষমা চা!'

সুবু পলানের থাপ্পড় খেয়ে তেমন অবাক হল না। ও বরং চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর একেবারে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়ার ঢঙে ঝাঁপিয়ে পড়ল রোশনের পায়ে।

'আমাকে মাপ করে দাও, ভাইটি। ভুল হয়ে গেছে। আর কখনও হবে না। প্লিজ, মাপ করে দাও...।'

সুবু যখন রোশনের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইছিল, পলান তখন ওর মোবাইল ফোন বের করে সেই ক্ষমা চাওয়ার ভিডিয়ো তুলছিল।

বিশ্বরূপ জোয়ারদার কেমন যেন জড়দগবের দৃষ্টিতে গোটা দৃশ্যটা দেখছিলেন; কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

রোশন অপ্রস্তুতভাবে সুবুকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছিল : 'কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? ছাড়ুন, ছাড়ুন! যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। সব ভুলে যান...।'

একটু পরে, ক্ষমা চাওয়ার এপিসোড শেষ করে, সুবুকে নিয়ে চলে গেল পলান। বিশ্বরূপ জোয়ারদার তখনও ওদের চলে যাওয়ার পথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে। ব্যাপারটা যে ঠিক কী হল সেটা তখনও তিনি ঠাহর করে উঠতে পারছিলেন না। এই নতুন পলানকে তিনি আগে কখনও দেখেননি। তাই বিশ্বরূপের চোখ সরু হল, কপালে ভাঁজ পড়ল।

পরদিন সকাল সাড়ে ন'টা-দশটা নাগাদ কনস্টেবল পান্ডেজি একটা সাইকেল নিয়ে 'আশাপুর লজ'-এ এসেছিল। তারপর সদর দরজার বাইরে থেকেই 'এ রওশনবাবু! রওশনবাবু—!' বলে হেঁড়ে গলায় হাঁক পেড়েছিল।

বিশ্বরূপ জোয়ারদার দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখেন একটা ছোট সাইকেলের ওপরে পান্ডেজি তার নাদুসনুদুস বডিটা ব্যালান্স করে বসে আছে। একটা পা প্যাডেলে, আর-একটা পা মাটিতে। পান্ডেজির গোলগাল মুখ ঘামছে। গালদুটো কমলালেবুর মতো ফোলা। তার মধ্যিখানে মানুষটার বিখ্যাত মোচ। সবমিলিয়ে যেন কোনও মজার কমিকসের চরিত্র।

বিশ্বরূপকে দেখে কনস্টেবলজি জানাল, 'রওশনবাবুকো সাব-ইনিসপেক্টারসাবনে বুলায়া...আজহি...। জরুরি পুছতাছ করনা হ্যায়। সাথ মে ভোটার কার্ড লে জানেকো বোলিয়েগা।'

রোশন তখন লজে ছিল না। বারো নম্বর বস্তিতে গিয়েছিল—নিতুয়ার কাছে। গাড়ি চালানোর কাজের কোনও খবরটবর এসেছে কি না জানতে।

ও ফেরামাত্রই বিশ্বরূপ ওকে খবরটা দিয়েছিলেন : 'সাব-ইনস্পেকটর সুরেন দাস ওকে ফাঁড়িতে ডেকে পাঠিয়েছেন।

রোশন ভাবল একটা সাইকেল-রিকশা নিয়ে থানায় চলে যাবে। কারণ, সাইকেল প্যাডেল করতে গেলে পেটে বেশ টান লাগছে, ব্যথা করছে। একইসঙ্গে এটাও ভাবল, ও যে থানায় যাচ্ছে সেটা অনেককে জানিয়ে যাবে। ও বিশ্বরূপদাকে বলল, ও যে থানায় সাব-ইনস্পেকটর সুরেন দাসের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সেই খবরটা যেন জনে-জনে জানিয়ে দেওয়া হয়।

বিশ্বরূপ নিজের হাতের মোবাইল ফোনটা দেখিয়ে বললেন, 'আমি ছোটকু আর নিতুয়াকে খবর করে দিচ্ছি। তা হলেই বারো নম্বর বস্তি আর নানানদিকে খবর ছড়িয়ে যাবে। এ ছাড়া রতনমণিদাকে ফোন করে দিচ্ছি। সুধীরডাক্তারবাবুকেও জানিয়ে দিচ্ছি—।'

রোশন বলল, 'দাদা, ''মোহন সুইটস''-এ খবরটা দেবেন। আর ''বাবুন সাইকেল মার্ট''-এর বাবুনদাকেও জানাবেন। সকলের খবরটা জানা দরকার। কারণ, সুরেন দাস যদি অন্যায়ভাবে আমাকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করেন তা হলে সবাই মিলে একজোট হয়ে সেই অন্যায়ের এগেইনস্ট-এ প্রোটেস্ট করতে পারবে...।'

বিশ্বরূপ চেয়ারে বসেছিলেন। চেয়ার ছেড়ে চট করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন : 'তুমি চিন্তা কোরো না। আমি এখুনি সাইকেল নিয়ে বেরোচ্ছি। চারদিকে খবর করে দিচ্ছি। থানার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পলানের জুলুমবাজি বড্ড বেড়েছে।' হঠাৎ খেয়াল হওয়াতে তিনি রোশনকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার ভোটার কার্ডটা সঙ্গে নিয়ে নিয়েছ তো?'

রোশন ওর প্যান্টের ডানপকেট আলতো করে চাপড়াল। ভোটার কার্ডটা অনুভবে টের পেল। মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ, নিয়েছে। তারপর রাস্তায় নেমে একটা সাইকেল-রিকশা ডেকে তাতে উঠে বসল। রিকশা চলল থানার দিকে।

থানার চত্বরের কাছে এসে রোশন রিকশা থেকে নেমে পড়ল। মাথার ওপরে বেলা সাড়ে এগারোটার রোদ। হাওয়া ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে।

থানার চেহারা দেখে থানা বলে বোঝা দায়। কারণ, একে তো একতলা পুরোনো বাড়ি, তার ওপরে থানার চত্বরে বাঁশের মাথায় দড়ি টাঙিয়ে প্রচুর ভিজে জামাকাপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছে। ডানদিকের বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষে কলতলা। সেখানে টিউবওয়েল রয়েছে, আর তার পাশেই একটা ছোট চৌবাচ্চা—চৌবাচ্চার পাড়ে দুটো প্লাস্টিকের মগ—একটা লাল, একটা নীল।

কলতলায় একজন রোগামতন লোক খালি গায়ে আন্ডারপ্যান্ট পরে স্নান করছে। তার গায়ে পইতে। চোখ বুজে একটা চটুল হিন্দি গান প্রবল বেসুরো গাইছে, আর নিজের নি-কেশ মাথায় একটা ছোট বালতি করে জল ঢালছে।

থানার বাউন্ডারি ওয়ালে কোনও সদর গেট নেই। তার জায়গায় খানিকটা খোলা অংশ হাঁ করে রয়েছে। সেটাই থানায় ঢোকার পথ। ঢোকার পথের মুখে একপাশে একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। দোকানের সামনে নানা রঙের পানমশলার পাউচ চিকের মতো ঝুলছে।

থানার সাইনবোর্ডটা মাপে বড়, চকচকে এবং নতুন। বোধহয় বেশিদিন হল লাগানো হয়নি। টিনের ফ্রেমে বাঁধানো গাঢ় নীল রঙের গ্লো-সাইন : 'আশাপুর পুলিশ ফাঁড়ি'।

রোশন সটান পা ফেলে ঢুকে গেল থানার ভেতরে। দেখল, খোলা চত্বরের বাঁ-দিকে দাঁড়িয়ে আছে একটা জিপ আর দুটো সাইকেল। আর ডানদিকে একটা বাইক।

খানিকটা উঠোন পেরিয়ে উঁচু চাতাল। চাতালে ওঠার জন্য তিন ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ি উঠলেই বড় দরজা। দরজায় চকোলেট রঙের পাতলা কাপড়ের পরদা ঝুলছে।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে রোশন সাব-ইনস্পেকটর সুরেন দাসকে দেখতে পেল। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছেন। তাঁর সামনে বড় একটা টেবিলে পুরোনো আমলের কালো রঙের একটা টেলিফোন।

কয়েকটা ফাইলপত্র। দুটো ডটপেন। আর তিনটে খালি চায়ের কাপ।

সুরেন দাসের উলটোদিকে তিনটে চেয়ার। তার মধ্যে দুটো চেয়ারে দুজন লোক বসে রয়েছে। দুজনকেই চিনতে পারল রোশন।

একজন কাটা নগেন। আর-একজন পলান। পলান সিগারেট টানছে।

রোশনকে দেখামাত্রই সুরেন দাস একগাল হেসে রীতিমতো অভ্যর্থনা জানালেন।

'আরে, রোশনবাবু! এসে গেছেন? বসুন, বসুন...।' ইশারা করে খালি চেয়ারটা দেখালেন সুরেন।

ওঁর হাসি আর কথার টোনে কোথায় যেন একটা ব্যঙ্গের ছোঁয়া রয়েছে বলে রোশনের মনে হল।

রোশন কোনও কথা না বলে খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল। তারপর ঘরটাকে চোখ বুলিয়ে দেখল।

কোনওরকমে খাড়া করে তোলা পাকা ঘর। মাপে দশ বাই বারো কি তেরো ফুট হতে পারে। নাকি মা বলেছে, 'আও কম'?

ঘরের সিলিং-এ লাগানো একটা ফ্যান মাঝারি স্পিডে ঘুরছে। দেওয়ালগুলো ময়লাটে—বহুদিন কলি পড়েনি। সিলিং-এর কাছে দেওয়ালের কোণে ঝুল-টুল জমে আছে। দুটো বড়সড় ঘুলঘুলি—তার ভেতরে বোধহয় চড়ুইপাখির বাসা, কারণ, চড়ুইয়ের কিচকিচ ডাক শোনা যাচ্ছে। তা ছাড়া বাসা থেকে সরু-সরু ঘাস-পাতা উপচে এসে বাইরে ঝুলছে। ফ্যানের হাওয়ায় সেগুলো দুলছে।

ঘরের বাঁ-দিকে দুটো বড়-বড় জানলা। জানলা দিয়ে ঘরে রোদ এসে পড়েছে। বাইরে দেখা যাচ্ছে দু-একটা গাছ, আর একটা পুকুর।

ঘরের পিছনের দেওয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি দাঁড় করানো রয়েছে দুটো স্টিলের আলমারি। তারই একটার পাল্লা খুলে উর্দি পরা রোগা-ভোগা একজন কনস্টেবল আলমারির ভেতরে কী যেন খুঁজছে। কনস্টেবল মানুষটির বডির পাশ দিয়ে যেটুকু রোশন দেখতে পাচ্ছিল তাতে অনেকগুলো ফাইল ওর চোখে পড়ছিল।

ডবল সিগারেটের ধোঁয়ার চাপে রোশনের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। একসময় যখন ও ট্যাক্সি চালাত তখন ও বিড়ির নেশা ধরেছিল। তারপর একটা ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার কেসে ওকে জেলে যেতে হয়। সেখানে থাকার সময়েও ও লুকিয়েচুরিয়ে বিড়ি জোগাড় করে নেশাটাকে বজায় রেখেছিল। তারপর, জেল থেকে বেরোনোর পর, আচমকাই একদিন 'ধুত্তেরি!' বলে জ্বলন্ত বিড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। ঠিক করেছিল, আর কখনও ও বিড়ি-সিগারেট ছোঁবে না।

সেই থেকে রোশন সিগারেট কিংবা বিড়ির কাছে আর কাবু হয়নি।

সেইজন্যই সুরেন দাস আর পলানের সিগারেটের ধোঁয়ায় ওর শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছিল। ও নাকের ওপরে হাত চাপা দিল।

পলান আড়চোখে রোশনকে একবার দেখল শুধু—কিছু বলল না।

কাটা নগেন ঠোঁট বেকিয়ে হাসল। পলানের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'পলানদা, সিগারেট স্মোকে মাস্টারজির প্রবলেম হচ্ছে...।'

পলান কোনও কথা বলল না। মনোযোগ দিয়ে সিগারেটটা শেষ করতে লাগল।

রোশন নগেনের কথাকে পাত্তা না দিয়ে নাকে হাত চাপা দিয়েই রইল। সেই অবস্থাতেই সুরেন দাসের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'স্যার, আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন?'

সুরেন দাস চোখ সরু করে রোশনকে দেখলেন। ওঁর ডানহাতে সিগারেট। বাঁ-হাতে গলায় ঝোলানো ছোট্ট রুপোর লকেটটা নাড়াচাড়া করছিলেন।

কিছুক্ষণ রোশনকে পর্যবেক্ষণ করার পর মেঝের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে থুথু করে কণাজাতীয় কিছু একটা মুখ থেকে ছিটকে দিলেন। তারপর যথেষ্ট সিরিয়াস ঢঙে জিগ্যেস করলেন, 'অ্যাই, তোর পুরো নামটা কী রে?'

'পুরো নাম জেনে তুই কী করবি?'

রোশনের জবাবে সুরেন দাসের সিগারেটে টান দেওয়া মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। রুপোর লকেট নাড়াচাড়া করা আঙুল স্থির। মানুষটা স্ট্যাচু হয়ে গেল পলকে।

'কী বললি!' সাব-ইনস্পেকটর সুরেন দাস সাপের ছোবলের ক্ষিপ্রতায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওঁর কালো মুখে বেগুনি আভা ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশি চোখ কটমট করে তাকিয়ে আছে রোশনের দিকে ।

রোশন চেয়ারে বসেই রইল। সুরেন দাসের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে ও পালটা প্রশ্ন করল, 'কেন, শুনতে পাসনি?'

সুরেন কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, কিন্তু বলতে পারছিলেন না—ওঁর গলা কাঁপছিল। সিগারেট ধরা ডানহাত কাঁপছিল । রোশনের আস্পর্ধা ওঁকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পলান ওর সিগারেটটা একটা খালি চায়ের কাপে ফেলে দিল । চট করে উঠে দাঁড়িয়ে সুরেন দাসের বাঁ-হাত চেপে ধরল : 'অ্যাই সুরেনদা, মাথা গরম করছেন কেন? বসুন...বসুন...। আরে রোশন ইয়ং ছেলে...ভুল করে ফেলেছে...।'

কটমটে নজরটা রোশনের দিকে স্থির রেখে সুরেন ধীরে-ধীরে চেয়ারে আবার বসলেন।

রোশন পলানকে লক্ষ করে আবার বলল, 'আমি কোনও ভুল করিনি, পলানদা। আমাকে আননোন কেউ তুই-তোকারি করলে আমার মুখ দিয়েও তুই-তোকারি বেরিয়ে যায়...।'

পলান চেয়ারে আবার বসে পড়েছিল। রোশনের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ও বলল, 'রোশন , আমিও তো তোমাকে ''তুই-তুই'' করে কথা বলি। তুমি কিছু মাইন্ড করো না তো?' পলানের স্বরটা একটু যেন বেশি মোলায়েম শোনাল।

রোশন হেসে জবাব দিল, 'না, পলানদা, আপনি আমাকে যেমন বলেন সেরকম ''তুই-তুই'' করেই বলবেন। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় তো দেড়-দু-মাস হতে চলল! আর এই পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক...' সুরেন দাসের দিকে হাতের ইশারা করল রোশন : 'ইনি তো আননোন লোক—আমার কাছে। ওঁর সঙ্গে আমার কখনও পরিচয়ই হয়নি...।'

সুরেন দাস ধাক্কাটা এতক্ষণে সামলে নিয়েছেন। হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়েছেন চায়ের কাপে। একটু সময় নিয়ে নিজের মর্যাদা আর গাম্ভীর্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। গায়ের ইউনিফর্মটাকে অকারণেই এখানে-সেখানে হাত বুলিয়ে ঠিকঠাক করলেন।

পলান রোশনকে বলল, 'ঠিক আছে, আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। রোশন, ইনি সাব-ইনস্পেকটর সুরেন দাস—আমাদের সবার কাছে সুরেনদা। এ-থানায় বড়বাবু সমীর মাইতিসাহেব থাকলেও আশাপুরের সবকিছু সুরেনদাই কন্ট্রোল করেন । আর, সুরেনদা, এ হল রোশন। আশাপুরে নতুন এসেছে। বিশ্বনাথদার লজে উঠেছে...।'

'পুরো নাম কী?' রোশনের চোখে তাকিয়ে সুরেন জিগ্যেস করলেন।

'রোশন বিশ্বাস—।'

'ভোটার কার্ড দেখি...।'

রোশন পকেট থেকে ভোটার কার্ডটা বের করল। তারপর সেটা সাব-ইনস্পেকটরসাহেবের হাতে দিল।

সুরেন দাস কার্ডটা হাতে নিয়ে এমনভাবে উলটেপালটে দেখতে লাগলেন যেন কোনও ম্যাপ খুঁটিয়ে দেখে তা থেকে গুপ্তধনের লোকেশন খুঁজে বের করতে চাইছেন।

ভোটার কার্ডটা খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে সুরেন দাস আচমকা হাঁক পাড়লেন, 'মাদল! মাদল! ফাইলটা খুঁজে পেলি?'

সুরেন দাসের বিকট হাঁকডাকে রোশনরা চমকে উঠল।

একইসঙ্গে স্টিলের আলমারির ভিতরে ফাইল খুঁজতে থাকা মাদল নামের রোগা কনস্টেবলটিও চমকে উঠল। বলল, 'ইয়েস, স্যার। পে-পে-পেয়েছি।'

'জলদি এইদিকে নিয়ে আয়—।'

আলমারি থেকে একটা হলদে রঙের ফাইল বের করে নিল মাদল। তারপর ধনুকের মতো বাঁকা পা ফেলে সুরেন দাসের টেবিলের কাছে এগিয়ে এল।

'এ-এ-এই যে, স্যার। আ-আ-হাপনার ফাইল...।'

সুরেন ফাইলটা মাদলের হাত থেকে ছোঁ মেরে নিলেন। তারপর ভুরু কুঁচকে ফাইলের পাতা ওলটাতে লাগলেন। আপনমনে বিড়বিড় করে বললেন, 'এই দু-মাসেই ফাইল বেশ মোটা হয়ে গেছে...।'

রোশনের দিকে চোখ তুলে তাকালেন : 'আপনার ফাইল। শুধু ফার্স্ট নেম দিয়েই ফাইল খুলে ফেলেছি আমি—।'

'আপনার' শব্দটার ওপরে অনেকটা বাড়তি জোর দিলেন সুরেন। বিরক্ত চোখে সিলিং ফ্যানটার দিকে একবার তাকালেন। বিড়বিড় করে একবার মন্তব্য করলেন, 'সালা পাখা না ঠেলাগাড়ি কে জানে!'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম...' একটু কেশে নিয়ে সুরেন দাস আবার শুরু করলেন। কথা বলার টোনে ব্যঙ্গের মোলায়েম প্রলেপ লাগিয়ে রোশনের দিকে তাকালেন : 'তা রোশনবাবু, আপনার অ্যাক্টিভিটির ফাইল মোটা হলেও কেউ এখনও আপনার নামে অভিযোগ-টভিযোগ করেনি। তাই আপনাকে, স্যার, অ্যারেস্ট করে খাঁচায় এখনও পুরিনি। পলানদা আপনার নামে অভিযোগ করতেই পারতেন, কিন্তু করেননি। পলানদা ভালোমানুষ টাইপের লোক। খুব বড় মাপের দিল। সবার উপকার করেন। তাই এখনও আপনি বাইরে আছেন, স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করছেন। হেসে-খেলে বেড়াচ্ছেন। আমি কিন্তু, স্যার, আপনার মুভমেন্টের খোঁজখবর রাখছি—।'

সুরেন ফাইলটা বন্ধ করে টেবিলের একপাশে রাখলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

পলান চুপচাপ বসে সুরেন দাসের কথাবার্তা শুনছিল। ভেতরে-ভেতরে অধৈর্য হয়ে উঠলেও ওর মুখ দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। ও মনে-মনে ভাবছিল, 'সুরেনদা কেন এখনও কাজের কথায় আসছেন না?'

'স্যার, আমাকে এখন কী করতে হবে?' 'স্যার' শব্দটার ওপরে জোর দিয়ে রোশন জিগ্যেস করল। কথার টোনে ও সুরেন দাসের ব্যঙ্গ কিছুটা হলেও ফেরত দিতে পারল।

কাটা নগেন উসখুস করছিল। ভুরু কুঁচকে বারবার পলানের দিকে তাকাচ্ছিল—যার অর্থ : 'পলানদা, তুমি কিছু একটা তো বলো!'

পলান চোখ বুজে আবার খুলল। এই ইশারা করে নগেনকে বোঝাতে চাইল, 'এখন চেপে যা...।'

সুরেন দাস কিছুক্ষণ ঠোঁট টিপে রইলেন। তারপর রোশনের ভোটার কার্ডটা আবার হাতে নিয়ে গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। মনে হচ্ছিল যেন কোনও জীবাশ্মবিজ্ঞানী নতুন কোনও প্রজাতির প্রাণীর জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছেন।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে চলল মহা-ইনস্পেকশন। তারপর : 'আপনার বাড়ির ঠিকানা তো দেখছি কলকাতায়—পার্ক সার্কাসে। তা কলকাতা ছেড়ে হঠাৎ এই আশাপুরে কেন?'

রোশন স্থির চোখে তাকিয়ে রইল দাসসাহেবের দিকে। ধীরে-ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'আশাপুরের দুটো জিনিস বিখ্যাত—জগন্ময়ী কালীমন্দির, আর প্রতি শনিবার রাতে কলাবতী নদীর ধারে গোডাউনের ব্লাইন্ড ফাইট, সেগুলো দেখতে এসেছি—।'

সুরেন দাসের কপালে ভাঁজ পড়ল। পলানের দিকে একবার তাকালেন। তারপর ঠোঁট উলটে ব্যাজার মুখে বললেন, 'কালীমন্দিরটা তো না হয় বুঝলাম, কিন্তু ব্লাইন্ড ফাইট ব্যাপারটা কী?'

সঙ্গে-সঙ্গে রোশনের মুখ দিয়ে 'ন্যাকাচৈতন্য' শব্দটা বেরোতে চাইছিল, কিন্তু রোশন খুব জোর সেটাকে সামলে নিল। তারপর বলল, 'দাসবাবু, আপনি ব্লাইন্ড, তাই ওই ফাইটের খবর জানেন না। কিন্তু আশাপুরের আর সবাই জানে—' রোশন পলানের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল : 'কী পলানদা, ঠিক বলছি তো?'

পলান একটু মুচকি হাসল। তারপর একটা হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলল, 'রোশন, ওসব কথা থাক। সুরেনদার আর জরুরি কী-কী বলার আছে শুনে নে...।'

রোশন সুরেন দাসের জরুরি কথা শোনার জন্য ওঁর দিকে তাকাল। রোশনের থুতনিটা সামান্য উঁচু হয়ে থাকায় ওকে একটু উদ্ধত মনে হল।

সুরেন একটা ডটপেন তুলে নিয়ে সেটা টেবিলে ঠুকছিলেন। ওই 'ঠক-ঠক' আওয়াজ করতে-করতেই বললেন, 'গোডাউনের ওই ব্লাইন্ড ফাইট নিয়ে আশাপুরের কেউ এখনও থানায় রিপোর্ট করেনি, এফ. আই. আর. করেনি। তার মানে ওটা নিয়ে আশাপুরে কারও কোনও প্রবলেম হচ্ছে না। বরং আমি বলব, এখানকার জনগণের অনেকেই ওটা থেকে কম-বেশি বেনিফিট পাচ্ছে। কাঁচা পয়সার একটু-আধটু হাতবদল হচ্ছে। তা সে খারাপ কী! যদি কখনও ওটার এগেইনস্টে কোনও রিপোর্ট পাই তখন ভেবে দেখব।' পলানের দিকে তাকালেন সুরেন : 'কী বলেন, পলানদা?'

রোশন জিগ্যেস করল, 'আমি কি এবার আসতে পারি?'

সুরেন রোশনের দিকে তাকালেন। ঠোঁটের কোণে হাসলেন : 'আসবেন কী! আসল কথাটাই তো এখনও বলা হয়নি...' কথা বলতে-বলতে পিছন ফিরে তাকালেন সুরেন। দেওয়ালের কাছে মাদল নামের কনস্টেবলটি স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোগা দুটো হাত আঙুলে-আঙুলে প্যাঁচ খাওয়া অবস্থায় সামনে ঝুলছে।

মাথার ইশারায় ওকে কাছে ডাকলেন সুরেন : 'এদিকে আয়...।'

মাদল ওঁর কাছে এসে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়াতেই বললেন, 'এই ভোটার কার্ডটা গজাননের দোকান থেকে চট করে জেরক্স করে নিয়ে আয়...দু-কপি করবি। সাইকেল নিয়ে যা—।'

রোশনের ভোটার কার্ডটা মাদলের হাতে দিলেন সুরেন।

কার্ডটা হাতে নিয়ে মাদল কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'প-প-প-হয়সা?'

'তোর থেকে দিয়ে দিস...আমি পরে তোকে দিয়ে দেব।' সুরেন হাত নেড়ে ওকে ডিসমিস করে জবাব দিলেন।

মাদল তবু দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'আ-আ-হাগের এ-এ-হ্যাগারো টাকা বাকি আ-হাছে...।'

'পরে সব পেয়ে যাবি। এখন জলদি যা...।'

সুরেন দাসের কাণ্ড দেখে পলান আর নগেন মজা পেয়ে হাসছিল। আর রোশনের ভেতরে রাগ হচ্ছিল। এই সাব-ইনস্পেকটরের বাচ্চাটাকে ঠাঁটিয়ে একটা চড় মারতে পারলে ভালো হত।

মাদল চলে যেতেই সুরেন দাস আবার শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, যা জিগ্যেস করছিলাম। আপনি হঠাৎ এই আশাপুরে কেন? আমাদের আশাপুর তো টুরিস্টদের বেড়ানোর স্পট নয়। এখানে না আছে পাহাড়, না আছে সমুদ্র। আর আপনার কথায় বিখ্যাত জিনিসগুলো তো আপনার দু-দিনেই দেখা হয়ে গেছে...তা হলে আর আশাপুরে পড়ে আছেন কেন?' প্রশ্নটা করে সুরেন জিভ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন।

রোশন জানলার দিকে তাকাল। গাছের পাতারা রোদে যেন ডানা মেলে দিয়েছে—বোঁটা থেকে মুক্তি পেলেই খোলা হাওয়ায় উড়ে চলে যাবে। তারপর যে যেখানে যায়।

রোশন সুরেনের দিকে মুখ ফেরাল। ধীরে-ধীরে বলল, 'আমার তিন কুলে কেউ নেই। তাই যেখানে মন চায় সেখানেই ঘুরে বেড়াই। আপনাদের আশাপুরে এসে আমার ভালো লেগে গেছে। তো এখানে আমার থাকতে অসুবিধে কোথায়!'

'আপনি তো এখানকার লোকাল কেউ না—বাইরের লোক। তাই চলে গেলেই ভালো। আপনি এখানে আসার পর থেকেই নানান ঝামেলা হচ্ছে। শান্তি নষ্ট হচ্ছে, সিস্টেমে গোলমাল হচ্ছে, আশাপুরের সুনামে কালি লাগছে। তাই আমি আপনাকে সাতদিন টাইম দিচ্ছি—আশাপুর ছেড়ে চলে যান।'

রোশন হেসে ফেলল, যেন মুচমুচে একটা হাসির কথা শুনে ফেলেছে।

তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, 'আপনি আমাকে সাতদিন টাইম দেওয়ার কে? আমি চোর-ছ্যাঁচোড় বা গুন্ডা বদমাস নই...' শেষ কথাগুলো পলানের দিকে তাকিয়ে বলল, তারপর আবার মুখ ফেরাল সুরেন দাসের দিকে : 'আমি আপনার কাছে স্পষ্ট করে জানতে চাই, আশাপুরে আমি থাকতে পারব না কেন। এখানকার আকাশ, বাতাস, খেলার মাঠ, রাস্তা-ঘাট, নদীর জল এসবের কোনও প্রাইভেট মালিকানা আছে নাকি, যে আমি সেগুলো ব্যবহার করতে পারব না? এই জায়গার নাম তো আশাপুর, ''আশাপুর প্রাইভেট লিমিটেড'' তো নয়! স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক আমি। তো আমি কেন দেশের যে-কোনও জায়গায় গিয়ে ভদ্রভাবে থাকতে পারব না, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না!'

রোশনের গলার স্বর আবেগে কাঁপছিল। ওর ফরসা মুখে এখন লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

সুরেন দাস কিছুক্ষণ থম মেরে রইলেন। সাড়ে বারো বছরের পুলিশি চাকরিতে এরকম ঠ্যাটা এবং গোঁয়ার পাবলিক তিনি দেখেননি। এর দাওয়াইয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটার কার্ডের ইনফরমেশনগুলো নিয়ে কলকাতায় বেশ ভালো করে ছানবিন করতে হবে। দেখতে হবে, এই গোঁয়ার পাগলটার কোনও পুরোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কি না। পার্ক সার্কাস থানা থেকেই খোঁজখবরের কাজটা শুরু করতে হবে।

সুরেন দাস একটু উসখুস করলেন। মাথার ওপরে ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানটার দিকে একবার তাকালেন। দু-হাতের তালু দিয়ে গাল আর কপালের ঘাম মুছলেন। একইসঙ্গে তিনি ভাবছিলেন, রোশনের কথার জবাবে কী বলা যায়।

ঠিকঠাক এবং যুতসই একটা উত্তরের আশায় দাসবাবু পলানের দিকে তাকালেন। দেখলেন, ওঁর চোখের ইশারা অ্যাভয়েড করার জন্য পলান নির্বিকার মুখে ঘরের টেবিল, চেয়ার, আলমারি ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখছে।

সুরেন দাসের রাগ হচ্ছিল। কিন্তু বুঝতে পারলেন, রোশনের কথাগুলো মিথ্যে নয়। আশাপুরের নাম মোটেই 'আশাপুর প্রাইভেট লিমিটেড' নয়। তা হলে কী বলা যায় ছেলেটাকে?

এমন সময় মাদল ঘরে এসে ঢুকল। রোশনের ভোটার কার্ড আর দু-কপি জেরক্স দাসবাবুর সামনের টেবিলের ওপরে রাখল।

'স্যার, এই যে...মোট পনেরো টাকা হল।'

'হুঁ...মনে থাকবে আমার।'

মাদল ব্যাজার মুখ করে ওর বসের কাছ থেকে সরে গেল।

সুরেন দাস লম্বা একটা শ্বাস ফেলে রোশনের চোখে চোখ রেখে চাপা শাসানির টোনে বললেন, 'আমার সহজ কথাটা তা হলে আপনি বুঝতে পারছেন না?'

রোশন মাথা নাড়ল : 'না, বুঝতে পারছি না। কারণ, আপনিও তো আমার সহজ কথাটা বুঝতে চাইছেন না।'

সুরেন দাস ভুরু কোঁচকালেন : 'কী সহজ কথা?'

রোশন টেবিলের ওপরে একটু ঝুঁকে পড়ে ওর মুখটাকে সুরেনের আরও একটু কাছে নিয়ে গেল। শান্ত গলায় বেশ থেমে-থেমে বলল, 'এই আকাশ, বাতাস, জল, মাটি—এগুলো কারও বাপের সম্পত্তি নয়। এগুলো সবার জন্য।' রোশন পলানের দিকে ঘুরে তাকাল : 'পলানদা, আপনি একটু এনাকে বুঝিয়ে বলুন তো। আশাপুরে আমি থাকতে এসেছি, চলে যাওয়ার জন্যে নয়।'

সুরেন দাসের মুখের চেহারায় বিভ্রান্তির ছায়া পড়ল। তারপরই তিনি অসহায় চোখে পলানের দিকে তাকালেন।

'পলানদা, কেসটা এখন কী করা যায় বলুন তো?'

সুরেনের মুখে কাতর শরণার্থীর হাবভাব দেখে রোশনের মনে হল, ওঁর নামটা সুরেন দাস না হয়ে সুরেন ক্রীতদাস হলে অনেক বেশি মানানসই হত।

পলান রোশনের দিকে তাকাল। ও আশাপুরে থাকতে এসেছে—চলে যাওয়ার জন্য নয়। তা ছাড়া ওকে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে ও যে খুব একটা ঘাবড়ে-টাবড়ে গেছে তেমনটাও নয়।

পলান রোশনের কথাগুলো ভাবছিল।

ছেলেটা ভুল কিছু বলেনি। আশাপুরের আকাশ-বাতাস কারও বাপের সম্পত্তি নয়। জল বা মাটির কিছু-কিছু অংশ ব্যক্তিগত মালিকানার দখলে আছে বটে, কিন্তু সবটাই নয়।

আরও কতকগুলো কথা মনে হল পলানের। রোশন এ-কথাগুলো বলেনি, কিন্তু পলানের মনে হল। আগে কখনও ও এভাবে ভাবেনি।

সূর্য যখন আলো দেয়, রোদ্দুর দেয়—তার ওপর কারও ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। সবাই ইচ্ছেমতো সেগুলো ভাগাভাগি করে নিতে পারে। ঠিক তেমনই বাতাসের অক্সিজেনের ওপরে কিংবা আশাপুরের বৃষ্টির ওপরেও সকলের সমান অধিকার।

তাই আশাপুরের নাম কখনওই 'আশাপুর প্রাইভেট লিমিটেড' হয়ে যাবে না।

পলান একটু নতুন চোখে রোশনকে দেখছিল।

পলানের রাজত্বে রোশন থাবা বসিয়েছে বটে, কিন্তু সেটা নিজের জন্য নয়। সাধারণ মানুষের প্রতি অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রোশন প্রতিবাদের জিগির তুলেছে শুধু।

নাঃ, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য পলান এক্ষুনি কিছু ভেবে উঠতে পারছে না। সুরেন দাসকেও দেওয়ার মতো কোনও পরামর্শ খুঁজে পাচ্ছে না।

পলান সুরেন দাসকে ইশারা করে বলল, 'ওকে এখন ছেড়ে দিন—।'

সে-ইশারা পাওয়ামাত্রই দাসবাবু রোশনকে ওর ভোটার কার্ডটা ফেরত দিয়ে বললেন, 'আপনি এখন আসুন। সাবধানে থাকতে চেষ্টা করবেন—কোনও ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় জড়াবেন না।'

ভোটার কার্ডটা নিয়ে রোশন উঠে দাঁড়াল। সুরেনকে বলল, 'আসছি, স্যার।' তারপর পলানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পলানদা, এলাম। পরে দেখা হবে।'

পলান হাত তুলে 'ঠিক আছে।' গোছের একটা ভঙ্গি করল।

সাব-ইনস্পেকটরসাহেবের ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে রোশন অবাক হয়ে গেল। থানার ঢোকার পথের মুখে একটা ছোটখাটো জটলা। সেখানে ওর চেনা অনেকগুলো মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশ্বরূপদা, নিতুদা, ববিন, ছোটকু, রতনমণি মাঝি, 'বাবুন সাইকেল-মার্ট'-এর বাবুনদা, 'মোহন সুইটস'-এর দুজন চেনা মুখ, এ ছাড়া আরও কয়েকজন মানুষ যাদের মুখগুলো রোশনের ঠিকঠাকভাবে মনে পড়ছে না। ওদের কাছাকাছি অনেকগুলো সাইকেল দাঁড় করানো।

রোশনের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর জন্য এতগুলো মানুষ থানায় চলে এসেছে!

রোশনের চোখে জল এসে গেল। দুপুরের রোদে সেই জল চিকচিক করে উঠল।

□

রোশনের গায়ে সকালের রোদ এসে পড়েছিল। বেলা বাড়ছে। সেদিন থানা থেকে বেরিয়ে আসার সময়েও রোশন রোদে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের রোদ আর আজকের রোদ যেন দু-দিনের দুটো মুহূর্তকে স্কেল দিয়ে সরলরেখা টেনে জুড়ে দিল। আর রোশনের মন সেই সরলরেখা-সরণি ধরে সামনে-পিছনে যাতায়াত করতে লাগল।

আশাপুরকে রোশনের ভালো লেগে গেছে। আশাপুরের গন্ধ, আশাপুরের রোদের রং, উষ্ণতা আশাপুরের প্রকৃতির ছবি কী করে যেন ছেলেটার প্রাণের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

রোশন বড় করে শ্বাস টানল। আশাপুরের বাতাস টেনে নিল বুকের ভেতরে। এই বাতাসে প্রাণের ছোঁয়া আছে। কিন্তু তার মধ্যে মিশে আছে বিষ—পলান নস্করের বিষ।

বলটা হাতে নিয়ে রোশন সাবধানে বাকি রাস্তাটা পার হল। তারপর বলটা ছুড়ে দিল বাচ্চাদের দঙ্গলের মাঝে। ওদের শট প্র্যাকটিস শুরু হয়ে গেল আবার।

একটু পরেই বলে একটা জোরালো শট মারল একটা ছেলে। ছেলেটা মাথায় বেশ লম্বা। ওর নাম বোধহয় পটকা।

বলটা দুবার ড্রপ খেয়ে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল আবার সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাছে।

ব্যাংকের সামনে ফুটদেড়েক উঁচু একটা রোয়াক মতন। তার অনেকটা অংশ মোটা গ্রিল দিয়ে খাঁচার মতন ঘেরা। সেই গ্রিলের মধ্যে রয়েছে প্রমাণ মাপের একটা দরজা। এই দরজা দিয়েই কাস্টমাররা ব্যাংকে ঢোকে। ব্যাংক বন্ধ হলে এই দরজাটায় তালা পড়ে যায়।

এখন সিকিওরিটি গার্ডের পোশাক পরা একজন লোক সেই দরজার তালা খুলছে। কারণ, সকাল সাড়ে ন'টা বাজে। 'সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া'-র আশাপুর ব্রাঞ্চ রোজ সাড়ে ন'টাতেই খোলে।

গ্রিলের দরজার বাইরে ব্যাংকের দুজন কাস্টমার দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের হাতে ব্যাংকের পাশবই আর কয়েকটা কাগজপত্র।

রোশন ফুটবলটা নিয়ে আসার জন্য আবার রাস্তার কাছে গেল। ওর সামনে গাড়ি, সাইকেল, সাইকেল-রিকশা আর মোটরবাইকের চঞ্চল স্রোত। ও রাস্তা পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আশাপুর ছোট টাউন হলেও এখানে যানবাহন নেহাত কম নয়।

সিকিওরিটি গার্ডের পোশাক পরা লোকটি ততক্ষণে গ্রিলের দরজা খুলে দিয়ে দুজন কাস্টমারকে ভেতরে ঢোকার ছাড়পত্র দিয়েছে।

একজন কাস্টমার বলল, 'ভাই, এখন ন'টা বত্রিশ বাজে! আজ খুলতে দু-মিনিট লেট হল।'

উত্তরে সিকিওরিটি গার্ড ছেলেটি পান খাওয়া লালচে দাঁত দেখিয়ে হাসল : 'তাড়াতাড়ি ঢুকেই বা কী করতেন, স্যার। এখন লোডশেডিং চলছে। জেনারেটার চালু করতে হবে...।'

'ও ব্বাবা! লোডশেডিং! সাতসকালেই?' একজন বলল।

'তাড়াতাড়ি জেনারেটার চালু করো, ভাই। আমার একটু তাড়া আছে...।'

'চালাচ্ছি। পাঁচটা মিনিট টাইম দিন, স্যার—।' এ-কথা বলে সিকিওরিটি গার্ড চটপট ব্যাংকের ভেতরে ঢুকে গেল—বোধহয় জেনারেটার নিয়ে আসতে।

রোশন রাস্তার এপারে দাঁড়িয়ে ওপারে ব্যাংকের ব্যাপারস্যাপার লক্ষ করছিল। কারণ, ফুটবলটা পড়ে আছে ব্যাংকের গ্রিলের গা ঘেঁষে। বলটা নজরে রাখতে গিয়েই ব্যাংকের ব্যাপারটা ওর চোখে পড়ছিল।

একটু পরেই সিকিওরিটির ছেলেটি জেনারেটার নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। চাকা লাগানো স্ট্যান্ডে বসানো মাঝারি মাপের লাল রঙের জেনারেটার। গ্রিলের গায়ে ঝোলানো রয়েছে একটা সুইচবোর্ড। জেনারেটারের প্লাগ টপটা সেখানে গুঁজে দিয়ে মেশিনটা অন করে দিল ছেলেটি। তারপর একটা শিকল দিয়ে জেনারেটারের স্ট্যান্ডটা গ্রিলের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে শিকলে তালা এঁটে দিল। তারপর ব্যাংকের ভেতরে ঢুকে গেল।

আধুনিক জেনারেটার। 'ধকধক' করে চাপা শব্দ তুলে মেশিনটা চলতে লাগল। ব্যাংকের ভেতরের ঘরে আলো জ্বলে উঠল, ফ্যান ঘুরতে লাগল। টুকটাক করে শুরু হয়ে গেল ব্যাংকের কাজ।

ব্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে, ব্যাংকের কথা ভাবতে-ভাবতে, রোশনের নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে গেল। কীভাবে ব্যাংকের একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল ও। তখন ও ট্যাক্সি চালাত।

গাড়ি ইত্যাদির স্রোতের মাঝে একটা ফাঁক পেয়ে গেল রোশন। চট করে রাস্তা পার হয়ে ও চলে এল ব্যাংকের সামনে। গ্রিলের কাছ থেকে ফুটবলটা হাতে তুলে নিল।

ঠিক তখনই একটা ধুলোমাখা মোটরবাইক এসে দাঁড়াল ব্যাংকের গ্রিলের দরজার একেবারে মুখে। বাইক থেকে নেমে দাঁড়াল দুজন ছেলে। দুজনকেই রোশন চেনে : কাটা নগেন আর নোনতা। পলানের দলের ছেলে। 'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর সামনে নোনতার সঙ্গে একবার টক্কর হয়েছিল রোশনের। ববিনের সামনে গালাগালি দেওয়ার জন্য নোনতাকে একটু সবক শিখিয়েছিল ও।

নোনতার মাথার চুলের কিছুটা অংশে লাল রং লাগানো। চোখে কেমন একটা ঢুলুঢুলু দৃষ্টি।

কিন্তু এই সাতসকালে এরা দুজন ব্যাংকে কী করতে এসেছে? পলানের টাকা তুলতে? কিন্তু ওদের হাতে তো পাশবই, চেকবই বা কোনও কাগজপত্র চোখে পড়ছে না!

বরং যেটা চোখে পড়ল সেটা একটা ওয়ান শটার পিস্তল।

তা হলে কি নোনতা আর নগেন 'সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া'-য় ডাকাতি করতে এসেছে? কিন্তু ওদের হাতে টাকা ভরতি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য থলে বা ব্যাগ কোথায়?

রোশন কৌতূহলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

নগেন আর নোনতা ততক্ষণে বাইক থেকে নেমে পড়েছে। ওরা কেউই রোশনকে খেয়াল করেনি।

নগেনের গায়ে সাদা ফুলশার্ট আর সাদা প্যান্ট—যদিও রংটা ময়লা হয়ে গেছে।

নোনতার গায়ে হালকা সবুজ হাফশার্ট আর কালো প্যান্ট।

দুজনেরই পায়ে সস্তার চটি।

গ্রিলের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে কাটা নগেন হাঁক পাড়ল, 'ম্যানেজার! অ্যাই সালা ম্যানেজার! জলদি বাইরে আয়...।'

কয়েক সেকেন্ড পার হয়ে গেল। কেউই বাইরে এল না।

কাটা নগেন আবার চিৎকার করে উঠল, 'আবে, ম্যানেজার! অ্যাই সালা ম্যানেজারের বাচ্চা! কুইক কাম আউটসাইড! কুইক!'

এই চিৎকারের পরেও কেউ বাইরে এল না। শুধু সিকিউরিটি গার্ড ছেলেটা একবার ভেতর থেকে উঁকি মেরেই আবার ভেতরে সেঁধিয়ে গেল।

নোনতা একটা গালাগাল দিয়ে জেনারেটারের কাছে গেল। এবং ওটার থ্রো সুইচটা একটানে অফ করে দিল। জেনারেটার থেমে গেল।

কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই মোটাসোটা একজন লোক ব্যাংকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। মানুষটি উচ্চতায় খাটো, মাথায় টাক, চোখে চশমা। ডোরাকাটা ফুল স্লিভ শার্ট ছাইরঙা প্যান্টের ভেতরে ইন করে পরেছেন। কোমরে সরু বেল্ট। বেল্টের ওপর দিয়ে মাঝারি মাপের ভুঁড়ি উপচে পড়ছে।

'কী হয়েছে, ভাই? কী হয়েছে? জেনারেটার অফ করল কে?'

নোনতা ভদ্রলোকের নাকের ডগায় ওয়ান শটারটা নেড়ে বলল, 'কেন, কী হয়েছে? আমি অফ করেছি...।'

পিস্তলটা চোখে পড়ামাত্রই ভদ্রলোক মুখে একটা কাঁচুমাচু ভাব ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তার সঙ্গে কান ছোঁয়া হাসি। নোনতার দিকে তাকিয়ে অনুগত চাকরের বক্তব্য পেশ করার ঢঙে বললেন, 'না, কিছু হয়নি। তোমার তো ভাই, শক লেগে যেতে পারত—সেই দুশ্চিন্তায় বলছি।'

নোনতা আর নগেন সরু নজরে ভদ্রলোকের চেহারার ইনস্পেকশন সেরে নিল। তারপর কাটা নগেন জিগ্যেস করল, 'ইউ ব্যাংক ম্যানেজার?'

ভদ্রলোক থতোমতো খেয়ে মিহি গলায় বললেন, 'ইয়েস ইয়েস ইয়েস ইয়েস ইয়েস...।'

'পাঁচবার বলতে হবে না—ওয়ান টাইম এনাফ।' গম্ভীর গলায় বলল নগেন, 'এ ব্রাঞ্চে কদ্দিন ম্যানেজারি করছেন?'

'তা আ-আড়াই মাস হবে—।'

'আড়াই মাস ধরে এখানে সারভিস করছেন আর আশাপুরের রুল জানেন না?'

'ক-ক-কী রুল, ভাই?'

'পলানদার রুল। জেনারেটারের রুল।'

ম্যানেজারসাহেব হাত দিয়ে কপাল আর গালের ঘাম মুছলেন। ভ্যাবাচ্যাকা মুখে নগেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'জেনারেটারের রুল!' ম্যানেজারসাহেবের এবার মাথা চুলকোনোর পালা। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন নগেনের মুখের দিকে।

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই ব্যাংকের কয়েকজন কর্মী বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাদেরই একজন ম্যানেজারসাহেবকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল, 'মিস্টার জানা, জেনারেটার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন?'

কাস্টমাররাও গরমে ভেতরে টিকতে পারেনি—চলে এসেছে বাইরে। তারাও ম্যানেজারের কাছে জানতে চাইছে, 'জেনারেটার চলছে না কেন? কাস্টমারদের ওপরে আপনারা আর কত টরচার করবেন?'

ম্যানেজারবাবু দু-হাত ওপরে তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন।

'আমাকে প্লিজ পাঁচটা মিনিট সময় দিন। আমি ইস্যুটা এই দুজন ভাইয়ের সঙ্গে ডিসকাস করে এখুনি সেটল করে নিচ্ছি। জাস্ট পাঁচটা মিনিট আমাকে টাইম দিন।'

নগেন ম্যানেজারের থুতনিতে হাত দিয়ে ওঁর মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল : 'আমার কথাটা মাইন্ড লাগিয়ে শুনুন...।'

ম্যানেজারবাবু পুতুলের মতো স্থির চোখে নগেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওঁর মুখ এখনও সামান্য হাঁ করা।

'এই জেনারেটার আপনি কোত্থেকে পেয়েছেন?'

'কি-কিনেছি। আমাদের রিজিওন্যাল অফিস ফান্ড স্যাংশান করেছে— তারপর টেন্ডার ডেকে কিনেছি...।'

'হুম।' গম্ভীরভাবে বলল নগেন, 'এখানেই পলানদার রুল ব্রেক হয়ে গেছে। এই আশাপুরে যত দোকান আর অফিস-টফিস আছে সব জায়গায় ভাড়া করা জেনারেটার লাগানো আছে। পলানদার থেকে রেন্ট-এ নেওয়া জেনারেটার। পলানদা খুব রিজনেবল মান্থলি রেন্ট-এ সবাইকে জেনারেটার ভাড়া দেয়। আমি আর নোনতা এই জেনারেটার বিজনেসের দেখভাল করি। নাউ আন্ডারস্ট্যান্ড?'

ম্যানেজার মিস্টার জানা ওপর-নীচে কয়েকবার মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, কাটা নগেনের কথা তিনি 'আন্ডারস্ট্যান্ড করেছেন।'



ওঁদের ঘিরে জড়ো হওয়া ব্যাংক কর্মী আর কাস্টমারের দল নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল, নানান মন্তব্য করছিল। আর সেই জটলা দেখে গ্রিলের বাইরে রাস্তার দিকটায় বেশ কয়েকজন মানুষ জড়ো হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা বড়সড় চেহারা নিতে পারে ভেবে নগেন নোনতাকে ইশারা করল। বলল, 'মেশিন শো করে ব্যাংকের লোকজনকে ব্যাংকের ভেতরে ঢুকিয়ে দে। নইলে পরে ক্যাচাল হতে পারে...।'

নোনতা ওয়ান শটার উঁচিয়ে ধরে বাতাসে এপাশ-ওপাশ নাড়ল।

'আপনারা সব ব্যাংকের ভেতরে ঢুকুন। জেনারেটার এখুনি ফটাফট চালু হয়ে যাবে। যান, ভেতরে যান সবাই...।'

মুহূর্তে সব কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা থেমে গেল। ব্যাংক কর্মী আর কাস্টমাররা সুড়সুড় করে ব্যাংকের ভেতরে ঢুকে গেল।

নগেন নোনতাকে বলল, 'নে, মালটা এবার চালু করে দে—।' জেনারেটারের দিকে ইশারা করল নগেন।

নোনতা ওর বাঁ-হাতটা লম্বা করে বাড়াল। জেনারেটারের থ্রো সুইচটা ঠেলে ওপরদিকে তুলে দিল। তারপর জেনারেটারের সেলফ স্টার্টার টিপে মেশিনটা চালু করে দিল। জেনারেটার 'ধকধক' করে চলতে শুরু করল। ওটার লাল রঙের বডি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কাটা নগেন ম্যানেজারবাবুর গালে একটু হাত বুলিয়ে দিল।

'দেখুন মিস্টার ম্যানেজার, আপনার কেসটা সলভ করার দুটো ওয়ে আছে। একটা হচ্ছে, পলানদার কাছে স্ট্রেটকাট সাইলেন্ডার করা। এই জেনারেটারটা বেচেবুচে দিয়ে পলানদার কাছ থেকে জেনারেটার ভাড়া নেওয়া। আর সেকেন্ড ওয়ে হচ্ছে, আমার কথা না শোনা অ্যান্ড রামক্যালানি খেয়ে এই জেনারেটারের ওপরে কেলিয়ে পড়ে থাকা। হুইচ ওয়ে, বলুন?'

ম্যানেজারসাহেব কাটা নগেনের সামনে রীতিমতো হাত কচলাতে শুরু করলেন। ভদ্রলোকের গালে কপালে বিনবিনে ঘামের ফোঁটা।

'আ-আমাকে কী করতে হবে ব-বলুন।' কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন।

নগেন খেয়াল করল, গ্রিলের গা ঘেঁষে জটলা ক্রমশ আয়তনে বাড়ছে। বড়সড় ক্যাচাল হয়ে গেলে পলানদার কাছে ঝাড় খেতে হবে। তাই ও নোনতাকে ইশারা করল, বলল, 'অ্যাই, লোহাটা পকেটে ছুপে নে। ভিড় বাড়ছে, তাড়াতাড়ি কেস সালটে চ' ফুটে যাই...।'

নোনতা ঘাড় নাড়ল। পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে চারপাশে তাকাল।

নগেন মিস্টার জানার দিকে তাকিয়ে শক্ত গলায় বলল, 'এই জেনারেটারটা আপনি হাটিয়ে দিন। তার বদলে আমরা আপনাকে সেকেন্ড হ্যান্ড একটা জেনারেটার দিয়ে যাব। আপনি মাসে-মাসে তার ভাড়া দেবেন—ফোর হান্ড্রেড পার মান্থ..।'

ম্যানেজারসাহেব করুণ গলায় বললেন, 'সে কেমন করে হয়? প্রতি মাসে আমি ভাড়ার টাকা কোন অ্যাকাউন্ট থেকে দেব? তা ছাড়া নিজেদের কেনা জেনারেটার থাকতে...ব্যাংক তো আমাকে শো-কজ করবে!'

'শো-কজ!' হাসল কাটা নগেন : 'যদি আমার প্রোপোজালে আপনি এগ্রি না করেন তা হলে পলানদা তো আপনাকে শো-কজ করবে!'

রোশন জটলার মধ্যে দাঁড়িয়ে ঝামেলাটা দেখছিল। এ তো একেবারে দিনে ডাকাতি!

ও আশপাশে তাকাল। গন্ডগোলের আঁচ পেয়ে দু-চারজন লোক জড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু আরও যাদের জড়ো হওয়ার ইচ্ছে ছিল তারা নোনতা আর কাটা নগেনকে চিনতে পারামাত্রই নিজের-নিজের কাজের তাড়ায় সরে পড়েছে। রোশন পলানের এই দু-পিস চ্যালাকে চেনে, কিন্তু ওর সরে পড়তে ইচ্ছে করেনি।

নগেন তখন মিস্টার জানাকে বলছিল, 'অবশ্য আর-একটা ওয়ে আছে। এই লালু জেনারেটারটা...' আঙুল দিয়ে জেনারেটারটা দেখাল নগেন : '...আপনি পলানদাকে বেচে দিন। আর এভরি মান্থে পলানদা আপনাকে ই.এম.আই. দিয়ে যাবে। অ্যান্ড আপনি পলানদাকে মান্থলি রেন্ট দিয়ে যাবেন। যদি আপনি চান তা হলে ই.এম.আই আর রেন্ট-এ প্রতি মাসে কাটাকুটি করে শোধবোধ করতে পারেন—সেটা আপনার ব্যাপার। তারপর আপনার ই. এম. আই. পেইড হয়ে গেলে এই লাল মালটা আমরা তুলে নিয়ে যাব। ক্লিয়ার?' মিস্টার জানার দিকে আঙুল উঁচিয়ে শেষ প্রশ্নটা ছুড়ে দিল নগেন।

ম্যানেজারসাহেব হতভম্ব হয়ে নগেনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। নগেনের বিচিত্র ই.এম.আই.-এর প্রস্তাব শুনে ওঁর মাথা ঘুরছিল।

মাথা ঘুরে গিয়েছিল রোশনেরও। নগেনের প্রস্তাবটা নিছকই জেনারেটারটা বিনাপয়সায় হাতিয়ে নেওয়ার স্কিম। এরকম ইকনমিক্স কাটা নগেন কোথায় শিখল কে জানে!

রোশন ভাবছিল, ব্যাপারটা অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে—এবারে কিছু একটা করা দরকার। ফুটবলটা হাতে নিয়েই ও গ্রিলের দরজার দিকে এগোল।

ম্যানেজারসাহেব তখন কাতর গলায় নগেনকে বলছেন, 'আপনি কী বলছেন সেটা একবার ভেবে দেখেছেন! এসব কাজ করলে তো আমার চাকরি চলে যাবে! আমার ফ্যামিলি না খেতে পেয়ে মারা যাবে! আমার..।'

ম্যানেজারের কথা শেষ হওয়ার আগেই নগেন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে খিস্তির ফোয়ারা ছোটাল। এবং মিস্টার জানার ডানহাতের পাতাটা চেপে ধরে একটানে সেটাকে জেনারেটারের ইঞ্জিনের গরম বডিতে চেপে ধরল।

জানা অসহ্য যন্ত্রণায় ভয়ংকর চিৎকার করে উঠলেন। ওঁর দু-গালে একরাশ রক্ত ছুটে এল।

জটলার দু-তিনজন চেঁচিয়ে উঠল, 'কী করছেন! কী করছেন! ছেড়ে দিন! ছেড়ে দিন!'

উত্তরে কাটা নগেন দাঁত বের করে হাসছিল। যে হাসির মানে : 'পলানদার কথা না শুনলে কী হয় দেখে নাও সব্বাই।'

রোশনের সারা শরীর জ্বালা করছিল। এতগুলো মানুষের চোখের সামনে নগেন এরকম অন্যায় করার সাহস পাচ্ছে কেমন করে?

অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় সামনে দুটো স্টেপ ফেলল রোশন। দু-হাতে ধরা ফুটবলটা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে হিট করল নগেনের মাথায়।

নগেন পলকে কাত হয়ে গেল। ওর মাথাটা বেশ জোরে বাড়ি খেল গ্রিলের দেওয়ালে। মিস্টার জানার হাতটা ছেড়ে গেল ওর হাত থেকে।

জানা ওঁর বাঁ-হাত দিয়ে ডানহাতের পাতাটা চেপে ধরে যন্ত্রণায় 'উঁ-উঁ-উঁ' করতে লাগলেন।

রাস্তার ওপার থেকে নিতুয়া ব্যাংকের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওখানে লোকের জটলা কেন? কীসের ঝামেলা চলছে ওখানে?

নিতুয়ার আশেপাশে দাঁড়িয়ে ছিল ববিন, রেমো, পটকা, পিনু আর মুনিয়া রোশনকাকু ওদের ফুটবলটা নিয়ে এখনও ফিরে আসছে না দেখে ওরা খুব অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। সামান্য বলটা নিয়ে ফিরে আসতে কাকুর এতক্ষণ লাগছে কেন? দু-চারজন লোক ব্যাংকের সামনেটায় জড়ো হয়ে থাকায় বাচ্চাগুলো ওদের কাকুকে স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিল না। তাই ওরা মাথা এপাশ-ওপাশ নাড়িয়ে রোশনকে দেখার চেষ্টা করছিল।

নিতু হঠাৎই রোশনকে একঝলক দেখতে পেল। মনে হল যেন, ওর সঙ্গে কারও হাতাহাতি চলছে।

নিতু আর দেরি করেনি। লরির খালাসিগোছের একজন লোক বালির স্তূপের কাছটায় বসেছিল। তাকে নিজের সাইকেলটা দেখিয়ে নিতু বলল, 'ভাই আমার গাড়িটা একটু দেখিস তো—।'

তারপর ও রাস্তা পার হওয়ার জন্য রাস্তার কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওর আশেপাশে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচটা ছোট ছেলে। ওরা রোশনকাকুর কাছে যাবে বলে নাছোড় বায়না ধরেছে।

মিস্টার জানার যন্ত্রণার চিৎকারে লোকজন একটু বেশিই জড়ো হয়ে গিয়েছিল। ব্যাংকের ভেতর থেকে কর্মী আর কাস্টমাররাও বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ততক্ষণে কাটা নগেন নিজেকে সামলে নিয়েছে। এবং ও আর নোনতা খিস্তির ফোয়ারা ছুটিয়ে এক-সঙ্গে রোশনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওকে এলোপাতাড়ি ঘুসি আর লাথি মেরে চলেছে। রোশনের হাত থেকে ফুটবলটা ছিটকে পড়ে গেছে মেঝেতে।

নিতু পাঁচটা বাচ্চাকে সঙ্গে করে রাস্তা পার হয়ে চলে এল ব্যাংকের কাছে।

গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ওরা দেখতে পেল, দুটো ছেলে ওদের 'কাকু'-কে ধরে মারছে। অন্য কয়েকজন লোক কাছাকাছি থাকলেও তারা ছেলে দুটোকে আটকাচ্ছে না।

নিতু খুব একটা অবাক হল না। পলানের দলবলের কাছে আশাপুরের মানুষ বহুদিন থেকেই পোষা ভেড়া হয়ে গেছে।

নোনতা এবং কাটা নগেনের মুখ দুটো জটলা করে থাকা মানুষদের অনেকেরই চেনা। তাই তারা মুখে কিছু-কিছু মন্তব্য করলেও ওই পর্যন্তই— কাজে কিছু করছিল না।

নিতুয়ার খুব খারাপ লাগছিল। রোশন ছেলেটা এত উপকারী, নিতুয়ার কত উপকার করেছে—অথচ ওর বিপদে নিতুয়া কিছু করে উঠতে পারছে না। নিতুয়ার শরীরে যদি সেই শক্তি থাকত তা হলে এই গুন্ডাদুটোকে ও মেরে পাট-পাট করে দিত।

একটা নিস্ফলা রাগ নিতুয়ার ভেতরে টগবগ করে ফুটছিল। মাথা খুঁড়ে মরছিল। ওর রগের কাছটা দপদপ করে উঠল, তার সঙ্গে একটা ব্যথা শুরু হল।

হঠাৎই নিতুয়ার চোখের সামনে একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেল। ওর সঙ্গী পাঁচটা বাচ্চা 'অ্যাই, কাকুকে মারছ কেন? কাকুকে মারছ কেন?' বলে প্রবল চেঁচাতে শুরু করল। এবং ভিড় ঠেলে বুলেটের মতো ছুট্টে ঢুকে গেল গ্রিল ঘেরা জায়গাটার ভেতরে।

তারপর ববিন, পটকা, পিনুর দল ঝাঁপিয়ে পড়ল নোনতা আর কাটা নগেনের ওপরে।

পাঁচটা বাচ্চার কাণ্ড দেখে নিতু থ' হয়ে গিয়েছিল। পলানের যে-সাঙ্গপাঙ্গদের আশাপুরের জোয়ান-মদ্দরা পর্যন্ত সমঝে চলে, এড়িয়ে চলে, পাঁচটা বাচ্চা কোনও কিছুর পরোয়া না করে সেরকম দুজন খতরনাক সাঙ্গপাঙ্গর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে!

বাচ্চাগুলো শুধু ঝাঁপিয়ে পড়েই থেমে থাকেনি, একইসঙ্গে নগেন এবং নোনতাকে খিমচে দেওয়া এবং কামড় দেওয়ার কাজটাও করে চলেছে। আর মাঝে-মাঝে বলে চলেছে, 'অ্যাই, ছেড়ে দাও কাকুকে! কাকুকে মারছ কেন?'

নিতুয়ার নিজেকে অসহায় ক্লীব বলে মনে হচ্ছিল। এই পাঁচটা খুচরো পয়সা বাচ্চা যা পারছে ও সেটা করতে পারছে না! হোক না নিতুয়ার বয়েস হয়েছে, হোক না ও সামান্য একটু প্রতিবন্ধী, তা বলে কি প্রতিবাদ করা যায় না!

নিতুয়া ভিড়ের স্তর ঠেলে সরিয়ে নগেন আর নোনতার কাছে পৌঁছে গেল। লম্বা হাত বাড়িয়ে খপাত করে নোনতার লাল রং করা চুলের মুঠি চেপে ধরল। দু-চারটে গালিগালাজ বেরিয়ে এল নিতুয়ার মুখ থেকে। ওর শরীরের মধ্যে ঘেন্না আর রাগ টগবগিয়ে উঠল। নোনতার চুলের মুঠি ধরে নিতুয়া প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকাতে লাগল। ওর ভেতরে শক্তিও যেন চলে এল কোথা থেকে।

পাঁচটা ছোট বাচ্চা পাঁচটা ছটফটে কাঁকড়াবিছের মতো নোনতা আর নগেনের গায়ে চুম্বকের মতো সেঁটে গিয়েছিল। আর একইসঙ্গে ওদের আঁচড়-কামড়ের কাজ চলছিল।

এইসব কাণ্ড দেখে কয়েকজন পাবলিকও হাত লাগাল। বাচ্চাগুলোর সাহস ওদের সাহস জুগিয়েছে। নগেন আর নোনতার হাতে অনেক হেনস্থা ওরা সহ্য করেছে—কিন্তু আর না। এবার জবাব দেওয়ার সময় এসেছে।

পাবলিকের হাত চলতে লাগল। কয়েকসেকেন্ডের মধ্যে রোশন নোনতা আর নগেনের কবজা থেকে ছাড়া পেয়ে গেল। কিন্তু ওর হাতে, গালে, কপালে দু-চার জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে।

ব্যাংকের ঘটনাটা অনেকক্ষণ ধরে যারা দেখছিল তাদের ধৈর্য ক্রমশ কমছিল। কিন্তু নোনতা, নগেনের কুখ্যাতি এবং ওদের বসের গুন্ডারাজের হিংস্রতার থাবার ভয় তাদের এতক্ষণ থামিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু পাঁচটা ছোট বাচ্চা সব হিসেব ওলট-পালট করে দিল।

আচমকা পাবলিকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।

গ্রিলের বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা নগেন আর নোনতার মোটরবাইকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রবল এক ধাক্কায় বাইকটা কাত হয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। তারপর সেটাকে নিয়ে যে যা খুশি করতে লাগল। কেউ থান ইট দিয়ে বাইকের ইঞ্জিনটাকে পেটাতে লাগল। কেউ চাকার হাওয়া বের করে দিল। কেউ বা বাইকের কাত হয়ে থাকা চাকার ওপরে উঠে ধেইধেই করে নাচতে লাগল।

পাবলিকের এই হুটোপাটির পাশাপাশি চলছিল ভয়ংকর চেঁচামেচি আর চিৎকার।

গ্রিল ঘেরা জায়গাটার ভেতরের দৃশ্যের চরিত্রও ছিল প্রায় একইরকম। বেশ কয়েকজন লোক মিলে নোনতা আর নগেনের ওপরে হাত চালাচ্ছিল। রোশন একটু পাশে সরে এসেছে। বাচ্চাগুলো ওকে ঘিরে 'কাকু! কাকু!' করছে। চারপাশ থেকে লোকজনের নানান মন্তব্য আর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। কেউ বলল,

'এই নোনতা ব্যাটা মাসের পর মাস আমার মুদিখানা থেকে ধারে মাল নেয়—আজ পর্যন্ত একটা পয়সা শোধ দেয়নি। আজ সব ধার গায়ে গায়ে শোধ করে নেব...।'

আর-একজন বলল, 'ওই নগেন ছোঁড়াটা আমার বউয়ের সোনার চেন ছিনতাই করেছিল। আমি কত করে বললুম, ''তুমি আমি একই পাড়ার লোক। তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? ভালো করে দ্যাখো—।'' তাতে এই শয়তানটা বলেছিল, ''না বে, চিনতে পারছি না। রাস্তায় আলো বড্ড কম...।'' তারপরই আমার ওয়াইফের গলা থেকে চেনটা ছিঁড়ে নিল। শালা, আজ যাবি কোথায়।'

উত্তেজিত পাবলিক দুটো গুন্ডাকে মারতে-মারতে টেনে নিয়ে এল খোলা রাস্তায়। ওদের মুখের মারমুখী ছবি দেখে রোশনের মনে হল ওরা বহুদিনের চাপা ক্ষোভ আজ আগ্নেয়গিরির মতো উগরে দিচ্ছে।

পাঁচটা বাচ্চাকে সামলে নিয়ে রোশন আর নিতু চলে এল রাস্তায়। মিস্টার জানা তখন কয়েকজনকে উত্তেজিতভাবে ওঁর ওপর টরচারের কাহিনি শোনাচ্ছেন। ব্যাংকের সামনেটা ভিড় জমে গেছে। অনেকেই মোবাইল ফোন উঁচিয়ে ধরে ঘটনার ফটো কিংবা ভিডিয়ো তুলছে।

ব্যাংকের সামনে ঝামেলাটা এখন মাপে এতটাই বড় হয়ে গেছে যে, রাস্তায় যানজট শুরু হয়ে গেছে।

নোনতা কিংবা নগেন—ওরা কেউই কখনও পাবলিকের ধোলাই খায়নি। তা ছাড়া ওরা বুঝতে পারেনি, জেনারেটারের ব্যাপারটা ছোট থেকে পট করে এতটা বড় হয়ে যাবে। নগেনের মনে হচ্ছিল, ও বোধহয় একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। পলানদা জানতে পারলে হয়তো ঝাড় খেতে হবে। নগেনের মাঝে-মাঝে পলান নস্কর হতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে না। কারণ, পলান জানে কোথায় থামতে হয়—নগেন সেটা জানে না, সেইজন্যই ও নোনতাকে ওয়ান শটার বের করতে বলেছিল। কারণ, ওর ধারণা, পাবলিকের ওপরে ভয়ের চাদর সবসময় বিছিয়ে রাখতে পারলেই মাস্তানরাজ ঠিকঠাক কায়েম থাকে। কিন্তু মেশিনটা শো করাটা বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কোথায় থামতে হবে নগেন সেটা বুঝতে পারেনি।

নোনতা মাস্তানির লাইনে নগেনের চেয়ে জুনিয়ার। তাই ও পলানদার কাছে ঝাড় খাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাবে। নগেনকেই পুরো কেসটার জবাবদিহি করতে হবে। দিনের আলোয় রাস্তার ওপরে পাবলিকের হাতে ওদের দুজনের হেনস্থা হওয়ার মানে পলানদার হেনস্থা হওয়া।

কিন্তু এখন এই বিগড়ে যাওয়া সিচুয়েশানটাকে সামাল দেওয়া যায় কেমন করে?

নগেনকে ঘিরে এখনও পাবলিকের জটলা। সপাটে একটা থাপ্পড় এসে পড়ল নগেনের গালে। তারপরই নাকের ওপরে একটা জোরালো ঘুসি। তার পাশাপাশি কার একটা লাথি এসে পড়ল তলপেটে।

নগেনের দম বন্ধ হয়ে এল। নাকে অসহ্য ব্যথা। ঠোঁটের কোণে নোনা স্বাদ। নাক থেকে বোধহয় রক্ত পড়ছে।

নোনা স্বাদ থেকে নোনতার কথা মনে পড়ল। ও কোথায় গেল?

লোকজনের শরীর আর মাথার ফাঁক দিয়ে আর-একটা জটলা একঝলক নগেনের চোখে পড়ল। লোকগুলো কাকে যেন গালিগালাজ করছে, ওদের আক্রমণের হাত উঠছে নামছে।



নগেনের শরীর আর নিতে পারছিল না। গণধোলাইয়ের চাপ নেওয়া খুব সহজ নয়। ওর মাথায় সাংঘাতিক ব্যথা। কোথায় যেন একটা শিরা টনটন করছে। তলপেট দপদপ করছে। তারই মধ্যে চোয়ালে একটা ঘুসি এসে পড়ল।

নোনতার অবস্থাও নগেনের চেয়ে কিছু ভালো নয়। ও পাবলিকের মার খাচ্ছিল। তারই মধ্যে দুটো হাত মুখের সামনে রেখে মুখটাকে যথাসম্ভব বাঁচাতে চেষ্টা করছিল। পকেটে যে ওয়ান শটারটা রয়েছে সেটা নোনতার ভালো করেই মনে ছিল। কিন্তু ও সেটাকে বের করার কথা একটিবারের জন্যও ভাবেনি। কারণ, ওটা বের করলে যে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে পারে সেটা নোনতা বুঝতে পেরেছিল।

'সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া'-র সামনে রাস্তার ওপরে দিনের আলোয় যে-ঘটনা ঘটছিল সেটা ভিড়ের মধ্যে হাজির বহু মানুষই বিশ্বাস করতে পারছিল না। আশাপুরের সাধারণ মানুষ পলানের দলের দুটো গুন্ডাকে তেড়ে পেটাচ্ছে! ওদের বাইক ভাঙচুর করে 'দ' করে দিয়েছে!

গন্ডগোলটা মাপে ক্রমশ বড় চেহারা নিচ্ছে দেখে রোশন পটকা, পিনু, ববিনদের জন্য একটু চিন্তায় পড়ে গেল। ও নিতুয়াকে বলল বাচ্চাগুলোকে নিয়ে স্পট থেকে চলে যেতে। ওদের বাড়ি পৌঁছে দিতে।

তখন নিতুয়া জিগ্যেস করল, 'আর তুমি? তুমি বাড়ি যাবে না?'

'না, আমি এখন যাব না। তা ছাড়া সবাই মিলে ছেলেদুটোকে এভাবে মারছে...এটা ঠিক হচ্ছে না...।'

নিতুয়া অবাক হয়ে রোশনের মুখের দিকে তাকাল। ছেলেটা বলে কী! ও কি জানে না, পলানের গুন্ডাবাহিনী আশাপুরের মানুষের ওপরে কী ধরনের সন্ত্রাস-রাজ কায়েম করে রেখেছে! তার মধ্যে কাটা নগেন আর নোনতা পলানের দুজন কুখ্যাত চ্যালা। আশাপুরের পাবলিকের ওপরে কী টরচারটাই না করেছে এরা! আজ পাবলিক খেপে গিয়ে তার শোধ নেওয়ার পালা শুরু করেছে। তাতে রোশন বলছে, নোনতা আর নগেনকে এভাবে মারাটা ঠিক হচ্ছে না। ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! এই দেড়-দু-মাসে আশাপুরের প্রায় সবকিছুই তো রোশন জেনে গেছে। তা হলে এই দুটো গুন্ডার জন্য ও...?

রোশন নিতুকে তাড়া দিল : 'নিতুদা, তুমি ববিনদের নিয়ে শিগগির, চলে যাও—আর দেরি কোরো না। বাচ্চাগুলোর বাড়ির লোকজন চিন্তা করবে...। দিদি আমাকে পাঁচকথা শুনিয়ে দেবে।' দিদি মানে ববিনের পিসি, সাবিত্রী।

নিতু আর কিছু বলতে পারল না। রোশনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ও ববিনদের তাড়া দিল : 'অ্যাই, চল চল, সব বাড়ি যাবি চল...।'

ওদের নিয়ে আবার রাস্তা পার হল নিতু। সাইকেলটা মাঠ থেকে নিতে হবে।

নিতু বাচ্চাদের নিয়ে সরে যেতেই রোশন ভিড়ের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেল।

'একটু দেখি...প্লিজ, একটু যেতে দিন...ভেতরে যেতে দিন...।' বলতে-বলতে ভিড়ের ভেতরে ঢুকল রোশন।

তখনই নগেনকে ও দেখতে পেল।

মুখের নানান জায়গায় কেটে গেছে। ডানদিকের ভুরুর কাছটা অনেকটা ফুলে উঠেছে, ফলে ডান চোখটা ছোট হয়ে গেছে। নগেনকে ভালো করে চেনা যাচ্ছে না। ওর জামায় রক্তের দাগ।

পাবলিক তখনও ওর ওপরে হাত চালাচ্ছিল। নগেন সামনে হাত তুলে সেই আক্রমণগুলোকে ঠেকাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেই চেষ্টা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ওর শরীরে আর শক্তি নেই—ও রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়েছে। এখনই হয়তো টলে পড়ে যাবে।

নগেনকে দেখে রোশনের খুব খারাপ লাগল। এরকম শাস্তির কথা ও কখনও ভাবেনি। এখনও যদি এই গণধোলাই না থামানো যায় তা হলে শেষ পর্যন্ত হয়তো...।

'ওকে আর মারবেন না। ওকে আর মারবেন না।' রোশন চিৎকার করতে শুরু করল, 'ও যদি মরে যায় তা হলে আপনাদের সবার নামে পুলিশ-কেস হবে। প্লিজ, থামুন! থামুন! ওকে আর মারবেন না...!'

'পুলিশ-কেস' কথাটা শোনামাত্রই অনেকের হাত চালানো থেমে গেল। কেউ-কেউ জটলার কাছ থেকে চটপট সরে গেল। ভিড় পাতলা হতে শুরু করল।

রোশনের আশপাশ থেকে দু-চারজন বয়স্ক মানুষ তখন বলছিলেন যে, এরকমভাবে মারাটা ঠিক হচ্ছে না। সবাই মিলে একজনকে ধরে মারছে—এটা তো আরও অন্যায় হচ্ছে!

রোশন ভিড় ঠেলে নগেনের কাছে গেল। ওর হাত ধরে চেঁচিয়ে সবাইকে বলল, 'প্লিজ, আপনারা যে যার কাজে যান। এখনই পুলিশ এখানে এসে পড়বে। যান, যে যার কাজে যান...।'

নগেন তখন রোশনের একটা হাত আঁকড়ে ধরেছে। রোশন টের পেল, নগেনের শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। রোগা, বেঁটে ছেলেটা রোশনের গায়ে নিজের ওজন ছেড়ে দিয়েছে।

পাশেই নোনতার ওপরে পালিশের অপারেশন চলছিল। রোশনের কথায় আর চিৎকারে অপারেশনের তেজ কমে এসেছিল। কেউ-কেউ আর মারধোর করতে বারণও করছিল।

নগেনকে সামলে নেওয়ার পর রোশন একটা হাত নোনতার দিকে দেখিয়ে আবার চিৎকার করতে লাগল, 'ছেড়ে দিন! ওকে ছেড়ে দিন! ছেলেটা এবার মরে যাবে!...প্লিজ, ওকে ছেড়ে দিন!'

পাবলিক এবার অনেকটাই দমে গেল, থমকে গেল।

রোশন নগেনকে নিয়ে নোনতার কাছে এগিয়ে গেল। পাবলিকের মারে ছেলেটার মুখ-চোখ একেবারে ফেটেফুটে গেছে। পাবলিক যে এতটা খেপে যাবে সেটা রোশন ভাবতে পারেনি। আসলে অনেকদিনের ঘেন্না, রাগ, আর কিছু করতে না পারার ক্ষোভ, একসঙ্গে দলা পাকিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

রাস্তার যানজট এর মধ্যে আরও জট পাকিয়ে গেছে। গাড়ি, সাইকেল, সাইকেল-রিকশা যে যেমন খুশি হর্ন দিচ্ছে। রোশন রাস্তা থেকে ভিড় সরানোর জন্য সবাইকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল। তারই মধ্যে লোকজনকে সরিয়ে নোনতার দখল নিল।

নোনতার অবস্থা ভালো নয়—মাতালের মতো এদিক-ওদিক টলছে।

রোশন আশপাশের লোকজনকে দুটো সাইকেল-রিকশা ধরে দিতে বলল। তারপর ব্যাংকের দিকে তাকিয়ে দেখল, ম্যানেজার মিস্টার জানা গ্রিলের ফাঁক দিয়ে রাস্তার ঝামেলার দিকে তাকিয়ে আছেন।

রোশন নগেন আর নোনতাকে দু-হাতে শক্ত করে ধরে ব্যাংকের গ্রিলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। চেঁচিয়ে বলল, 'ম্যানেজারসাহেব, একটা রিকোয়েস্ট ছিল...।'

'কী?' জেনারেটারের আওয়াজ ছাপিয়ে গ্রিলের পিছন থেকে মিস্টার জানা জিগ্যেস করলেন। ওঁর গলায় যন্ত্রণার ছাপ। বাঁ-হাত দিয়ে এখনও ডানহাতটার নার্সিং করে চলেছেন।

'আপনি এই দুজনের নামে প্লিজ পুলিশে কোনও রিপোর্ট করবেন না। এরা এর মধ্যেই অনেক শাস্তি পেয়ে গেছে। দেখুন, ওদের কী হাল হয়েছে...!'

ম্যানেজার নগেন আর নোনতার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। কয়েকসেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বললেন, 'ঠিক আছে...আপনি যখন বলছেন...।' ওঁর মুখ দেখে মনে হল, শাস্তি নিয়ে যে-মন্তব্য রোশন করেছে তার সঙ্গে তিনি একমত।

দুটো সাইকেল-রিকশা রোশনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারই একটায় রোশন নগেনকে তুলল—তারপর নিজেও উঠল। অন্য রিকশাটায় নোনতাকে তুলে বসানোর জন্য জমায়েত জনতাকে অনুরোধ করল ও। আরও বলল, চোট পাওয়া মানুষটাকে আগলে ধরে কেউ একজন যেন ওর পাশে বসে।

সঙ্গে-সঙ্গে কাজ হল। রোগাপাতলা একটা কালো মতন ছেলে টপ করে নোনতাকে চাগিয়ে তুলে রিকশায় বসিয়ে দিল। তারপর একলাফে নোনতার পাশে বসে পড়ে রোশনকে জিগ্যেস করল, 'দাদা, একে কোথায় নিয়ে গিয়ে আনলোড করব?'

'ডাক্তার সুধীর পাঠকের চেম্বার। ''সুনিরাময়''। এখনই এই দুজনের ট্রিটমেন্ট হওয়া দরকার। হেভি চোট পেয়েছে...।'

'যা বলেছ, দাদা—' কালোমতন ছেলেটা বলল, 'একেবারে কেলিয়ে কালাচাঁদ হয়ে গেছে—।' কথাটা বলতে-বলতে ছেলেটা নোনতাকে আরও ভালো করে জাপটে ধরল, যাতে নোনতা কাত হয়ে পড়ে না যায়।

রোশন দেখল, ছেলেটার হলদে টি-শার্টে নোনতার রক্তের ছোপ লেগে গেছে।

নিজের টি-শার্টের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল রোশন। হ্যাঁ, ওটারও একই অবস্থা—কাটা নগেনের রক্ত লেগে আছে সেখানে।

সাইকেল-রিকশা দুটোকে জনতার ভিড় ঘিরে ছিল। রিকশাদুটো হর্ন বাজিয়ে চাকা গড়ানো শুরু করতেই ভিড় দুপাশে সরে গিয়ে পথ তৈরি করে দিল। রোশন রিকশাওয়ালা দুজনকে লক্ষ্য করে বলল, 'ভাই, সুধীরডাক্তারবাবুর চেম্বারে যাব। ''সুনিরাময়''।'

রিকশাদুটো চলতে শুরু করল। পিছনে 'সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া' আর পাবলিকের ভিড় পড়ে রইল। জনগণ নানান আলোচনা করছিল। তারই মধ্যে কয়েকজন বলছিল, এতক্ষণ ধরে এখানে ঝামেলা চলল, অথচ পুলিশের টিকি পর্যন্ত দেখা গেল না।

আরও তিনজন বেশ অবাক হয়েই বলল, 'হ্যাঁ। আবার দ্যাখো, এত বামাল হল, বাট পলানদা কিংবা ওর চ্যালাচামুণ্ডারাও কেউ স্পটে শো হল না। ব্যাপারটা পিকিউলিয়ার লাগছে না?'

নগেন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল। রোশন ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আর দশমিনিট—তারপরই আমরা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে পৌঁছে যাব। ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর-একটু সহ্য করো...।'

রিকশা হর্ন দিচ্ছিল, গর্তে ভরা এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে বাহন দুটোর চাকা গড়িয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার লোকজন—যাদের রিকশাদুটোর দিকে নজর পড়ছিল—অবাক হয়ে রিকশার যাত্রীদের দেখছিল। কেউ-কেউ রোশনকে চিনতে পারল, আবার কেউ-কেউ কাটা নগেন আর নোনতাকে চিনতে পারল।

আকাশের দিকে তাকাল রোশন। রোদের ওপরে মেঘের সর পড়েছে। তার ফাঁক দিয়ে ডিমের কুসুমের মতো সূর্য চোখে পড়ছে।

রোশনের চারপাশে আশাপুর শান্তভাবে বিছিয়ে রয়েছে। ব্যস্ত মানুষজন, গাড়ি, রিকশা, সাইকেল। গাছপালা, পুকুর, বুলবুলি, শালিখ, কাক, চড়ুই, আর মাথার ওপরে আকাশ। এসবই রোশন দেখতে পাচ্ছে। সেইজন্যই হয়তো এসবের সঙ্গে রোশনের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক নিতুয়া, সাবিত্রী, ববিনের মতো। এ ছাড়া কথাবার্তা মানুষের সম্পর্ককে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। দু-মাস আগেও এরা সব রোশনের কেউ ছিল না। রোশন শুধু নিজেকে নিয়ে ছিল, একা। একা থাকবে বলেই ও অচেনা অজানা এই আশাপুরে হুট করে বাস থেকে নেমে পড়েছিল।

কিন্তু তার পর?

তারপর কী করে যেন সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। দমকা বাতাসের মতো নতুন-নতুন সম্পর্ক রোশনকে ছুঁয়ে যেতে লাগল। বাতাসকে আমরা চোখে দেখতে পাই না, ছুঁতে পারি না। কিন্তু বাতাস অনায়াসে আমাদের ছুঁয়ে ফেলতে পারে...হয়তো দেখতেও পায়।

আহত কাটা নগেনকে আঁকড়ে ধরে রোশন এসব কথা ভাবছিল।

ঠিক তখনই নগেনের পকেটে রাখা মোবাইল ফোন বাজতে শুরু করল। একটা চটুল হিন্দি গানের রিং টোন রোশনের কানে ধাক্কা মারল।

নগেন রোশনের ঊরুতে চাপ দিল। রোশন ওর দিকে তাকাতেই ও কোনওরকমে বলল, 'ফোনটা...পকেট থেকে...বার করে...দাও...।'

গোঙাচ্ছিল বলে নগেনের কথা বুঝতে বেশ কষ্ট হল।

নগেন ওর শরীরটাকে বাঁ-দিকে খানিকটা হেলিয়ে দিল। রোশন ওর ডানপকেট থেকে ফোনটা বের করে নগেনের হাতে দিল। ফোনের পরদায় কলারের নাম ফুটে উঠেছে : 'পলানদা'।

নগেন 'অ্যাকসেপ্ট' বোতাম টিপে মোবাইল ফোনটা কানে চেপে ধরল।

'হ্যাঁ, পলানদা—বলো...।' কোনওরকমে বলল নগেন। ওর চোয়াল নাড়তে অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল।

'তোর ওখানে ক্যাচাল মিটেছে?' পলানের গলা বেশ রুক্ষ, বিরক্ত।

'হ্যাঁ—।'

'এখনও ঠেকে ফিরছিস না কেন? কোথায় আছিস তুই?'

'আমি ডাক্তারখানায় যাচ্ছি। পাবলিক আমাকে হেভি কেলিয়েছে।' নগেন কুঁতিয়ে-কুঁতিয়ে বলল, 'হেভি ইনজিয়োরড। একেবারে ফেটেফুটে গেছে...।' কথার শেষে নগেন হাপরের মতো হাঁপাতে লাগল।

'নোনতা কোথায়?'

'ফ্রন্টের রিশকায়...।'

'মানে?' পলানের বিরক্ত প্রশ্ন শোনা গেল।

'আওয়ার মোটরবাইক...ভাঙচুর হয়ে গেছে। ব্যাংকের সামনে পড়ে আছে। তুমি ওটা তোলানোর অ্যারেঞ্জমেন্ট করো। এখন রোশন আমাদের রিশকা করে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাচ্ছে...।'

'কে নিয়ে যাচ্ছে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল পলান।

'রোশন।' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল কাটা নগেন, 'এই তো...আমার সাইড বাই সাইড বসে আছে...।'

রোশন নগেন আর নোনতাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাচ্ছে! রোশন!

কী হচ্ছে এসব! কী করে হচ্ছে?

ফোন কেটে দিল পলান।

নগেন আর নোনতা গণধোলাই খেল! ওদের বাইক ভাঙচুর হল! এই আশাপুরে!

আশ্চর্য! পলান এসব ভাবতেই পারছে না।

ব্যাংকের সামনে গোলমালের খবর পলান আগেই পেয়েছিল। ব্যাংকের কাছে হাজির থাকা মানুষজনের দুজন পলানকে ফোন করে খবরটা দিয়েছে। আশাপুরে এমন মানুষও বেশ কিছু আছে যারা পলানের বলতে গেলে গুপ্তচর। তারা পলানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে, খবরাখবর দেয়।

পলান বুঝতে পেরেছিল কেসটা ঘোরালো হয়ে জট পাকিয়ে গেছে। তাই ও স্পটে যায়নি। ঝড়ঝাপটা যা যাওয়ার নগেন আর নোনতার ওপর দিয়েই যাক। তা ছাড়া খবরটা পেয়েই সাব-ইনস্পেক্টর সুরেন দাসের সঙ্গে পলান ফোনে কথা বলে নিয়েছে। দিনেরবেলায় মেন রোডের ওপরে ব্যাংকের জেনারেটার নিয়ে ক্যাচাল। এটা অনেক দূর গড়াতে পারে। তাই সুরেনদাকে পলান রিকোয়েস্ট করেছে, খবর পেলেও সুরেনদা যেন স্পটে পুলিশ-টুলিশ না পাঠায়। কেসটা নিজে থেকেই একটু থিতিয়ে যাক। পরে কিছু যদি হয় তখন সালটে নেওয়া যাবে।

পলানের কথায় সুরেন দাস শুধু হেসে বলেছেন, 'কোনও চিন্তা করবেন না, পলানদা। আমার ওপরে ভরসা রাখুন...।'

কিন্তু এর মধ্যে রোশন ছেলেটা ঢুকে পড়েই সব গোলমাল করে দিল।

নগেন আর নোনতাকে ও ডাক্তারখানায় নিয়ে যাচ্ছে!

ব্যাপারটা পলান কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

***

রোশন সাইকেল নিয়ে আশাপুরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সন্ধে নামতেই ও ববিনকে পড়াতে গিয়েছিল। প্রতিদিন সন্ধেবেলা এটাই ওর রুটিন। ববিনের কোনও সময় পড়ায় মন নেই।

সুযোগ পেলেই শুধু বল নিয়ে খেলা। কিন্তু একটু-আধটু তো লেখাপড়া করতে হবে! লেখাপড়া না করলে যে কী অসুবিধে সেটা রোশন নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারে। ওর লেখাপড়ার খিদে থাকলেও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা ছিল না। ববিনদের অবস্থা তার চেয়েও অনেক খারাপ। কিন্তু যতটুকু লেখাপড়া করা যায় সেটুকু তো করা দরকার!

রোশন রোজ সে-কথাই বোঝায় ববিনকে। সাবিত্রীও লেখাপড়া করা নিয়ে ববিনকে সবসময় বকাঝকা করে।

ববিনকে পড়ানোর পাট চুকিয়ে রোশন যখন সাইকেল নিয়ে রাস্তায় নামল তখন সন্ধে সাতটা।

এখন ওর কাজ হল, সাইকেল চালিয়ে আশাপুরটা ঘুরে-ঘুরে দেখা। সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে যেদিকে মন চায় সেদিকে সাইকেল চালিয়ে দিলেই হল। তারপর খিদে পেলে কিংবা চায়ে চুমুক দিতে মন চাইলে পথচলতি কোনও দোকান ঘেঁষে সাইকেল দাঁড় করিয়ে দিলেই ব্যস।

রোশনকে এখন আশাপুরের বহু মানুষ চিনে গেছে। তারা অনেকেই রোশনের নাম জানে না, কিন্তু ওকে চেনে। তারা জানে, এই ভদ্র-সভ্য ভবঘুরে ছেলেটা আশাপুরের যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়—কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও সাইকেলে। ছেলেটা আশাপুরের খবর রাখে, খেয়াল রাখে। ছেলেটা বলতে গেলে আশাপুর পাহারা দেয়।

সত্যি, ছেলেটা খুব মিস্টিরিয়াস। কোথা থেকে উড়ে এসে ও জুড়ে বসেছে আশাপুরে। আর তারপর...আশাপুরকে ধীরে-ধীরে ভালোবেসে ফেলেছে। আশাপুরের ভালোমন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে।

তা যদি না-ই হবে, তা হলে ও কেন পলানের সব দু-নম্বরি কাণ্ডকারখানা দেখে বাধা দেয়, প্রোটেস্ট করে? পলান আর ওর দলবল আশাপুরে যে-হুকুমত কায়েম করেছে সেটা আশাপুরের মানুষজন মুখ বুজে মেনে নিলেও রোশন সেটা মানতে পারছে না। তাই বারবার ও বিপদে পড়ছে, আর পলানের কাছে ও অসহ্য হয়ে উঠেছে।

না, আশাপুরের লোকজন তো পলানের খারাপ কাজগুলো মুখ বুজে মেনে নেয়নি! রোশন যখন সেসব কাজের প্রতিবাদ করেছে তখন তো তাদের অনেকেই রোশনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে!

এই পাশে এসে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে সংখ্যায় বাড়াতে হবে।

সন্ধের রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছিল রোশন। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো তেমন নেই, তবে রাস্তার ওপরের ছোটখাটো দোকানপাটগুলো তাদের আলো দিয়ে সেই ঘাটতি মিটিয়ে দিয়েছে। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। বর্ষার বৃষ্টি। রাস্তার নানান জায়গায় জল জমে আছে। রাস্তার সেই জলে দু-একটা বালব বা টিউবলাইটের ছায়া দেখা যাচ্ছে। জলের মধ্যে কিছু একটা ছিটকে এসে পড়লেই সেইসব আলোর ছায়াগুলো ভেঙেচুরে যাচ্ছে।

অলসভাবে সাইকেল চালাতে-চালাতে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। আধা গ্রাম আধা টাউনের সন্ধেবেলার পরিবেশ যেমনটি হয়, ঠিক তেমনটিই বলা যায়। তবে একটা তফাত রোশনের নজরে পড়েছে। সন্ধের পর ইয়াং ছেলেদের যেসব আড্ডা সাধারণত চোখে পড়ে সেসব জটলা বা আড্ডা রোশনের চোখে পড়েনি। আশাপুরের বেশ একটা বড় এলাকা জুড়ে একমাত্র আড্ডার উদাহরণ হল পলানের ঠেক—'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর সামনের ফুটপাথে।

ব্যাপারটা রোশনকে বেশ অবাক করেছিল, কারণ, সন্ধের পর আড্ডা জিনিসটা গ্রাম বা শহরের রোজকার জীবনযাত্রার একটা স্বাভাবিক কম্পোনেন্ট। আশাপুরের জীবনযাত্রায় সেই জিনিসটার অভাব সত্যিই চোখে পড়ার মতো।

একটা মাস আশাপুরে কাটতে না কাটতেই ব্যাপারটা ওর নজরে পড়েছিল। আর এটাও নজরে পড়েছিল যে, বেশ কয়েকটা দোকানের সামনে বা কোনও পাকা বাড়ির রোয়াকে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদের হাসি-ঠাট্টা-আড্ডা দিব্যি চলছে।

একদিন সন্ধেবেলা গেস্টহাউসে বসে বিশ্বরূপদার সঙ্গে গল্প করতে-করতে কথাটা জিগ্যেস করেছিল রোশন।

বিশ্বরূপ তখন একটা প্লাস্টিকের বাটিতে মুড়ি নিয়ে খাচ্ছিলেন। তেল দিয়ে মাখা মুড়ি, সঙ্গে কুচো পেঁয়াজ আর লঙ্কা। বিশ্বরূপের চোখেমুখে তৃপ্তি ফুটে উঠেছিল। আঃ! এর চেয়ে ভালো কিছু আর হয় না।

রোশন বিশ্বরূপ জোয়ারদারের কাছে এসে বসামাত্রই বিশ্বরূপ ওকে তেল-মুড়ি শেয়ার করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

তাই ওঁরা দুজনে এ-কথা সে-কথা বলছিলেন আর মাঝে-মাঝে মুড়ির বাটিতে হাত ডোবাচ্ছিলেন।

কথায়-কথায় রোশন হঠাৎই জিগ্যেস করে বসল, 'আচ্ছা, বিশ্বরূপদা, একটা কথা বলুন তো। আমি এই যে রোজ আশাপুরে ঘুরে বেড়াই, কোথাও ইয়ং ছেলের দলবলকে আড্ডা-ফাড্ডা মারতে দেখি না তো!' একমুঠো মুড়ি মুখে ঢোকাল রোশন, চিবোতে-চিবোতে বলল, 'অবশ্য পলানদাদের গ্যাংটা ছাড়া। ওরা তো রোজই সকাল-সন্ধে ওই ''জনপ্রিয়'' মিষ্টির দোকানের সামনে বসে গ্যাঁজায়, গুলতানি মারে...।'

বিশ্বরূপ জোয়ারদার মুখের মধ্যে ঠাসা মুড়িকে চিবিয়ে ম্যানেজ করছিলেন। সেই অবস্থাতেই মুখটা হাসি-হাসি করার চেষ্টা করে ইশারায় একটু সময় চাইলেন।

একটু পরে মুড়িটা কবজা করে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই খেয়াল করেছ। আশাপুরে বুড়োদের আড্ডা চোখে পড়লেও অল্পবয়েসি ছেলেপিলেদের আড্ডা তোমার চোখে পড়বে না। ছেলেরা সকালে স্কুল-কলেজে যায়, বিকেলে খেলাধুলো করে—তারপর যে-যার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। নো আড্ডা। ওরা বাড়িতে বসে এর-তার সঙ্গে ফোনে কথা-টথা বলতে পারে, কিন্তু সামনাসামনি আড্ডা অ্যালাউ না...।'

'অ্যালাউ না মানে?' রোশন বেশ অবাক হয়ে প্রশ্নটা করেছিল।

'অ্যালাউ না মানে পলান নস্করের অর্ডার।' কথাটা বলে বিশ্বরূপ মুড়ির বাটিতে হাত ডোবালেন। রোশন তখনও চোখে প্রশ্ন নিয়ে বিশ্বরূপ জোয়ারদারের মুখের দিকে তাকিয়ে।

কয়েক গাল মুড়ি খেয়ে বিশ্বরূপ একটু সময় নিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, 'আশাপুরে ছেলেপিলেদের আড্ডা যেমন অ্যালাউ না, তেমনই কোনও ক্লাবও অ্যালাউ না। কারণ, ক্লাব মানেই আড্ডা। আমাদের এখানে তাই একটাই ক্লাব : ''আশাপুর উন্নয়ন সংঘ''। পলানের ক্লাব। ওর তোলাবাজিকে অফিশিয়াল চেহারা দেওয়ার জন্যে যেমন ''আশাপুর উন্নয়ন সমিতি'', তেমনই অন্যান্য কাজকর্ম পলান করে এই ''আশাপুর উন্নয়ন সংঘ''-এর কভারে। আশাপুরের যত প্রোগ্রাম হয়, সব করে পলান নস্করের এই ক্লাব।

'পলান লেখাপড়া তেমন না শিখলেও ওর কূটবুদ্ধি মারাত্মক ধারালো। ও এমনিতে প্রচার করে বেড়ায় যে, যেসব ছেলেরা স্টুডেন্ট, পড়াশোনা নিয়ে আছে, আড্ডা জিনিসটা তাদের পক্ষে ভালো নয়। ওরা মন দিয়ে লেখাপড়া করুক, যাতে রেজাল্ট ভালো হয়। এতে আশাপুরের নাম বাড়বে, মুখ উজ্জ্বল হবে...।'

'পলান বলছে এইসব কথা!' রোশনের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়।

'হ্যাঁ, পলান বলছে...' হাসলেন বিশ্বরূপ : 'আরও কী বলছে জানো? ও আশাপুরের সিনিয়র লোকদের এ-কথাও বলে বেড়ায়, ও লেখাপড়া করতে পারেনি বলে লেখাপড়ার মর্ম ও আরও বেশি করে বোঝে। ও চায় আশাপুরে আর কেউ যেন ওর মতন না হয়।'

রোশন একমুঠো মুড়ি মুখে দিল। খেতে-খেতে বলল, 'এ তো পুরো মহাত্মা গান্ধী আর রাজা রামমোহন রায়ের মতো কথা...!'

'তাই না তাই বটে!' হেসে বললেন বিশ্বরূপ, 'আসলে এসব কথার একটা ইনার মিনিং আছে—।'

'ইনার মিনিং?'

'হ্যাঁ, ইনার মিনিং।' বিশ্বরূপ ধীরে-ধীরে বলতে লাগলেন, 'রোশন, মানুষ যখন খোলা হালকা মনে আড্ডা মারে তখন সে সবসময় মনের কথা বলে, নিজের কথা বলে, তার ভাবনার কথা বলে। তাই আড্ডাতে এর ভাবনা ওর কাছে যায়, ওর ভাবনা এর কাছে আসে। নানান মতামত ঘোরাফেরা করে। তারপর কমন মত বা ভাবনাগুলো জোট বাঁধে।

'এবার ধরো, গোটা আশাপুর জুড়ে নানান জায়গায় আড্ডা চলছে। পলানের অরগানাইজ করা গোডাউন ফাইট নিয়ে কথা উঠছে, আলোচনা হচ্ছে। পলানের তোলাবাজি নিয়ে অনেকে আপত্তি তুলছে, সেসব বন্ধ করার কথা বলছে। এইরকম আরও অনেক কিছু...।

'ধরো, এইরকম সব আড্ডা হতে-হতে ধীরে-ধীরে পলানের এগেইনস্টে একটা জোট তৈরি হল। তখন সেই জোটটা পলানের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, আশাপুরের ইয়ং ছেলেমেয়েরা আশাপুরের ভালোর জন্যে পলানের এগেইনস্টে একটা ফোর্স তৈরি করবে।

'সেই ব্যাপারটাই পলান চায় না। তাই পড়াশোনার ক্ষতি হবে এই অজুহাতে আশাপুরের ইয়ং জেনারেশনের আড্ডা গুলতানি বন্ধ। আর নতুন কোনও ক্লাব-টাব তৈরি করাও বন্ধ। এবার বুঝলে ব্যাপারটা?'

রোশন খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিল। মনে-মনে সেদিন পলানের কূটবুদ্ধির তারিফও করেছিল ও।

সাইকেল চালাতে-চালাতে রোশন এসব কথাই ভাবছিল। ভাবছিল আশাপুরের কথা, আশাপুরের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা।

গত কয়েকমাসে পলান নস্করের সঙ্গে যতবারই ওর রাস্তা কাটাকাটি হয়েছে ততবারই একটা ঝঞ্ঝাট বেধেছে। আর এইসব ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা থেকেই আশাপুরের বহু মানুষ রোশনকে চিনে গেছে। অনেকে ওর নাম জানে, আবার অনেকে জানে না। কিন্তু লোকের মুখে-মুখে 'রোশন' নামটা ছড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে ব্যাংকের ওই জেনারেটার নিয়ে ঝামেলার পর রোশনের নামটা চাউর হয়েছে আরও বেশি। একইসঙ্গে পলানের দু-নম্বরি কাজকর্ম আর দুর্নীতি নিয়ে লোকজন হাটেবাজারে, দোকানে, রাস্তাঘাটে খোলাখুলি কথা বলছে। আগে তারা এসব কথা আড়ালে-আবডালে নীচু গলায় বলত।

কিছুদিন ধরে একটা কথা রোশনের মনে হচ্ছিল : আশাপুরে একটা কোনও অনুষ্ঠান করতে পারলে বেশ হয়। এখানে যত অনুষ্ঠান হয় সবই পলানদারা করে। আশাপুরের নাম দিয়ে অনুষ্ঠানগুলো হলেও তাতে পলানদেরই মাতব্বরি থাকে। আশাপুরের লোকজন সেগুলোকে ঠিক নিজেদের অনুষ্ঠান বলে মেনে নিতে পারে না। বরং বেশিরভাগ মানুষই সেসব অনুষ্ঠানকে এড়িয়ে চলে।

শুধু যে বিশ্বরূপ জোয়ারদার রোশনকে এসব কথা বলেছেন তা নয়। সাইকেলের দোকানের বাবুনদা, নিতুদা, রতনমণি মাঝি, সুধীর ডাক্তারবাবু, সবাই একই কথা বলেছে ওকে।

আশাপুরের সর্বজনীন দুর্গাপুজো, কালীপুজো সবই চলে গেছে পলানের হাতে। একমাত্র স্কুলের ছেলেমেয়েদের সরস্বতীপুজো করার ছোট-ছোট চেষ্টাগুলোকে পলান ছাড় দিয়েছে। সেসব পুজোয় পলান দু-পাঁচশো টাকা করে ডোনেশানও দেয়।

রোশনকে রতনমণি বলেছেন, 'আমাদের এখানে দুর্গাপুজো, কালীপুজো খুব জাঁকজমক করে হয়, কিন্তু তুমি পুজো প্যান্ডেলে আশাপুরের মানুষজনকে খুব একটা দেখতে পাবে না। আর যারা প্যান্ডেলে যায় তাদের ফিলিংটা এমন থাকে যেন তারা বাইরের লোক, গেস্ট—অন্য পাড়ার পুজো দেখতে এসেছে...।'

'কিন্তু, রতনদা, পলানদা এই বারোয়ারি পুজোগুলোকে হাতে নিয়েছে কেন? এতে তো হাজাররকম ঝক্কিঝঞ্ঝাট—তাতে পলানদার লাভ কী?'

প্রশ্নটা শুনে রতনমণি মাঝি হেসেছিলেন।

'কী লাভ? শোনো, বুঝিয়ে বলছি। সবথেকে বড় লাভ হল টাকাপয়সা। আর তার পরের লাভ হল নিজের নাম ফাটানো। আশাপুর বা তার আশপাশের অঞ্চলের লোকজন আমাদের সর্বজনীন পুজোগুলোকে বলে পলান নস্করের দুর্গাপুজো, পলান নস্করের কালীপুজো। এইভাবে নিজের প্রচার বাড়াতে-বাড়াতে এমন একটা স্টেজ এসে গেছে যে, আশাপুরের সংস্কৃতি মানেই লোকে এখন পলানকে বোঝে। আর ''আশাপুর উন্নয়ন সংঘ''-এর চিরস্থায়ী সেক্রেটারি হল পলান—অর্থাৎ, আমাদের এলাকার উন্নয়ন মানেই পলান। এইভাবে দিনে-দিনে ও এই অঞ্চলের সমাজসেবী হয়ে উঠেছে। তারপর...' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেসেছেন রতনমণি মাঝি : 'তারপর আর কী! নেক্সট ইলেকশানে পলান হয়তো রুলিং পার্টির ক্যান্ডিডেট হয়ে দাঁড়াবে।'

আশাপুরের এরকম একটা ভবিষ্যৎ রোশন ভাবতে পারছিল না। তবে ও ভালো করেই জানে, ও ভাবতে পারছে না বলে সেটা হবে না, এমনটা কখনও নয়। পলান নস্করের একমাত্র টার্গেট পয়সা ইনকাম করা—তা সে যেভাবেই হোক। এলাকার সর্বজনীন পুজোর দখল, জগন্ময়ী কালী মন্দিরের 'মহাপ্রণামী'-র বাক্স, ব্লাইন্ড ফাইট, এলাকায় তোলাবাজি—সবকিছু তো একই দিকে ইশারা করছে!

নাঃ, কিছু একটা করা দরকার। একটা অন্তত অনুষ্ঠান যেটার পরিচালনায় থাকবে আশাপুরের সাধারণ মানুষ। সেই অনুষ্ঠানে পলান নস্কর আর তার গুন্ডাবাহিনীর দলবল থাকবে নেহাতই দর্শকের ভূমিকায়। কিংবা 'গেস্ট'। মানুষ জানুক, পলানকে বাদ দিয়েও আশাপুরে কোনও অনুষ্ঠান করা যায়।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতেই রোশনের মনে হয়েছিল স্বাধীনতা দিবসের কথা।

জুলাই মাস শেষ হতে আর দিনদশেক বাকি আছে। যদি স্বাধীনতা দিবসে একটা প্রোগ্রামের কথা ভাবা যায় তা হলে তার জন্য তৈরি হওয়ার এখনও অনেক সময় আছে। তা ছাড়া আরও একটা কথা রোশনের মনে হল। আশাপুরে এমন বহু মানুষ আছে যারা পলান আর তার দঙ্গলকে পছন্দ করে না বলে পলানের

কোনও ফাংশানে যায় না। এরকম বেশ কয়েকজন মানুষের কথা রোশনের মনে পড়ছে। যেমন, রতনমণি মাঝি, সুধীর ডাক্তারবাবু, বিশ্বরূপ জোয়ারদার, এ ছাড়া আরও কয়েকজজন। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ তো পলানের কুকীর্তির স্পষ্ট সমালোচনা করেন।

বিশ্বরূপদা ভিতু মানুষ, তাই আড়ালে রোশনের কাছে পলানের ব্যাপারে নিজের চাপা ক্ষোভ উগরে দেন। কিন্তু সুধীর ডাক্তারবাবু তো প্রকাশ্যেই বলেন। জগন্ময়ী কালীমন্দিরে সুবুর ছুরি খেয়ে রোশন যখন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে গিয়েছিল তখন ডাক্তারবাবু তো পাঁচজনের সামনেই স্পষ্ট বলেছিলেন, 'পলানটা বড্ড বেড়েছে।' কথাটা রোশনের এখনও মনে আছে।

তা হলে স্বাধীনতা দিবসে একটা অনুষ্ঠান করলে কেমন হয়? আশাপুরের সব সাধারণ মানুষ আসবে সেই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটা যদি সাকসেসফুল হয় তা হলে পলানদাকে একটা জবাব দেওয়া যাবে। কিন্তু এই অনুষ্ঠান তো রোশনের পক্ষে অরগ্যানাইজ করা সম্ভব নয়। বেস্ট হচ্ছে, ডাক্তার সুধীর পাঠকের মতো একজন মান্যগণ্য মানুষকে একেবারে সামনে রেখে এর আয়োজন করা। তা হলে এলাকার সিনিয়ার মানুষদের পাশে পাওয়া যাবে।

লাস্ট ক'দিন ধরে এই আইডিয়াটাই রোশনের মাথায় ঘুরছিল।

বিশ্বরূপ জোয়ারদারের কাছে রোশন শুনেছে, স্বাধীনতা দিবসে আশাপুর চিলড্রেন্স পার্কে পলান বেশ বড় করে স্টেজ-ফেজ তৈরি করে 'আশাপুর উন্নয়ন সংঘ'-এর ব্যানারে একটা প্রোগ্রাম করে। পার্কে পারমানেন্ট একটা ফ্ল্যাগস্ট্যান্ড রয়েছে। প্রোগ্রামের দিন ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, দড়ি, ফুল সবকিছু দিয়ে ফ্ল্যাগস্ট্যান্ডটাকে রেডি করা হয়। তারপর সকাল দশটায় সেখানে সব মান্যগণ্য লোকজন হাজির হন। তাঁদের মধ্যে মাননীয় লোকাল এম. এল. এ., ওয়ার্ডের কমিশনার থাকেন। আরও থাকেন তাঁদের সঙ্গী বেশ কিছু মানুষ। এ ছাড়া থাকে পলান। সব ব্যবস্থা ঠিকঠাকভাবে করা হয়েছে কিনা পলান তার তদারকি করে আর গুরুত্বপূর্ণ মানুষগুলোর চারদিকে ঘুরে-ঘুরে একনিষ্ঠভাবে চরম মোসাহেবি করে। ওর লেজ নেই তাই, থাকলে হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে এপাশ-ওপাশ নড়ত।

তারপর ফ্ল্যাগ তোলা হয়। স্থানীয় বিধায়ক পতাকা তোলেন। উত্তোলিত পতাকা থেকে ফুল ঝরে পড়ে। চারপাশে 'জয় হিন্দ', 'বন্দে মাতরম' জিগির আর হাততালির ফোয়ারা ছোটে। বিধায়ক মহাশয় পতাকার দিকে মুখ তুলে 'জয় হিন্দ' বলে স্যালুট করেন। তাঁর কাছাকাছি আরও অনেকে সেই জিগিরের প্রতিধ্বনি তুলে স্যালুট করেন। পতাকা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা পলানের চ্যালারা মোবাইল ফোনে পটাপট ছবি তুলতে থাকে।

পরের পর্ব হল বক্তৃতা-পর্ব। মাননীয় অতিথিরা স্টেজে ওঠেন। স্টেজে সাজিয়ে রাখা অনেক চেয়ার। পলান প্রত্যেককে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

প্রথমে ফুলের মালা দিয়ে বরণ। তারপর বক্তৃতা শুরু। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, মাননীয় অতিথিদের বক্তৃতার পর সবার শেষে শুরু হয় পলান নস্করের বক্তৃতা।

পলানের বক্তৃতার কথা বলতে গিয়ে বিশ্বরূপদা কিছুতেই আর হাসি চাপতে পারছিলেন না।

'তোমাকে কী বলব, রোশন—পলান একে তো আকাট মুখ্যু, তার ওপর স-স উচ্চারণ। ওর বক্তৃতার কিছু স্ট্যান্ডার্ড লাইন হল : ''মঞ্চে উপস্থিত সম্মানিত গেস্টদের নমস্কার আর প্রণাম জানাই। ভারত যেমন পনেরো আগস্ট স্বাধীনতা পেয়েছে, তেমনই আমাদের জন্মভূমি আসাপুরও পনেরো আগস্ট স্বাধীনতা পেয়েছে। আমাদের সম্মানীয় বিধায়ক মহাসয় ও কমিসনার মহাসয়ের অনুপপেরণায় আমি সেই সুরু থেকে আসাপুরের উন্নয়ন করে চলেছি...।'' তারপর আরও সব হাবিজাবি কথা...।'

অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে যে-গোটা পঞ্চাশেক চেয়ার পাতা থাকে তাতে সামনের সারিতে পলানের দলের লুম্পেনগুলোই বসে থাকে। এ ছাড়া থাকে লোকাল কিছু ছেলেমেয়ে আর বাচ্চাকাচ্চা।

পনেরোই আগস্ট রাতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে পলান। তাতে ওদের দলবল হাজির থাকে। আর থাকে লোকাল চার-ছ'জন ব্যবসায়ী যাদের সঙ্গে পলানের দু-নম্বরি কানেকশান আছে। এই লোকগুলোই এলাকার খুঁটিনাটি খবরাখবর রেগুলার বেসিসে পলানকে সাপ্লাই করে।

মোট কথা, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে পলান বেশ ভালো টাকা খরচ করে।

রোশন এরকম একটা অনুষ্ঠান নিয়ে নানান কথা ভাবছিল। ভাবছিল আর এ-পথে সে-পথে ঘুরছিল। ঘুরতে-ঘুরতে কখন যেন ও সুধীর পাঠকের 'সুনিরাময়'-এর সামনে এসে দাঁড়াল।

ডাক্তারবাবুর চেম্বার 'বন্ধ' হয় সাতটায়, কিন্তু তার দরজা বন্ধ হয় না। সাতটার পর সুধীরডাক্তারের চেম্বারে আড্ডা বসে। ডাক্তারবাবুর টেবিলে খবরের কাগজ পেতে তার ওপরে ঢেলে দেওয়া হয় মুড়ি। সেই মুড়িতে মিশিয়ে দেওয়া হয় বাদাম, চানাচুর আর কিছুটা মুড়কি। পাশে একটা প্লেটে থাকে পেঁয়াজকুচি আর কাঁচালঙ্কা। এর পাশাপাশি ডাক্তারবাবু আনিয়ে নেন একডজন আলুর চপ, বেগুনি আর পেঁয়াজি। সবমিলিয়ে একেবারে রাজকীয় খাবার।

ডাক্তারবাবু চেয়ারে বসে আছেন। আর তাঁর দুপাশে দুটো বেঞ্চিতে চারজন ভদ্রলোক বসে আছেন। একটা বেঞ্চির একপাশে পড়ে রয়েছে চারভাঁজ করা একটা লাটঘাট খাওয়া খবরের কাগজ। তার ওপরে রাখা দু-প্যাকেট তাস। কারণ, কখনও-কখনও এই আড্ডায় অকশন ব্রিজের আসর বসে।

এখন তাসখেলা বন্ধ হয়ে আড্ডা চলছিল, আর তার সঙ্গে মুড়ি-তেলেভাজা।

সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রোশন সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠল। ডাক্তারবাবু ছাড়া বাকি চারজনের মধ্যে একমাত্র রতনমণি মাঝিকে চিনতে পারল ও।

বর্ষার বাতাসে রোশনের চুল উড়ছিল। অন্ধকার আকাশে চাপ-চাপ মেঘ। মনে হচ্ছিল, এই বাতাস বোধহয় মেঘগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে ফুরিয়ে দেবে। ডাক্তারবাবুর চেম্বারের একটু দূরেই বুনো ঝোপ। তার আশেপাশে জল জমে আছে। দু-একফালি আলো এদিক-ওদিক থেকে ছিটকে গিয়ে পড়েছে সেখানে। বোধহয় সেই জমা জলের দিক থেকে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে।

রোশনকে দেখেই রতনমণি প্রথম জিগ্যেস করলেন, 'কী, রোশন, কী খবর?'

রোশন আগে কখনও সুধীরডাক্তারের চেম্বারের এই আড্ডায় আসেনি।

ডাক্তারবাবু রোশনকে দেখে দিলখোলা আওয়াজে জিগ্যেস করলেন, 'কী হে, তোমার পেট কেমন আছে?'

'একেবারে সেরে গেছে, ডাক্তারবাবু...।' রোশন চটপট বলল।

'গুড, ভেরি গুড। তবে একটু সাবধানে থাকবে। পলান তো এলিমেন্ট ভালো না। রাতের দিকে আশাপুরের এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি কোরো না...।'

রোশন ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল। একইসঙ্গে ও ভাবছিল স্বাধীনতা দিবসের কথাটা ও কীভাবে পাড়বে। এই চারজন সিনিয়ার যদি রোশনের আইডিয়াটায় রাজি হয়ে যান তা হলে পায়ের নীচে শক্ত মাটি পাওয়া যাবে।

ওর চোখেমুখে ইতস্তত ভাবটা রতনমণি মাঝি খেয়াল করলেন। তাই আত্মীয়ের গলায় জিগ্যেস করলেন, 'রোশন, তুমি কি কিছু বলতে এসেছ?'

'একটা...একটা কথা ছিল...।' ইতস্তত করে বলল।

'কী-কথা?'

সুধীর ডাক্তারবাবু রোশনকে সহজ করার জন্য হেসে বললেন, 'আরে অত নার্ভাস হচ্ছ কেন? ইয়াংম্যানরা এরকম নার্ভাস হলে চলে! নার্ভাস তো হব আমরা! তুমি আগে বোসো—ওই বেঞ্চিটায় বোসো তো...বসে একটু মুড়ি-তেলেভাজা খাও—।'

রোশন একটা বেঞ্চির একপাশে বসল।

'নাও, এবার বলো...।' রতনমণি ভরসা জোগানোর সুরে বললেন।

রোশন তখন মুখ খুলল, : 'ডাক্তারবাবু...রতনদা...' দুজনের মুখের দিকে একবার করে তাকাল রোশন : 'ক'দিন ধরে আমার মনে হচ্ছে, আশাপুরে একটা প্রোগ্রাম করলে হয়। এই প্রোগ্রামটা আশাপুরের সবার জন্যে। প্রোগ্রামটার সামনের সারিতে থাকবেন আপনারা। আর আমরা ছোটরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাপোর্ট দেব। আপনারা গাইড করবেন, আমরা কাজ করব...।' রোশনের চোখেমুখে আবেগের ছায়া পড়ছিল। ও হাত নেড়ে বলল, 'আমি শুনেছি, আশাপুরের যে-কোনও প্রোগ্রাম নাকি পলান নস্কর করে। ও একাই বারবার নানান প্রোগ্রামের বন্দোবস্ত করে। আর আশাপুরের বাকি মানুষরা চুপচাপ সেসব দ্যাখে, সহ্য করে।' রতনমণির দিকে তাকাল : 'রতনদা, আপনি প্রথম আলাপের দিন আমাকে বলেছিলেন না, ''...আমরা সহ্য করার ট্রেনিং নিয়ে-নিয়ে অসহ্য জিনিসও সহ্য করতে শিখে গেছি।'' আমি চাই আমাদের সহ্য করার অভ্যেসটা এবার অসহ্য হোক...।'

রতনমণি মাঝি, ডাক্তার সুধীর পাঠক আর বাকি তিনজন বয়স্ক মানুষ রোশনের কথা শুনছিলেন। শেষের তিনজন রোশনকে আগে কখনও দেখেননি, তবে ওর নাম শুনেছেন। জগন্ময়ী কালীমন্দিরের 'মহাপ্রণামী'-র বাক্সের ঘটনার কথা ওঁরা জানেন। ব্যাংকের জেনারেটারের এপিসোডটাও ওঁরা বিশদে শুনেছেন। তিনজনের মধ্যে দুজন শুনেছেন যে, পাঁচটা ছোট-ছোট বাচ্চা ওদের 'রোশনকাকু'-কে বাঁচাতে পলানের দুজন সশস্ত্র গুন্ডার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

রোশনের কথা শুনে রতনমণি মাঝি কী বলবেন ভাবছিলেন। সুধীরডাক্তারের ফরসা কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে।

তিনজন বয়স্ক মানুষের মধ্যে একজনের বয়েস প্রায় পঁচাত্তর কি ছিয়াত্তর হবে। রোগা চেহারা। পরনে আধময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। লেন্সের মধ্যে দিয়ে তাকালে চোখগুলো বড়-বড় দেখায়। গায়ের রং ঘোর কালো। মাথার চুল ধবধবে সাদা। ভদ্রলোকের নাম অবনীনাথ পাত্র। একটা সময়ে স্কুলে পড়াতেন। এখন বাড়িতে একটা কোচিং ক্লাস চালান। এলাকার সকলে ওঁকে 'মাস্টারমশাই' বলে ডাকেন। খুব বয়স্ক দু-চারজনের কাছে তিনি 'অবনীমাস্টার।'

তিনি হঠাৎ মুখ খুললেন, 'এ তো অতি উত্তম প্রোপোজাল। স্বাধীনতা দিবসটা ঠিকঠাক করে সেলিব্রেট করলে আমরা যে স্বাধীন সেটা ভালো করে টের পাওয়া যায়। কী বলো, সুধীর? কী বলো, রতন?'

রতনমণি মাঝি একটু ইতস্তত করে বললেন, 'একই এলাকায় দু-দুটো ইনডিপেনডেন্স ডে-র প্রোগ্রাম...ব্যাপারটা কি ভালো দেখাবে? মানে...।'

অবনীমাস্টার একটা হালকা গালাগাল দিয়ে বলে উঠলেন, 'কেন ভালো দেখাবে না, রতন? স্বাধীনতা দিবস কি পলান নস্করের বাপের সম্পত্তি নাকি?'

মাস্টারমশাইয়ের কথা বলার ঢঙে রোশন হেসে ফেলল। খুশিও হল মনে-মনে।

সুধীরডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ, ইনডিপেনডেন্স ডে-টা সেলিব্রেট করাটা খুব জরুরি। পলানকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, আশাপুরের মানুষরা স্বাধীন।'

রতনমণি মাঝি আর বাকি দুজন বয়স্ক মানুষও কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর সুধীরডাক্তারের কথায় সায় দিলেন।

রোশনের মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি ফুটে উঠল।

ঠিক তখনই কালো আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল।

আজ ১০ আগস্ট। তারিখটা রোশনের মনখারাপ-করে-দেওয়া তারিখ। কারণ, আজকের দিনটাতে কুশান চলে গিয়েছিল। সকালে রোজকার মতো পুজোয় বসার পর থেকে কুশান যেন ওর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর একইসঙ্গে নানান কথা বলছে।

মাঝে-মাঝেই চোখে জল এসে যাচ্ছিল রোশনের—কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছিল না। কোনও কাজেই আজ মন লাগছিল না ওর। বারবার মনটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল।

আজ সকাল থেকেই আকাশে মেঘ। কখনও-কখনও টুপটাপ কি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। থামছে, আবার হচ্ছে।

রোশনের কোনও ছাতা নেই, তাই ছাতা নিয়ে বেরোনোর কোনও প্রশ্নই নেই। ন'টার আশেপাশে বৃষ্টি যখন ধরেছিল তখন ও সাইকেল নিয়ে লজ থেকে বেরিয়েছিল। প্রথমে ও 'মোহন সুইটস'-এ গিয়েছিল। সেখানে রোজকার মতো লুচি-তরকারি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছে। খেতে-খেতে ও হঠাৎ খেয়াল করল এ-কথা সে-কথা ভাবতে-ভাবতে কখন যেন ও কুশানের কাছে পৌঁছে গেছে এবং কুশানের কথা ভাবতে শুরু করেছে। আজ সকাল থেকে বারবার এই ব্যাপারটাই হচ্ছে : যে-কোনও ভাবনার সূত্র ধরে কুশানে ফিরে আসা। ওর মনে হচ্ছিল, কুশান এখনও যেন ওর সঙ্গে-সঙ্গে রয়েছে। সাইকেল চালানোর সময় কেরিয়ারে কুশানের ওজন টের পাচ্ছে ও। কুশানের কথাও শুনতে পাচ্ছে।

'মোহন সুইটস' থেকে বেরিয়ে বাবুনদার সাইকেলের দোকানের দিকে রওনা হল রোশন। বাবুনদাকে সাইকেলের ভাড়ার টাকা দেওয়া বাকি আছে। তা ছাড়া ওর নিজের জন্য গাড়ি চালানোর কাজ যদি একটা পাওয়া যায়, সে-কথাও বলবে। একটা কাজ-টাজ করে কিছু টাকা হাতে আসা দরকার।

তিনটে ছেলে উলটোদিক থেকে হেঁটে আসছিল। বয়েস কুড়ি-বাইশ গোছের হবে। একটি ছেলে মাথায় বেশ লম্বা—সামনের তিনটে দাঁত উঁচু, বাকি দুজন মাঝারি হাইটের। তিনজনেরই গায়ের রং ময়লা।

লম্বা ছেলেটি হাতের ইশারায় রোশনকে সাইকেল থামাতে বলল। একইসঙ্গে 'রোশনদা—' বলে ডাকল।

রোশন সাইকেল থামাল। একটা পা রাস্তায় ঠেকাল, অন্য পা-টা প্যাডেলে। লম্বা ছেলেটার মুখটা ওর যেন একটু চেনা-চেনা লাগল।

ছেলে তিনটে ওর সাইকেলের কাছে এসে দাঁড়াল। লম্বা ছেলেটা প্রথম কথা বলল, 'অ্যাই রোশনদা, তুমি কিন্তু ব্যাংকের কেসটায় পলানদাকে হেভি ঝটকা দিয়েছ...।' তারিফ করার একগাল হাসি মুখময় ছড়িয়ে দিল ছেলেটা।

রোশন ভুরু সামান্য উঁচিয়ে বলল, 'ঝটকা মানে? কীসের ঝটকা?'

লম্বা ছেলেটা কোনও জবাব দেওয়ার আগেই দ্বিতীয় একজন বলে উঠল, 'ওই যে, ''সেন্ট্রাল ব্যাংক''-এর জেনারেটারের কেসটা নিয়ে কিছুদিন আগে যে-ক্যাচালটা হল! তুমি রোশনদা পলানদাকে একেবারে সাইজ করে দিয়েছ।'

রোশন কথাগুলো শুনে মোটেই খুশি হল না। ও পলানকে ঝটকাও দেয়নি, সাইজও করেনি। ও শুধু একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহস করে রুখে দাঁড়িয়েছে। ওর ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে, আশাপুরের অনেক মানুষ সেই সময়ে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এমনকী পাঁচটা ছোট বাচ্চা ছেলেও।

ও শান্ত গলায় বলল, 'তোমরা ভুল বুঝেছ—আমি পলানদাকে কিছুই করিনি। ওর ছেলে দুটো ওখানে অন্যায় করছিল বলে প্রোটেস্ট করেছিলাম। আমি তো শুধু শুরুটা করেছিলাম—তারপর তো তোমরা সবাই মিলে যা করার করেছ...।'

লম্বা ছেলেটার মুখে গর্বের ছাপ ফুটে উঠল। ও বলল, 'হ্যাঁ, রোশনদা, আমি সেদিন স্পটে ছিলাম...।'

ছেলেটার মুখটা এবার হালকাভাবে মনে পড়ল রোশনের। ও পিছনের সারির কৌতূহলী জনগণের মধ্যে ছিল, কিন্তু সাহস করে সামনের সারিতে এগিয়ে এসে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেনি।

ছেলেটি সে-কথা বলল না। রোশনের বলা 'তোমরা সবাই মিলে'-র মধ্যে মনে-মনে নিজেকে সামিল করে নিল। ওর সঙ্গী দুজনও একই ভাবনা ভাবছিল। কিন্তু ওরা সেদিন স্পটে ছিল না—ছিল না বলে এই মুহূর্তে ওদের আপশোশ হল।

রোশন বলল, 'অন্যায় দেখলে প্রোটেস্ট করা দরকার। সবসময় সবাই প্রোটেস্ট করতে পারে না, কারণ অনেক সময় প্রোটেস্ট করতে গেলে মনের ভেতরে ভয় কাজ করে। ওই ভয়টাকে হারাতে পারাটাই হচ্ছে আসল...।'

জগন্ময়ী কালীমন্দিরের গন্ডগোলের ঘটনাটা যেমন খুব তাড়াতাড়ি গোটা আশাপুরে ছড়িয়ে পড়েছিল তেমনই ব্যাংকের গোলমালের ঘটনাটাও লোকের মুখে-মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। গত দু-সপ্তাহে রোশন এটা খুব ভালোভাবেই টের পেয়েছে।

রোশন লম্বা ছেলেটিকে জিগ্যেস করল, 'তোমাদের কি মনে হয় পলান নস্কর আশাপুরে যা করছে ঠিক করছে?'

ছেলে তিনটে বেশ এক্সাইটেড হয়ে পড়ল। তিনজনেই একসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে কথাগুলো হিজিবিজি হয়ে গেল। তারপর নিজেদের সামলে-সুমলে লম্বা ছেলেটি কথা বলল। কথাগুলো ওর একার নয়, ওদের তিনজনেরই কথা।

পলান ওদের কোনও ক্লাব তৈরি করতে দেয় না। পার্কে বা রোয়াকে বসে আড্ডা মারতে দেয় না। ওরা আলাদা করে কোনও ফাংশান করতে পারে না। হ্যাঁ, এ ব্যাপারে ওদের মনে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে।

রোশন তখন বলল, 'সবকিছু পালটে যাবে—যদি আমরা সবাই একজোট হয়ে একসঙ্গে ভাবি...।'

ওদের তিনজনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওদের মুখ দেখে বোঝা গেল রোশনের কথাটা ওরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে।

'শুনেছ তো, ফিফটিনথ আগস্ট আমরা সবাই মিলে ফ্ল্যাগ তুলছি। ''সেন্ট্রাল ব্যাংক''-এর উলটোদিকের মাঠটায়—মানে, প্রাইমারি স্কুলের মাঠে আমাদের প্রোগ্রাম হবে। আমাদের মানে আশাপুরের সবার। অবনী মাস্টারমশাই আর সুধীর ডাক্তারবাবু এই প্রোগ্রামটার দায়িত্ব নিয়েছেন। সঙ্গে আমরা সবাই আছি—তোমরাও আছ। সেদিন সকাল ন'টায় মাঠে আসবে কিন্তু!'

ওদের একজন জিগ্যেস করল, 'কেন, এবার পলানদার প্রোগ্রাম হচ্ছে না? চিলড্রেন্স পার্কে?'

'সেটা বলতে পারব না, তবে আমাদেরটা হচ্ছে। তোমরা খবরটা মুখে-মুখে ছড়িয়ে দিয়ো। কেউ আরও খবর জানতে চাইলে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে সাতটার পর যেতে বোলো...নয়তো মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে।'

ছেলে তিনজন খুশি-খুশি মুখ নিয়ে রোশনের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের মুখ দেখে রোশনের ভালো লাগল। একইসঙ্গে ও কুশানের মুখটা দেখতে পেল। কুশান হাসছে। বলছে, 'দাদা, দেখিস, প্রোগ্রামটা হেব্বি হবে!'

আনন্দে রোশনের চোখে জল এল। ও আকাশের দিকে তাকাল। সেখানে চাপ-চাপ মেঘ। কালো-কালো একঝাঁক বাচ্চা ছেলে যেন কারও বকুনি খেয়ে গাল ফুলিয়ে বসে আছে। এখুনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে।

রোশন সাইকেল নিয়ে আবার রওনা হল। এবার বাবুনদার দোকান।

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানটার কথা আলোচনা করে রোশনের একটু ভালো লাগছিল। অনুষ্ঠানটা নিয়ে কুশানের উৎসাহও ও যেন টের পেল মনে-মনে। আকাশের গালফোলা বাচ্চাগুলোর দিকে আবার তাকাল। ফিসফিস করে বলল, 'তোরা কাঁদিস না। জানিস না, দুঃখের পেছনে সবসময় সুখ লুকিয়ে থাকে!'

এই কথাটা বাবা সবসময় বলতেন। তখন ওরা বলতে গেলে প্রায় প্রতিটি দিনই অভাব আর কষ্টের মধ্যে কাটাত। কিন্তু তারই মাঝে বাবা নানান মজা করে ওদের হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করতেন। সত্যি, মানুষটার মনের জোর ছিল অসাধারণ! বাবার কথা ভেবে মনটাকে ঠিকঠাক করতে চাইল রোশন।

বাবার কথা ভাবতে-ভাবতে সুধীরডাক্তারবাবুর কথা মনে পড়ল। তারপর মনে পড়ল রতনমণি মাঝি আর অবনীমাস্টারমশাইয়ের কথা। ওঁরা সিনিয়াররা পাঁচ-সাতজন মিলে ঠিক করেছেন পনেরোই আগস্টের অনুষ্ঠানটা হবে প্রাইমারি স্কুলের মাঠে—যে-মাঠে রোশন ববিন, পিনু, মুনিয়াদের ফুটবল প্র্যাকটিস করায়। অনুষ্ঠানের খরচ চালাতে ডাক্তারবাবু তিনহাজার টাকা ডোনেশন দিয়েছেন। অবনীনাথ আর রতনমণি দিয়েছেন

একহাজার টাকা করে। আলোচনা করে এটা ঠিক হয়েছে যে, কারও কাছ থেকে চাঁদা চাওয়া হবে না—নিজের ইচ্ছেয় যে যা দেবে তাই নেওয়া হবে। রোশন নিজে দুশো টাকা ডোনেট করেছে। ডাক্তারবাবু ওর টাকাটা নিতে চাননি কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোশনের জেদের কাছে হেরে গেছেন।

রোশন এই প্রোগ্রামটার কথা সবাইকে জানাচ্ছিল। আলোচনা করে সুধীর ডাক্তারবাবুরা এটা ঠিক করেছেন যে, এই অনুষ্ঠানটার কথা মুখে-মুখে সকলের কাছে প্রচার করতে হবে, সবাইকে পনেরোই আগস্ট সকাল ন'টায় প্রাইমারি স্কুলের মাঠে আসার জন্য বলতে হবে। তবে পলান বা তার দলবলকে এ-বিষয়ে কিছুই বলা হবে না।

'হুইসপারিং ক্যাম্পেইন'-এর মতো রোশনদের অনুষ্ঠানের প্রচার চলছিল। রোশনের মুখ থেকে এই অনুষ্ঠানটার কথা শুনে অনেকেই যেচে চাঁদা দিয়েছেন। যেমন, হাইরোডের চায়ের দোকানের যোগেনদা পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন। 'আশাপুর লজ'-এর বিশ্বরূপ জোয়ারদার পাঁচশো টাকা দিয়েছেন। তারপর বাবুনদা, 'মোহন সুইটস'-এর মালিক ওঁরাও দুশো টাকা করে চাঁদা দিয়েছেন। বারোনম্বর বস্তির অনেকেই দশ টাকা করে চাঁদা দিয়েছে। নিতুদা দিয়েছে কুড়ি টাকা। রোশনের মনে হচ্ছিল, চাঁদা দিয়ে আশাপুরের সাধারণ মানুষ তাদের মনের চাপা ইচ্ছেটাকে জানান দিচ্ছিল।

অনুষ্ঠানটার কথা শুনে সবাই যে নিজের থেকে চাঁদা দিচ্ছিল এটা রোশনের ভালো লাগছিল। ওর ভেতরে একটা খুশির ঢেউ উথলে উঠছিল। সাইকেল চালিয়ে যেতে-যেতে কুশানের দুঃখ কিছুটা যেন কমে গেল বলে মনে হল ওর।

একসময় বাবুনদার দোকানে পৌঁছে গেল রোশন। প্রথমে সাইকেলের ভাড়ার টাকা মেটাল। তারপর বাবুনদাকে গাড়ি চালানোর কাজের কথা বলল। আগেও বাবুনদাকে কাজের কথা বলেছে ও, কিন্তু বাবুনদা সেরকম কোনও পজিটিভ খবর দিতে পারেননি। পেলে বিশ্বরূপ জোয়ারদারের মোবাইলে নিশ্চয়ই ফোন করে জানাতেন।

বাবুনদার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর রোশন রওনা হল রতনমণি মাঝির স্টেশনারি দোকানের দিকে। সেখানে রতনদার সঙ্গে কথা বলার পর ও যাবে অবনীনাথ পাত্রের বাড়িতে। সেখানে কথাবার্তা সেরে ও যাবে সোজা সুধীর ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। অর্থাৎ, এই সিনিয়ার মানুষগুলোর মধ্যে রোশনই হল 'জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা'। পনেরোই আগস্টের অনুষ্ঠানের জন্য যতরকম আয়োজন তার পরিকল্পনা সিনিয়াররা করলেও আয়োজন আর তদারকির পুরোভাগে রয়েছে রোশন, ওর সঙ্গে রয়েছে বারো নম্বর বস্তির নিতুদা, 'আশাপুর লজ'-এর বিশ্বরূপ জোয়ারদার, এ ছাড়া আরও আছে এলাকার দু-চারজন অল্পবয়েসি ছেলে—যারা পলানের কাজ পছন্দ করে না।

যেমন করে হোক, এই অনুষ্ঠানটাকে সাকসেসফুল করতেই হবে।

রোশনের বুকের ভেতর থেকে কুশান যেন বলে উঠল, 'দাদা, তুই পারবি—।'

□

সকালের মেঘ গড়িয়ে-গড়িয়ে দুপুর হল, তারপর দুপুর থেকে বিকেল। কিন্তু আকাশের মেঘ ক্রমশ পেখম মেলে বিকেলটাকে একেবারে সন্ধে করে দিয়েছে।

রোশনের মনখারাপ ভাবটা মেঘের মতোই ছড়িয়ে গিয়েছিল বুকের ভেতরে। কুশানের মুখটা ভেসে উঠছিল বারবার।

আনমনাভাবে সাইকেল চালাতে-চালাতে রোশন কখন যেন চলে এল কলাবতীর তীরে।

এখন বর্ষার সময়। তাই শীর্ণ নদী গায়েগতরে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু খেয়াঘাটের বাঁশের মাচা এখনও জলের ওপরেই রয়েছে। তবে খেয়াঘাটে পৌঁছোনোর জন্য একগোছা বাঁশ বেঁধে সরু সাঁকো তৈরি করা হয়েছে—

তার সঙ্গে রয়েছে বাঁশের রেলিং।

ঘাটে দুটো নৌকো বাঁধা রয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনও মানুষজন চোখে পড়ছে না। কোনও আলোও জ্বলছে না। বিকেল পাঁচটায় শেষ খেয়া চলে গেছে।

ঘাটে নামার শুরুতে দুটো বাঁশের ডগায় যে-দুটো বালব রোশন আগে দেখেছিল তার মধ্যে একটা জ্বলছে, আর-একটা বোধহয় কেটে গেছে। মনে হচ্ছিল, জ্বলন্ত বালবটা একচোখ দিয়ে রোশনকে দেখছে। ওটার তেরছা আলো ছিটকে আসছিল রোশনের দিকে।

এলাকার লোকজনের মুখে রোশন শুনেছে এই খেয়াঘাটটাকে নাকি ঢেলে সাজানো হবে। এমনভাবে খেয়াঘাটটাকে নতুন করে তৈরি করা হবে যে, সবার একেবারে তাক লেগে যাবে। সেইসঙ্গে এ-কথাও শুনেছে, গত ছ'বছর ধরেই নাকি এলাকার বাসিন্দারা তাক লেগে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। এ এমন অপেক্ষা যে, চাতক পাখির চোদ্দোপুরুষও হার মেনে যাবে।

ব্লাইন্ড ফাইটের গোডাউনটার দিকে একবার তাকাল রোশন। গোডাউনের খুপরি জানলাগুলো অন্ধকার—সেখানে কোনও আলো জ্বলছে না। আজ বৃহস্পতিবার—সুতরাং কোনও ব্যস্ততা নেই। সব ব্যস্ততা তোলা রয়েছে শনিবারের জন্য।

এখন বৃষ্টি নেই। কলাবতীর দিক থেকে ছুটে আসা জোলো বাতাস রোশনকে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু রোশনের মনে হল, ওর দুঃখে কলাবতীর বাতাস ওকে সমবেদনা জানাচ্ছে।

কলাবতীর পাড়ে খেয়াঘাটের ডানপাশটায় বেশ কয়েকটা বড়-বড় গাছ। তাদের গোড়াগুলো ছেয়ে আছে নালিঘাস আর ডুমুর গাছে। গাছপালার বৃষ্টিভেজা পাতা চকচক করছে।

সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। দুটো ডুমুরগাছ পেরিয়ে সাইকেলটাকে একটা বড় গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড় করাল। তারপর একটা জায়গা বেছে নিয়ে ভেজা ঘাসের ওপরেই বসে পড়ল। জামাকাপড় ভিজলে ভিজুক। মনটাই ভিজে আছে তো জামাকাপড়!

চারপাশে তাকিয়ে দেখল রোশন : দ্বিতীয় কোনও মানুষকে চোখে পড়ছে না।

কলাবতীর দিকে চোখ মেলে একটা ঘোরের মধ্যে বসে রইল। ওর চারপাশে ওর অজান্তে চুপিচুপি অন্ধকার নামছিল। কখনও-কখনও তার সঙ্গে মিশে ছিল মিহি বৃষ্টি।

হঠাৎই হাওয়ার একটা ঝটকা এল। মাটিতে পড়ে থাকা ভিজে গাছের পাতায় কোনও আলোড়ন দেখা গেল না। ওরা মাটি আর জলের টানে আটকে আছে। তবে গাছ থেকে দু-তিনটে পাতা খসে পড়ছিল। সেগুলো হাওয়ার ঝাপটায় এদিক-ওদিক এলোমেলোভাবে উড়তে শুরু করল। ওরা কোথায় গিয়ে পড়বে, মাটি আর জলের টানে কোথায় আটকে যাবে কে জানে!

পাতাগুলোকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ও ভাবল। খসে পড়া, বাতাসে ভেসে যাওয়া, পাতাগুলো কি আর গাছের খবর রাখে? কোনও পাতা কখনও চিরকাল বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না—মাটিতে সেটাকে পড়তেই হবে। কোথাও না কোথাও সেটাকে আটকাতেই হবে। মাধ্যাকর্ষণকে কেউ এড়িয়ে চলতে পারে না।

রোশনও সম্পর্কের মাধ্যাকর্ষণকে এড়িয়ে চলতে পারেনি।

হঠাৎ টর্চের আলো ঝিলিক মারল। সেইসঙ্গে মোটরবাইকের শব্দ।

ও মুখ ফিরিয়ে তাকাল সেদিকে।

দুটো মোটরবাইক উঁচু-নীচু কাঁচা পথ ধরে লাফাতে-লাফাতে আসছে। বাইক দুটোর হেডলাইট জ্বলছে না। তার বদলে দুটো বাইক থেকে টর্চের আলো পড়েছে সামনে। বাইকের সওয়ারিরা জ্বলন্ত টর্চ বাগিয়ে বসে আছে। মাঝে-মাঝে সেই টর্চ নিভে যাচ্ছে। আবার জ্বলছে।

রোশনের মনে হল, ওরা নিজেদের হাজিরা খুব একটা জানান দিতে চায় না। তাই হেডলাইটের বদলে টর্চের আলো।

রোশন চট করে ওর জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ল। একটা বড় গাছের গুঁড়ির আড়ালে চলে গেল। সেখান থেকে নজর রাখতে লাগল।

বাইকে চড়ে এরা কারা? পলানের লোকজন?

ঘাটে নামার বাঁশের সাঁকোর মুখে এসে বাইকদুটো থামল। বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ হল। দুটো বাইক থেকে তিনটে ছেলে নেমে দাঁড়াল। মাথায় কোনও হেলমেটের বালাই নেই। তিনজনের মধ্যে দুজনকে চিনতে পারল রোশন : সুবু আর কানুয়া। তিননম্বর ছেলেটা বেশ লম্বা-চওড়া। ওর ডানহাতের মুঠোয় একটা মেশিন। তবে সেটা ওয়ান শটার না রিভলভার সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

এ সময়ে এরা কী করতে নির্জন কলাবতীর তীরে এসেছে? কোন কুকীর্তির সন্ধানে এরা এসেছে এখানে? কোন মধু লুকিয়ে আছে কলাবতীর তীরে?

রোশন চুপচাপ লক্ষ করতে লাগল। একবার ওর মনে হল, চুপিচুপি এখান থেকে সরে যাবে। কিন্তু তারপরই মনে হল, না, দেখাই যাক না, কী হয়।

কানুয়া আর সুবু পালা করে নদীর দিকে টর্চের আলো ছুড়ে দিচ্ছিল। হঠাৎই দেখা গেল, নদীর দিক থেকে পালটা টর্চের আলো জ্বেলেছে কেউ।

এরপর টর্চের আলো দু-দিক থেকেই পালা করে জ্বলতে-নিভতে লাগল। অভিসারের স্ট্যান্ডার্ড সংকেত।

রোশন অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছোট নৌকো কলাবতীর ঘাটে এসে ভিড়ল। নৌকোটায় কোনও ছই নেই। একজন বইঠা নিয়ে চালাচ্ছে, আর-একজন নৌকোর মাঝামাঝি জায়গায় চুপটি করে বসে আছে।

নৌকো ঘাটে ভিড়তেই কানুয়া আর সুবু বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে চলে গেল নৌকোটার কাছে। আর তিননম্বর ছেলেটা মেশিন হাতে সাঁকোর মুখে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল।

নৌকোয় মাঝামাঝি বসা ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ওর হাতে একটা ছোট চৌকোনা প্যাকেট। পলিথিনে মোড়া— চকচক করছে।

প্যাকেট হাতে ছেলেটা এগিয়ে এল। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কাকে যেন ফোন করল। তারপর পলিথিনের প্যাকেটটা সুবুর হাতে দিল।

সুবু কানুয়ার দিকে তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গে কানুয়া পকেট থেকে মোবাইল বের করে পলান নস্করকে ফোন লাগাল।

'পলানদা, কানুয়া বলছি...।'

'বল—।'

'মাল হাতে এসে গেছে।'

'কতটা আছে বলছে?'

'বলছে, নেট আড়াইশো গ্রাম আছে। হাতে নিয়েও আমার সেরকমই আইডিয়া হয়েছে...।'

'ভাবা যায়! ওইটুকু মালের দাম সালা সাড়ে আট লাখ টাকা!...ঠিক আছে। এবারে চটপট কাজ সেরে স্পট থেকে কেটে পড়।' এ-কথা বলে পলান ফোন কেটে দিল।

নৌকোটা ততক্ষণে রওনা দিয়েছে মাঝনদীর দিকে।

কানুয়া মোবাইল পকেটে রেখে সুবুকে তাড়া দিল : 'সুবুদা, চলো, এবার বাকি কাজটা সেরে জলদি কেটে পড়া যাক...।'

সুবু ঘাড় নেড়ে সায় দিল। ও আর কানুয়া চটপট সাঁকো পার হয়ে ফিরে এল। একটা মোটরবাইকের কাছে গিয়ে ওরা দাঁড়াল। হাতের টর্চদুটো কায়দা করে সিটের ওপরে আড়াআড়িভাবে রাখল। তারপর কানুয়া বাইকের কেরিয়ারে হাত ঢোকাল। একটা লম্বা স্ক্রু-ড্রাইভার আর একটা খালি পলিব্যাগ বের করল। পলিব্যাগটার ওপরে ছাপা লেখা দেখে মনে হয়, প্যাকেটটা কোনও শাড়ি বা জামাকাপড়ের দোকানের হবে।

তারপর যে-কাজটা ওরা শুরু করল সেটা বেশ অবাক করে দেওয়ার মতো।

সাঁকো থেকে হাত আষ্টেক দূরে একটা কাদাটে জায়গায় উবু হয়ে বসে পড়ল সুবু আর কানুয়া। কানুয়া বড় পলিব্যাগটা সুবুর হাতে জমা দিয়ে স্ক্রু-ড্রাইভার বাগিয়ে ধরে মাটি খুঁড়তে লাগল। নরম মাটি—তাই চটপট একটা গর্ত তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। মেশিন হাতে ছেলেটা চারপাশে তাকিয়ে নজর রাখছিল, আর মাঝে-মাঝে সুবু-কানুয়ার দিকে দেখছিল।

দশমিনিটের মধ্যেই একটা গভীর গর্ত তৈরি হয়ে গেল। তখন পলিথিনের ছোট প্যাকেটটা বড় পলিব্যাগে ঢুকিয়ে ভালো করে মুড়ে নিল সুবু। তারপর কানুয়ার সঙ্গে হাত লাগিয়ে প্যাকেটটা ভালো করে গুঁজে দিল গর্তের ভেতরে। এবং গর্তের মুখটা চটচটে কাদা-মাটি দিয়ে জম্পেশ করে ঠেসে দিল।

কাজ শেষ করে ওরা দুজনে উঠে দাঁড়াল। তারপর পালা করে পা ঠুকে জায়গাটাকে এমনভাবে দুরমুশ করে দিল যে, জায়গাটা দেখে সেখানে কোনও গর্ত খোঁড়া হয়েছে এমনটা বোঝার কোনও চিহ্ন রইল না।

এবার কানুয়া পকেট থেকে একটা মাপার ফিতে বের করল—গোল চাকতির ভেতরে লাটাইয়ের মতো গোটানো ফিতে।

সুবুকে কী যেন বলল কানুয়া। সঙ্গে-সঙ্গে সুবু ফিতের একটা প্রান্ত ধরে চলে গেল সাঁকোর প্রথম খুঁটির কাছে। খুঁটি থেকে গর্তের স্পটটার দূরত্ব দেখল কানুয়া। সেটা মোবাইল ফোন বের করে তাতে 'লিখে' নিল। তারপর একটা বড় গাছ দেখিয়ে সুবুকে সেদিকে যেতে বলল। সেই গাছের গুঁড়ি থেকে স্পটটার দূরত্ব নোট করল কানুয়া। দূরত্বটা মোবাইল ফোনে গেঁথে নিল। গাছটাকে ভালো করে আরও একবার দেখল। চিনে রাখল।

রোশন ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারল। দামি জিনিসের প্যাকেটটাকে গর্তে 'কবর' দিয়েছে ওরা। যাতে পরে কখনও এসে স্পটটাকে আবার ঠিকঠাক চিনে নিতে পারে তাই দু-দুটো রেফারেন্স পয়েন্ট থেকে স্পটটার ডিসট্যান্স নোট করে নিয়েছে।

কিন্তু কী আছে ওই প্যাকেটটাতে?

কাজ শেষ করে কাদামাখা হাত প্যান্টে ঘষছিল সুবু আর কানুয়া। স্ক্রু-ড্রাইভারটা পকেটে রেখে কানুয়া পলানকে আবার ফোন লাগাল।

'পলানদা, কাজ কমপ্লিট।'

'দুটো জায়গা থেকে স্পটটার ডিসট্যান্স ভালো করে নোট করে নিয়েছিস?'

'হ্যাঁ, পলানদা—।'

'তা হলে জলদি ওখান থেকে কেটে পড়।'

'আচ্ছা।' বলে রিসেট বোতাম টিপে মোবাইল ফোন পকেটে ঢোকাল কানুয়া।

তারপর ওরা তিনজন দুটো বাইকে চড়ে রওনা দিল। এবারও হেডলাইটের বদলে টর্চলাইট।

রোশন এসব দেখছিল আর ভাবছিল কী করা যায়।

ওরা তিনজন চলে যেতেই রোশন কাজে নেমে পড়ল।

চট করে আগাছার ঝাড়ের কাছে চলে এল ও। একটা জুতসই ডাল দেখে সেটাকে জোরে আঁকড়ে ধরল। তারপর মুচড়ে পেঁচিয়ে সেটাকে ভেঙে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

কয়েকমিনিট পরেই ডালটা ভেঙে চলে এল রোশনের হাতে। সেটা নিয়ে ও একটা বড় গাছের গুঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওর কাছে মাপার কোনও ফিতে নেই, তাই হাতের ডালটা দিয়ে গাছের গুঁড়ির গায়ে জোরে-জোরে ঘষতে লাগল : একটা চিহ্ন তৈরি করা দরকার।

বৃষ্টি ভেজা গাছ, তাই কিছুক্ষণের চেষ্টাতেই একটা ক্ষতচিহ্ন তৈরি হয়ে গেল গাছের গুঁড়ির গায়ে। হ্যাঁ, এই চিহ্নটা দেখেই রোশন এই বিশেষ গাছটাকে চিনে নিতে পারবে। তা সত্ত্বেও গাছটার লোকেশন খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করল ও। এবং সেই মানচিত্রটা মনের মধ্যে গেঁথে নিল।

এবার রোশন আসল কাজ শুরু করল।

সুবু আর কানুয়ার তৈরি করা স্পটের কাছে চলে গেল ও। উবু হয়ে বসে পড়ল। স্পটটা গুলিয়ে না যায় সেজন্য দু-খাবলা মাটি নিয়ে জায়গাটার ওপরে বসিয়ে দিল। একটা খুদে ঢিবি উঁচু হয়ে রইল সেখানে।

রোশন এবার উঠে দাঁড়াল। ছুটে চলে এল চিহ্ন দেওয়া বড় গাছটার কাছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। হুট করে যদি কেউ এদিকটায় চলে আসে! গাছটার গোড়ায় উবু হয়ে বসে পড়ল। হাতের ভাঙা ডালটা দিয়ে জলদি হাতে একটা গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। চটপট—চটপট—চটপট!

গর্তটা ক্রমশ গভীর হতে লাগল। আর মাপেও এমন চওড়া হল যাতে সুবু আর কানুয়ার 'কবর' দেওয়া পলিথিনের প্যাকেটটা সহজেই তার মধ্যে ঢুকে যায়।

রোশন এবার ছুটে চলে গেল কানুয়াদের স্পটের কাছে। ভাঙা ডালটা দিয়ে আবার গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। পলিথিনের প্যাকেটটা তাড়াতাড়ি বের করতে হবে।

গর্ত খুঁড়তে-খুঁড়তে যখন ও প্যাকেটটার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে তখনই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। রোশন আকাশের দিকে একবার তাকাল। তারপর আরও তাড়াতাড়ি হাত চালাল। ডালটা দিয়ে দু-চার দফা খোঁড়াখুঁড়ির পর খাবলা দিয়ে সেই মাটি তুলে নিতে লাগল। তারপর আবার ডালটা চালাতে লাগল শাবলের মতো।

একটু পরেই প্যাকেটটার কাছে পৌঁছে গেল রোশন। থাবা মেরে ওটাকে তুলে নিল। প্যাকেটটা এখন কাদামাটিতে মাখামাখি।

গাছের ভাঙা ডালটা আগাছার ঝোপের দিকে ছুড়ে দিল। তারপর পলিথিনের প্যাকেটটা বাঁ-হাতে নিয়ে ডানহাতে গর্তটা বোজাতে শুরু করল।

মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। এ সময়ে এই বৃষ্টির মধ্যে কেউ যে এদিকে এসে পড়বে সেই চান্স খুবই কম। কিন্তু তবুও রোশনের টেনশন হচ্ছিল—তাই বারবার তাকাচ্ছিল।

গর্তটা বোজানো হয়ে গেলে রোশন তার ওপরে হাত বুলিয়ে মাটিটা সমান করে দিল। তারপর একছুটে চলে গেল ওর তৈরি নতুন গর্তটার কাছে। প্যাকেটটা গর্তে ঢুকিয়ে চটপট মাটি চাপা দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দিল। কাজ হয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে জায়গাটা ভালো করে পরখ করল। হ্যাঁ, পরে কখনও এলে স্পটটাকে সহজেই চিনে নিতে পারবে ও।

রোশনের হঠাৎই হাসি পেল। পলান কিংবা ওর চ্যালারা যখন সুবু আর কানুয়াকে নিয়ে ওই পলিথিনের প্যাকেটটা নিতে আসবে তখন দেখবে ওদের স্পটে মাল নেই : পাখি উড়ে গেছে। পলানের সাড়ে আট লাখ টাকা চোট হয়ে গেছে। তখন ওরা পাগলের মতো এদিক-সেদিক খোঁড়াখুঁড়ি করবে। তাতেও ওটা খুঁজে না পেয়ে পলান প্রথমে ভাববে সুবু আর কানুয়ার জায়গাটা চিনতে ভুল হচ্ছে। তারপর ও যেটা ভাববে সেটা খুব মারাত্মক : ভাববে সুবু, কানুয়া আর তিন নম্বর ছেলেটা পলানের সঙ্গে বৈঠকবাজি করেছে—মালটা গায়েব করে দিয়ে এখন ন্যাকাচৈতন সাজছে।

রোশনের ঠোঁটে আবার হাসির রেখা তৈরি হল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজতে ওর খারাপ লাগছিল না। মাটি মাখা হাত দুটো বৃষ্টির জলে ভিজিয়ে ও প্যান্টে ঘষে হাত দুটো যতটা পারা যায় পরিষ্কার করে নিল।

এবার গেস্টহাউসে ফিরতে হবে।

সাইকেলের কাছে গেল রোশন। বৃষ্টিটা তখন কমে গিয়ে হঠাৎ করেই থেমে গেল। সাইকেলের কাছে যেতে-যেতে এমনিই এপাশ-ওপাশ তাকিয়েছিল। তখনই একটা চকচকে জিনিস ওর চোখ টানল। কলাবতীর ঘাটের অল্প আলোতেও জিনিসটা চকচক করছে।

পায়ে-পায়ে জিনিসটার কাছে এগিয়ে গেল।

জল-কাদার মধ্যে ওটা পড়ে রয়েছে। দেখে একটা ঘড়ি বলে মনে হচ্ছে।

ঝুঁকে পড়ে ওটা হাতে তুলে নিল রোশন। বড় ডায়ালের একটা শৌখিন রিস্টওয়াচ। দেখে বেশ দামি বলে মনে হচ্ছে। হয়তো কারও হাত থেকে খুলে পড়ে গেছে।

এখন এটা নিয়ে কী করবে ও? আশাপুর ফাঁড়িতে জমা দিয়ে দেবে? নাকি এখানেই ফেলে রেখে দেবে?

এমন সময় বাইকের শব্দ শোনা গেল। একটা বাইক গোঁ-গোঁ করে তেড়ে আসছে কলাবতীর ঘাটের দিকে।

রোশন কী করবে ঠিক করে ওঠার আগেই একটা মোটরবাইক গরগর আওয়াজ তুলে হাই স্পিডে এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তার ওপরে লাফাতে-লাফাতে ওর একেবারে ঘাড়ের ওপরে চলে এল।

বাইকের হেডলাইট জ্বলছিল। সেই আলোর তেজ ডিঙিয়ে বাইকে বসা কালো ছায়াটাকে আবছাভাবে দেখতে পেল রোশন। ছায়ার আউটলাইন দেখেই ও বুঝতে পারল, এটা সেই তিন নম্বর ছেলেটা—যে কানুয়া গর্ত খোঁড়ার সময় মেশিন হাতে সুবু আর কানুয়াকে প্রোটেকশন দিচ্ছিল।

মোটরবাইকের হেডলাইটের আলো রোশনের ভেজা জামা-প্যান্টে পড়ে ঠিকরে যাচ্ছিল। হেডলাইটটা ওর শরীরের এত কাছে যে, রোশন তার উত্তাপও টের পাচ্ছিল। তা ছাড়া হেডলাইটের আলোর বৃত্তে রোশনের ঘড়ি ধরা হাতটাও ধরা পড়েছিল।

সপাটে একটা থাপ্পড় এসে পড়ল রোশনের গালে। ছায়াটার লম্বা ডানহাত রোশনের গালের নাগাল পেয়ে গেছে। একইসঙ্গে এক ঝটকায় ঘড়িটা ছিনিয়ে নিল ছেলেটা।



'কী রে সালা, আমার ঘড়িটা ঘোরানোর ধান্দা করছিলি?' রুক্ষভাবে ছায়া-ছায়া ছেলেটা প্রশ্নটা করল।

থাপ্পড় খেয়ে রোশনের মাথা ঝিমঝিম করছিল। ওর বাঁ-গালটা যেন চোখের পলকে জমাট পাথর হয়ে গেছে। এবং সেই পাথরে একটা জ্বালা টের পাচ্ছিল।

বাঁ-গালে হাত চলে গেল রোশনের। হাত বুলিয়ে গালের জ্বালাটা কমাতে চাইল।

বাইকে বসা ছেলেটা তখন নোংরা গালিগালাজে রোশনকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল আর সেইসঙ্গে ওর প্রতি গনগনে রাগ উগরে দিচ্ছিল।

'সালা পাতি চোর! ভদ্দরলোক সেজে আশাপুরে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে! হিরোগিরি করা হচ্ছে! তোর ছাল ছাড়িয়ে রোদ্দুরে টাঙিয়ে দেব। অন্যায় অবিচারের এগেনস্টে রুখে দাঁড়িয়ে বাজারে নাম কিনছিস আর রাতে ঘড়ি হরফ করছিস!'

এতক্ষণ পর রোশন বলল, 'আমি ঘড়ি চুরি করিনি। ওটা কাদার মধ্যে পড়ে ছিল, ব্যান্ডটা চকচক করছিল। তাই হাতে তুলে নিয়ে দেখছিলাম জিনিসটা কী।'

'তুই এই রাত্তিরবেলা কলাবতীর পাড়ে কী করতে এসেছিস?'

রোশন বুঝতে পারল ছেলেটা কী বুঝতে চাইছে। ও বুঝতে চাইছে, রোশন কলাবতীর পাড়ে ওদের প্যাকেট পুঁতে দেওয়ার ব্যাপারটা দেখে ফেলেছে কি না।

রোশন ভেবে পাচ্ছিল না, কী উত্তর দেবে। কোন উত্তরে সন্তুষ্ট হবে ছেলেটা।

'আমি...আমি কলাবতীর তীরে এসে চুপচাপ বসেছিলাম...।' রোশন থতিয়ে-থতিয়ে বলে উঠল।

বাইকে বসা অবস্থাতেই ছেলেটা পকেটে হাত ঢোকাল, একটা রিভলভার বের করে নিয়ে এল। হাতঘড়িটা আর-এক পকেটে ঢুকিয়ে রেখে একটা মোবাইল ফোন বের করল। বুড়ো আঙুলে ওটার কী-প্যাডের বোতাম টিপতে লাগল। ওর চোখের নজর রোশনকে পাহারা দিচ্ছিল।

মোবাইল ফোন কানে চেপে ধরল ছেলেটা। তারপর ওপাশ থেকে 'হ্যালো' শুনতেই কথা বলে উঠল, 'পলানদা, চরকি বলছি..।'

'হ্যাঁ, বল...।'

'রোশন মালটাকে ধরেছি। এখানে কলাবতীর পাড়ে ঘুরঘুর করছিল— যেখানে একটু আগে সুবুদা আর কানুয়া আমাদের সাদা মালটা সাঁটিয়ে গেছে। আমার ঘড়িটা কী করে যেন হাত থেকে খুলে পড়ে গিয়েছিল...।'

চরকির সব কথা শোনার পর পলান বলল, 'মালটা সাঁটানোর জায়গাটা রোশন দেখে ফেলেনি তো?'

'কী করে বলব! জিগ্যেস করলে তো ব্যাটা ''না'' বলবে—।'

'হুঁ। কাল সকালে সুবু আর কানুয়াকে পাঠিয়ে আমি মালটা চেক করিয়ে নেব...।'

'তা হলে কি রোশনকে ছেড়ে দেব? কিন্তু সালার হুলিয়া দেখে তো সন্দেহ হচ্ছে...ব্যাটা আমাদের সাঁটানো মালটা নিয়ে কিছু একটা লটরঘটর করেছে—।'

'শুয়োরের বাচ্চাটাকে ধরে উদোম কেলিয়ে দে।' পলান ক্ষিপ্তভাবে বলল, 'কিন্তু তুই একা ওর সাথে পাঙ্গা নিতে পারবি তো? ব্যাটা খতরনাক মাল...।'

চরকি শব্দ করে হাসল। বলল, 'নো প্রবলেম, পলানদা। আমার সঙ্গে মেশিন আছে...।'

রোশন ওদের কথাবার্তার গতিপথ আগে থেকেই আঁচ করতে পারছিল। চরকির শেষ কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে ও ছুটতে শুরু করল।

কিন্তু কোনদিকে যাবে ও? ওর সামনে জল-কাদা, আগাছার ঝোপঝাড় আর অন্ধকার কলাবতী।

চরকির বাইক যেভাবে রোশনের সামনে দাঁড়িয়েছিল তাতে দৌড়োনোর জন্য কলাবতীর দিকটাই শুধু খোলা ছিল। তাই সেদিকেই ছুট লাগিয়েছে ও।

এদিক-ওদিক ছিটকে পড়া বালবের সামান্য আলো, আর ছোপ-ছোপ গাঢ় অন্ধকার—তারই মধ্যে রোশন এঁকেবেঁকে ছুটছিল। ওর ছোটা দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন কোনও দিগভ্রান্ত অন্ধ মানুষ।

রোশনের আচমকা ছুটে পালানোর ব্যাপারটা সামলে নিতে চরকির কয়েকটা মুহূর্ত লেগেছিল। তারপরই ও বাইকে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। এবং ওর বাইক গর্জন করে রোশনকে তাড়া করেছে। বাইকের হেডলাইটের আলো এদিক-ওদিক ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুটন্ত রোশনকে খুঁজতে লাগল।

রোশন ভাবছিল, চরকি বোধহয় ফায়ার করতে পারে। তাই ও সাপের মতো এঁকেবেঁকে গাছপালার আড়াল রেখে ছুটোছুটি করছিল। আর একইসঙ্গে ওর চোখ সাইকেলটা খুঁজছিল। কোথায় সাইকেলটা? ওটা কোথায় রেখেছিল যেন?

চরকি ফায়ার করেনি, কারণ, ওর মনে হয়েছিল, ফায়ার করলে একটু বেশিরকম শোরগোল হতে পারে। তাই ওর বাইক এদিক-ওদিক এলোমেলোভাবে রোশনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হেডলাইটের আলো 'চোখ'

বুলিয়ে যাচ্ছে গাছপালার ভিজে পাতার ওপরে—জল, কাদা, মাটির ওপরে। হেডলাইটের আলোর ঝলকে ওগুলো যেন ঝলসে উঠছে।

চরকির বাইকটা গর্জন করতে-করতে এমনভাবে এদিক-ওদিক করছিল যে, মনে হচ্ছিল, ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা শিকারকে বাগে না পেয়ে ক্ষুধার্ত বাঘ 'গ-র-র গ-র-র' করছে আর ঝোপঝাড়ের চারপাশে অধৈর্যভাবে পায়চারি করছে।

অবশেষে সাইকেলটা খুঁজে পেল রোশন। কাত হয়ে পড়ে রয়েছে ভিজে ঝরাপাতা আর মাটির ওপরে।

জায়গাটা বেশ অন্ধকার। সাইকেলটা তুলে নিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। চরকির থাপ্পড়টা বেশ জোরে লেগেছে। বাঁ-গালটা এখনও জ্বালা করছে। চরকিকে এড়িয়ে রোশন সাইকেল চালিয়ে এখান থেকে পালাবে কেমন করে? কলাবতীর পাড় থেকে আশাপুরে ঢোকার তো একটাই পথ! আগে হোক, পরে হোক, চরকি ওকে দেখতে পাবেই। তারপর ওর ছুটন্ত সাইকেলকে ধরে ফেলতে বাইকটার কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগবে না।

তারপর?

আবার চরকির হাতে মার খাবে রোশন? এভাবে কি ও মার খেয়েই যাবে? আর প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করবে? সেলফ ডিফেন্স?

রোশনের ভেতরে আর-একটা রোশন হঠাৎ বিদ্রোহ করে উঠল। কেন, কেন ভালোমানুষগুলো শুধু ডিফেন্সের কথা ভাববে? দেব-দেবীরা তো মহান, ভালোমানুষের চেয়েও লক্ষ-কোটি গুণ ভালো। তা হলে তাঁদের প্রায় সবার হাতে অস্ত্র কেন?

রোশনরা চিরকাল শুধু ডিফেন্স করে যাবে, আর পলান বা তার মতো গুন্ডারা অফেন্সের লাইফটাইম ঠেকা নিয়ে বসে থাকবে! না, এ হতে পারে না! দান এবার ওলটানো দরকার—যে করে হোক!

রোশনের ভেতরে একটা অদৃশ্য সুইচ যেন টিপে দিল কেউ।

চরকির মোটরবাইকটা গরগর গর্জন তুলে এপাশ থেকে ওপাশ ছুটে বেড়াচ্ছিল। রোশন হঠাৎই সেই বাইক লক্ষ করে ওর সাইকেলটা ছুটিয়ে দিল।

রোশনের সাইকেল হাউইয়ের মতো ছুটে গিয়ে চরকির বাইকের সামনের চাকায় আড়াআড়িভাবে ধাক্কা মারল। বাইকটা কাত হয়ে পড়ে গেল। এবং গতিজাড্যের জন্য ছেঁচড়ে স্লিপ কেটে গেল ভেজা মাটিতে।

চরকি ছিটকে পড়েছিল। ওর ডানপায়ের গোড়ালিতে কেউ যেন হাতুড়ি পেটা করল। অসহ্য ব্যথা। ওর হাতের মেশিনটা কোথায় ঠিকরে পড়ল কে জানে!

চরকি কিছুক্ষণ পড়ে রইল মাটিতে। ওর মাথা ঘুরছিল, চিন্তার স্রোত গুলিয়ে গিয়েছিল। ও শূন্য নজরে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। দেখতে পাচ্ছিল কালো আকাশ। গাছপালার ছায়া-ছায়া পাতা। সেই গাছের পাতা থেকে ওর মুখে-চোখে টপটপ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছিল।

রোশনের সাইকেলটা শূন্যে একটা ডিগবাজি খেয়েছিল। তারপর গাছপালা আর আগাছার ঝোপের মধ্যে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল। রোশনের ব্যথা সেরকম লাগেনি, আর মাথাটাও ঠিক ছিল। কারণ, ও জানত যে, মোটরবাইকের সঙ্গে ওর সাইকেলের সংঘর্ষ হতে চলেছে—চরকি যেটা জানত না। ফলে রোশনের মন আগে থেকেই একটা সংঘর্ষের জন্য তৈরি ছিল।

সুতরাং রোশন উঠে দাঁড়াল চরকির আগেই। এবং এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে পাগলের মতো একটা হাতিয়ার খুঁজতে লাগল। কিছু একটা! কিছু একটা!

ওই তো! হঠাৎ করে একটা আধলা ইটের টুকরো হাতে পেয়ে গেল ও। অস্ত্র হিসেবে এটা কম কী!

তিন লাফে রোশন ছিটকে চলে এল চরকির কাছে। চরকি তখন উঠে বসার চেষ্টা করছিল। রোশন প্রচণ্ড শক্তিতে আধলা ইটটা চরকির পিঠে বসিয়ে দিল।

'ওঁক' শব্দ করে চরকি সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শরীরটাকে আধপাক ঘুরিয়ে রোশনের প্যান্ট খামচে ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারল।

টাল সামলাতে পারল না রোশন—পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু পড়তে-পড়তেই চরকির মুখ লক্ষ করে ঘুসি চালাল।

ঘুসির অভিঘাতে চরকি পিছনে হেলে পড়ল। কিন্তু চট করে বাঁ-হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে ও শরীরটাকে পুরোপুরি পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রুখে দিল।

রোশন আবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল। তখনই ও চরকির কাত হয়ে পড়ে থাকা বাইকটাকে দেখতে পেল। বাইকের সাইলেন্সার পাইপটা চকচক করছে।

রোশন চোর! রোশন শুয়োরের বাচ্চা! ও সৎ মানুষের ভেক ধরে আশাপুরে হিরোগিরি করে বেড়াচ্ছে!

রাগে শরীরটা গরম হয়ে গেল রোশনের। ডিফেন্স ছেড়ে এবার একটু অফেনসিভ হওয়া দরকার। পলানদা বুঝুক, রোশনের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়া খুব সহজ নয়। পাঙ্গা নিতে গেলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণটা গায়ে লাগতে পারে।

রোশনের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। ও খ্যাপা চিতার মতো চরকির পায়ের ওপরে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর একটা পা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে ওর বডিটাকে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে নিয়ে এল বাইকের কাছে। লম্বা পা ফেলে বাইকটা একলাফে ডিঙিয়ে গেল আর চোখের পলকে চরকির পা-টা চেপে ধরল সাইলেন্সারের গরম ধাতুর গায়ে।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল চরকি। এক প্রবল ঝটকা দিয়ে পা-টা সাইলেন্সার থেকে সরিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু পারল না। রোশন ভয়ংকর শক্তিতে শত্রুর পা-টা সাইলেন্সারের গায়ে চেপে ধরে রইল।

চরকির যন্ত্রণার চিৎকার থামছিল না। ও পাগলের মতো দাপাদাপি করছিল। স্বাধীন পা-টা ছুড়ে রোশনকে লাথি মারার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারলে তো!

চরকি কোনওরকমে উঠে বসতে চেষ্টা করল। হাত বাড়িয়ে রোশনের জামা, চুল খামচে ধরতে চাইল। রোশন একটুও দেরি না করে একটা পাওয়ার পাঞ্চ বসিয়ে দিল চরকির মুখে। চরকির মুখটা পিছনে ছিটকে গেল। রোশন চরকির আহত পা-টাকে মোচড় দিয়ে সেটাকে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরল। তারপর পায়ের পাতাটাকে মোচড় দিয়েই চলল। আর ব্যথা এবং যন্ত্রণার সমানুপাতে চিৎকার করেই চলল চরকি।

একসময় ওর চিৎকার থেমে গেল। শরীর এলিয়ে পড়ল। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেল।

রোশন হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ওর সাইকেলটা খুঁজতে লাগল।

ঠিক তখনই একটা মোবাইল ফোন বাজতে শুরু করল।

চরকির মোবাইল ফোন।

ঝুঁকে পড়ে চরকির পকেট হাতড়ে মোবাইল ফোনটা খুঁজে পেল। ওটা পকেট থেকে বের করে নিয়ে দেখল : পলানের ফোন—ফোনের পরদায় ইংরেজি হরফে ছোট-বড় অক্ষরে 'পলান দা' লেখাটা ফুটে উঠেছে।

রোশন মোবাইল ফোন ব্যবহার না করলেও কী করে ফোন করতে হয় বা ধরতে হয় সেটা ভালোই জানে।

ফোনটা ধরে কিছু বলার আগেই পলানের রাগি গলা শুনতে পেল রোশন।

'ফোন ধরতে এত লেট করছিস কেন? রোশন হারামজাদাটার কী করলি বল...।'

রোশন চুপ করে রইল। কোনও কথা বলল না।

পলান আরও অধৈর্য হয়ে উঠল। ক্ষিপ্ত গলায় কিছু খুচরো গালাগাল দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কী বে, চরকি! চুপ করে আছিস কেন? জিভে ফেভিকুইক সাঁটিয়েছিস নাকি? বল রোশন হারামিটার কী হল? বল!'

রোশন এবার ঠান্ডা গলায় বলল, 'পলানদা, অত চেঁচিয়ো না—হার্টে প্রবলেম হবে। তুমি শিগগির কলাবতীর ঘাটে তোমার পা চাটা কুত্তাগুলোকে পাঠাও—ওরা চরকি আর চরকির মোটরবাইক—দুটোকেই কুড়িয়ে নিয়ে যাবে...।'

রোশনের কথা কেটে পলান চিৎকার করে উঠল, 'রোশন! রোশন!'

রোশন হাসল। তারপর বলল, 'মাইরি, পলানদা! সবকিছু বুঝেও লেডিজের মতো ন্যাকামো কোরো না...।'

'শিগগির বল, চরকিকে তুই কী করেছিস!' পলান পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল আবার, 'তোকে কুচিকুচি করে কলাবতীর জলে ভাসিয়ে দেব!'

'তুমি কিছুই করতে পারবে না, পলানদা—' রোশন ঠান্ডা গলায় বলল, 'তোমার আড়াইশো গ্রাম মাল এখন আমার কবজায়। সুবু আর কানুয়া যেখানে মালটাকে গর্ত করে লুকিয়েছিল আমি সেখান থেকে ওটা বের করে অন্য জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছি। এখন আমি ছাড়া আর কেউ জানে না মালটা কোথায়। আর আমাকে যতই চমকাও বা টরচার করো না কেন, আমার মুখ থেকে তুমি লুকোনো জায়গার খবর কিছুতেই বের করতে পারবে না...।'

'চরকি কোথায়? চরকিকে তুই কী করেছিস বল! বল কী করেছিস!'

'চরকির একটা পা ওর বাইকের গরম সাইলেন্সারে সাঁটিয়ে দিয়েছি। পা-টা পুরো বেগুনপোড়া হয়ে গেছে। এখন ও সেন্সলেস হয়ে বাইকটার কাছে পড়ে আছে। তুমি চ্যালাদের ভেজিয়ে চরকির বডি আর বাইক তুলে নিয়ে যাও...।'

'দাঁড়া, কাল বিশ্বরূপ জোয়ারদারের লজে গিয়ে তোর খবর নিচ্ছি। দেখি কী করে তুই আমার লাখ-লাখ টাকার মাল হজম করিস!'

রোশন আবার হাসল, বলল, 'তুমি বড্ড ছেলেমানুষ, পলানদা। তোমার লাখ-লাখ টাকার মাল আমার কবজায়, আর তুমি বলছ আমার খবর নেবে! বরং তুমি আমার সঙ্গে উলটো-সিধে নকশা করলেই আমি আশাপুরের সব পাবলিককে ডেকে দিনদুপুরে তোমার ওই দু-নম্বরি মাল পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করে দেব। তখন তোমার দোস্ত সুরেন দাসও তোমাকে সেভ করতে পারবে না। তুমি স্ট্রেট গারদে ঢুকে যাবে। সেখান থেকে কবে বেরোবে তার ঠিক নেই। তাই বুঝে-শুনে স্টেপ ফেলো, পলানদা। হাওয়া এখন উলটোদিকে বইছে। কেয়ারফুল!'

কেয়ারফুল! একটা উড়ে এসে জুড়ে বসা অচেনা ছোঁড়া পলানকে বলছে 'কেয়ারফুল'! আস্পর্ধা তো কম নয়!



পরদিন সকাল সওয়া ন'টা নাগাদ রোশন যখন 'আশাপুর লজ'-এর বাইরে এসে রাস্তায় পা রাখল তখন লজের দরজার দু-পাশে তিনটে-তিনটে ছ'টা মোটরবাইক দাঁড়িয়ে।

বাইকগুলোর আকার-প্রকার নানারকমের : কোনওটা নতুন, কোনওটা পুরোনো, কোনওটা আবার একটু বেশি পুরোনো। তবে সবমিলিয়ে যে-বাইকটা চোখে পড়ার মতো সেটার রং লাল, আর মাপেও সেটা বেশ বড়। সেই বাইকের ওপরে বসে আছে পলান নস্কর।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে নিয়মমাফিক ছাদে চলে গেছে রোশন। তারপর ওর ব্যায়াম শুরু করেছে। রেডিয়ো নেই বলে কোনও গান বাজছে না বাতাসে। তাই ব্যায়ামের ছন্দ মেলাতে ওর একটু অসুবিধে হচ্ছিল।

ছাদের উচ্চতায় দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল। চোখে ঘুমজড়ানো আশাপুর বিছিয়ে আছে চারিদিকে। কিন্তু বেলা বাড়লেও তো আশাপুর ঘুমিয়ে থাকে। শত অন্যায়-অবিচার দেখেও জেগে ওঠে না। ফলে অন্যায়ের

উদ্দাম অশালীন নৃত্যনাচন চলতে থাকে।

মনে-মনে একটা লোহার রড উঁচিয়ে ধরল রোশন। 'জয় মা!' বলে সেই রডের বাড়ি বসিয়ে দিল নাচিয়ের পায়ে। ব্যস, নাচ শেষ।

না, নাচ শেষ হবে না। পলান নস্করের নাচন শেষ হলেও কয়েক মাস কি কয়েক বছরের মধ্যেই পলান নস্করের বদলে অন্য কেউ মাথাচাড়া দেবে এবং অন্যায়ের প্রলয়নাচন আবার শুরু করে দেবে। এই নাচ চিরকালের মতো বন্ধ করতে পারে একমাত্র মানুষ—আশাপুরের মানুষ! প্রায় ছ'মাস ধরে রোশন দেখছে তাদের। সবাই না হলেও অনেকেই জেগে উঠেছে এই ছ'-মাসে। মনে-মনে সেই জেগে ওঠা মানুষগুলোকে সেলাম করল রোশন।

গতকাল রাতের কথা মনে পড়ল ওর। চরকিকে অমন ভয়ংকর শাস্তি দিয়ে এখন একটু খারাপ লাগছিল। কিন্তু উপায় নেই। এখন টাফ টাইম। পারমানেন্ট অথবা সেমিপারমানেন্ট ড্যামেজের সময়। এখন সব মোকাবিলাতেই স্থায়ী ছাপ ফেলতে হবে।

এই স্থায়ী ছাপের কথা ভাবতে-ভাবতেই একতলায় নেমেছে ও। বিশ্বরূপদাকে বলে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য লজ থেকে রাস্তায় বেরিয়েছে। আর তখনই ও হাফডজন বাইকের মুখোমুখি হয়েছে। বাইকগুলোর ইঞ্জিন অধৈর্যভাবে গরগর করছে।

পলানের দিকে তাকাল রোশন।

পলানের চোয়াল শক্ত। চোখ সরু। মুখ থমথম করছে। কপালে ঘাম। সেখানে দু-জায়গায় খানিকটা করে চুল লেপটে আছে।

পলানের বাঁ-গালের পেশি খুব সামান্য তিরতির করে কাঁপছে। মাথাটা মাঝে-মাঝে ঝাঁকাচ্ছে—দু-হাত জোড়া অবস্থায় মুখে মশা কিংবা মাছি বসলে লোকে যেভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সেটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করে, সেইরকম।

পলানের পর বাকি মুখগুলোর ওপরে চোখ বুলিয়ে নিল রোশন। পাঁচটা মুখে একটা কমন ফ্যাক্টর খুঁজে পাওয়া গেল : রাগ। মুখগুলোর কয়েকটা চেনা, কয়েকটা অচেনা।

আকাশ থেকে তেরছা রোদ এসে পড়েছে ছ'টা বাইক আর তার আরোহীদের ওপরে। চাকার কাছে লুটিয়ে রয়েছে ছ' সেট ছায়া।

রোশন ভাবছিল, এই বুঝি পলান আর তার চ্যালারা ওদের বাইক থেকে নেমে পড়বে এবং লুকোনো লাঠিসোটা অস্ত্রশস্ত্র বের করে রোশনকে সেই আগের মতো রাস্তায় ফেলে নির্মমভাবে টরচার করবে।

রোশনের চোয়াল শক্ত হল। ওর পেশিগুলো ভেতরে-ভেতরে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হল। চোখের সামনে যেন ছ'জন চরকিকে দেখতে পাচ্ছিল ও।

কিন্তু রোশন যা ভাবছিল সেটা হল না। হলে পর কলাবতীর তীরে মাটির নীচে পুঁতে রাখা সাড়ে আট লাখ টাকা দামের পলিথিনের প্যাকেটটার কথা পলান নস্করকে ভুলে যেতে হত।

'আমার বাইকে উঠে পড়...জলদি!' পলান রুক্ষ গলায় বলল। একইসঙ্গে ওর বাইকের পিলিয়নে ওঠার জন্য রোশনকে ইশারা করে মাথা ঝাঁকাল।

রোশন পায়ে-পায়ে পলানের বাইকের দিকে এগোল। আড়চোখে তাকিয়ে গেস্টহাউসের দরজায় বিশ্বরূপদাকে দেখতে পেল ও। তারপর গেস্টহাউসের দোতলার দিকে একপলক তাকাল। দু-জানলায় দুটো কৌতূহলী মুখ—মানে, মজা দেখতে চাওয়া 'জনগণ'।

পলানের বাইকের পিলিয়নে চড়ে বসল রোশন।

ছ'টা বাইক চলতে শুরু করল। সবার আগে পলানের বাইক, আর তার পিছন-পিছন লাইন দিয়ে বাকি পাঁচটা। ছ'টা বাইকের গরগর আওয়াজ কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। রাস্তার লোকজন আর দোকানিরা চমকে তাকাচ্ছে এই বাইক-মিছিলের দিকে। এটা ওদের চেনা মিছিল।

রোশন একটুও ভয় পায়নি। পলানের বাইকের পিছনের সিটে বসে ও শুধু আঁচ করার চেষ্টা করছিল এরপর কী হতে পারে। এটা শিয়োর যে, পলান ওকে ওই সাড়ে আট লাখ টাকার মালটার খবর আগে জিগ্যেস করবে। জানতে চাইবে, ওটা কোথায় লুকোনো আছে। তার পরে হয়তো চরকিকে ঘায়েল করার হিসেব নেবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বাইকগুলো এসে থামল 'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর সামনে।

বড় বটগাছটার পাশ ঘেঁষে বাইকগুলো একে-একে থমকে দাঁড়াল। ওদের ইঞ্জিনের আওয়াজ বন্ধ হল। সবাই নেমে পড়ল বাইক থেকে। পলান আর রোশনও।

পলানের আরও চারজন চ্যালা আড্ডা মারার ঢঙে ওদের বেঞ্চিতে এলোমেলোভাবে বসে ছিল। পলানের বাইক দেখামাত্রই ওরা উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখন পলান বাইক থেকে নামতেই ওরা অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে পলানকে ঘিরে দাঁড়াল।

রোশন চুপচাপ দশজনকে লক্ষ করছিল। সাধারণত 'জনপ্রিয়'-র সামনে পলানের ঠেকে এতগুলো ছেলেকে একসঙ্গে দেখা যায় না। আজ এই 'ভিড়' দেখে মনে হতে পারে এখানে কোনও উৎসব আছে।

দলের কয়েকজন রোশনের দিকে রাগী হিংসা নিয়ে তাকিয়ে ছিল। বাকিরা পলানের মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে ওর আদেশের প্রত্যাশায়। পলানদা শুধু একবার বললেই হল। ওরা তখন রোশনকে নিয়ে প্রতিহিংসার উৎসব করবে।

'তোরা সব বসে যা—' শাগরেদদের দিকে তাকিয়ে পলান বলল।

সঙ্গে-সঙ্গে কাটা নগেন, কানুয়া, নোনতা সবাই দুটো বেঞ্চিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে পড়ল।

এখন বটগাছের ছায়ায় শুধু দুজন দাঁড়িয়ে : রোশন আর পলান।

পলানের মুখে রাগ আর বিরক্তির বিবিধ নকশা। পলানের কানের মাকড়ি, হাতের বালা সেই নকশাগুলোকে যেন আরও জোরদার করেছে।

পলান এখন হয়তো ভয়ংকর কিছু একটা করতে পারে। কারণ, সাড়ে আট লাখ টাকা তো নেহাত কম নয়! ওই পলিথিনের প্যাকেটটা হাতছাড়া হয়ে গেলে পলানের নিশ্চয়ই ভালোরকম 'ব্যথা' লাগবে।

পলানের চোখে চোখ রেখে রোশন অপেক্ষা করতে লাগল।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ কেটে যাওয়ার পর পলান ভুরু উঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী রে, শুয়ার, মালটা কোথায় সাঁটিয়েছিস?'

'আপনি গালাগালি ছাড়া বোধহয় কথা বলতে জানেন না, তাই না? আপনার মা-বাবার সঙ্গেও কি এইভাবে কথা বলেন?'

রোশন কথাটা বলল বটে, কিন্তু ও আগেই শুনেছে, স্কুলের পড়া শেষ করার আগেই পলানের মা-বাবা সবার নাগালের বাইরে চলে গেছে।



পলান রোশনের কথাটা মাথায় নিল না। রোশনের চোখে চোখ রেখে ও আবার জানতে চাইল, 'আমার প্যাকেটটা কোথায় লুকিয়েছিস?'

রোশন বলল, 'প্যাকেটটা পাবেন—তবে একটা শর্তে।'

'শর্তে? কোন সাহসে তুই শর্ত দিচ্ছিস?'

হাসল রোশন : 'শর্ত দিতে আবার সাহস লাগে না কি?'

পলানের সারা শরীর জ্বলছিল। রাগের ঢেউ পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছিল শিরায়-শিরায়। রোশনের গালে সপাটে একটা থাপ্পড় মারার জন্য হাত নিসপিস করছিল। কিন্তু চারপাশে অনেক লোকজন, সকালের ব্যস্ততা। হুট করে কিছু করে বসলে সেটাকে নিয়ে রোশন ছেলেটা হয়তো ড্রামা করে বসবে। না, একটু ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করতে হবে।

'কী শর্ত বল...।' পলান সতর্ক গলায় বলল।

'আশাপুরে তোমাকে তোলাবাজি বন্ধ করতে হবে। শনিবার-শনিবারে গোডাউন ফাইট বন্ধ করতে হবে। আর ছোট-ছোট ছেলেদের লোভ দেখিয়ে তোমার দলে টানার চেষ্টাটা বন্ধ করতে হবে...।'

পলান দাঁত বের করে হিংস্রভাবে হাসল। লক্ষ করল, রোশন সম্বোধনের ব্যাপারে 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে এসেছে।

পলান অনেক চেষ্টায় ভেতরের ফুটন্ত রাগকে পোষ মানিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখল। তারপর ব্যঙ্গ করে বলল, 'শুধু এইটুকু? আর কিছু বন্ধ করতে হবে না?'

'না—আপাতত এইটুকু...।' শান্তভাবে বলল রোশন, 'এগুলো বন্ধ করলে তবেই তোমাকে ওই প্যাকেটটা ফেরত দেব। কিন্তু তার সঙ্গেও একটা কন্ডিশান আছে : ওই প্যাকেটের জিনিসটা তুমি আশাপুরের কোথাও ইউজ করতে পারবে না।'

'আশাপুরে আমি ওই পাউডার ইউজ করি না করি তাতে তোর কী? তোর সঙ্গে তো আমার কোনও লেনাদেনা নেই...।'

'তুমি ঠিক বলেছ, পলানদা। আমার সঙ্গে তোমার যখন কোনও লেনাদেনা নেই তখন আমি কেন তোমার কাজে মাথা গলিয়ে এত চাপ নিচ্ছি?'

একটু চুপ করে রইল রোশন। লক্ষ করল, বেঞ্চিতে বসা পলানের চ্যালারা অধৈর্য হয়ে উঠেছে, উশখুশ করছে।

'শোনো, পলানদা—আমরা, জেনারেল পাবলিকরা, যদি এরকম মাথা গলিয়ে চাপ না নিই তা হলে চারপাশে তোমার মতো পচা মাল অনেক গজিয়ে উঠবে। পরিবেশ দূষণের প্রবলেম অনেক বেড়ে যাবে। তাই জেনারেল পাবলিককেই সেটা রুখতে হবে...।'

রোশনের কথা শেষ হতে না হতেই পলান একটা ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল। তবে চিৎকার না বলে সেটাকে কোনও জন্তুর গর্জন বললেই ভালো মানায়।

আর সেই গর্জনের রেশ কাটতে না কাটতেই পলান সপাটে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল রোশনের বাঁ-গালে।

সংঘর্ষের যে-মারাত্মক শব্দটা হল সেটা গাড়ির ব্যাকফায়ারের মতো শোনাল। রোশন ছিটকে পড়ল রাস্তায়। ওর গালে, হাতে, চুলে রাস্তার ধুলো লেপটে গেল।

রোশনের গাল জ্বালা করছিল, মাথা দপদপ করছিল, চোখের সামনে ছোট-ছোট হলদে ফুল পাগলের মতো ওড়াউড়ি করছিল।

কয়েক সেকেন্ড পর ঝাপসাভাবে পলানকে দেখতে পেল রোশন। পা ফাঁক করে লোহার পিলারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওর তিন-চারজন চ্যালা উত্তেজনায় বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওদের মুখে আউট অফ ফোকাস হাসি : রোশন শুয়োরের বাচ্চাটাকে দিনদুপুরে রাস্তায় ফেলে পেটানোর পুরোনো তামাশা আবার শুরু হয়ে গেছে।

শরীরের সমস্ত শক্তিকে একজায়গায় জড়ো করে ধীরে-ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল রোশন। স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওর বাঁ-গালটা ফুলে উঠেছে। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই গোলাপি আভাও দেখা যাচ্ছে ওর ফরসা গালে।

গাল তখনও জ্বালা করছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও গালে একটিবারও হাত বোলাল না। চড়চড়ে জ্বালাটা চুপচাপ সহ্য করতে লাগল।

দেখল, পলান বেশ একটা বীরত্বের অহংকার নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

এখন পলান বা ওর চ্যালাদের চেহারাটা আর ঝাপসা নয়—রোশন দিব্যি ফোকাস করতে পারছে। আর সেটা পারছে বলেই পলানের শাগরেদদের উল্লাসও কটকট করে চোখে পড়ছে।

পলানের ঠেকে কিছু যে একটা লাফড়া চলছে সেটা 'জনপ্রিয়'-র দুজন কর্মী অনেকক্ষণ ধরেই আঁচ করেছিল। কিন্তু ঝামেলাটা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল পলান রোশনকে থাপ্পড়টা মারার পর।

শুধু 'জনপ্রিয়'-র কর্মী দুজনই নয়, পথচলা মানুষজনও একটা 'সিনেমা'-র গন্ধ পেয়ে বারবার তাকাচ্ছিল বটতলার দিকে। তাদের বেশিরভাগই নিজেকে ঝামেলায় না জড়ানোর তাগিদে সুড়সুড় করে তফাতে সরে যাচ্ছিল। তবে কেউ-কেউ একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বিনিপয়সার 'সিনেমা' দেখার জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কেউ-কেউ মোবাইল ফোন বের করে ফটোও তুলছিল।

এটুকু তফাত বাদ দিলে আশাপুরের বাকি সকালটুকু তার নিজের ছন্দেই চলছিল।

রোশন চারপাশটা আলতো করে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিল। আর একইসঙ্গে ভাবছিল, 'সিনেমা'-টা আর একটু লম্বা হলে কেমন হয়!

ও শান্তভাবে পলানের দিকে তাকাল। মাস্তানটা অহংকারে টগবগ করছে।

মনে-মনে 'এক-দুই-তিন' বলল রোশন। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'অফেন্স—অফেন্স—অফেন্স।'

এবং পলানের গালে সপাটে একটা থাপ্পড় মারল।

পলান টলে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু পড়ে যাওয়ার আগেই রোশন পা তুলে ওর বুকে প্রবল জোরে একটা লাথি বসিয়ে দিল।

পলান পিছনদিকে উলটে পড়ে গেল রাস্তায়। ওর মাথাটা অল্পের জন্য ফুটপাথের কিনারায় চোট পাওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেল।

পলানকে সামাল দিতে ওর চ্যালারা পড়িমরি করে ওর কাছে ছুটে গেল। ওকে ধরে খানিকটা তুলতেই পলান 'ছাড়! ছাড়!' বলে ঝটকা মেরে ওদের হাতগুলো সরিয়ে দিয়ে নিজেই সোজা হয়ে দাঁড়াল।

রোশনের থাপ্পড় আর লাথি খেয়ে পলান স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, পলান নস্কর এলাকার 'পলানদা' হয়ে ওঠার পর কেউ ওর গায়ে হাত তোলেনি। ও ছিল 'আনটাচেবল'—অস্পৃশ্য। কিন্তু আজ রোশন ওকে 'টাচেবল' করে দিয়েছে। উটকো ছেলেটা প্রমাণ করে দিয়েছে পলান ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়।

থাপ্পড়ের জ্বালায় যতটা নয় তার চেয়ে ঢের বেশি অপমানের জ্বালায় জ্বলতে লাগল পলান। কারণ, চারপাশে বেশ কয়েকজন পাবলিক দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর চারজন কর্মী দোকানের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। এমনকী দুজন সাইকেল রিকশাওয়ালা তাদের রিকশা নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদের সকলের মুখে-চোখে এমন বিস্ময় যেন কোনও সুপার-ম্যাজিশিয়ানের সুপার-ম্যাজিক দেখছে। পলানের গায়ে 'রোশন' নামের ছেলেটা হাত তুলেছে, এই ব্যাপারটা কেউই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু ওদের ভালো লাগছে।

রোশন লক্ষ করল, পলানের শাগরেদদের তিনজনের হাতে কখন যেন অস্ত্র উঠে এসেছে : একটা কানপুরিয়া, একটা চপার আর একটা জং ধরা সোর্ড। সশস্ত্র তিনটে ছেলে দু-তিনটে পা ফেলে পলানের দু-পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওদের মধ্যে কে যেন বলতে শুরু করেছিল, 'দাদা, মালটাকে এখানেই কুচিয়ে...।'

'না!' পলান চিৎকার করে উঠল। রাগে ফোঁসফোঁস করতে-করতে এপাশ-ওপাশ তাকাল। বটতলা ঘিরে এখন অনেকেই দাঁড়িয়ে।

পলান মনে-মনে খুব তাড়াতাড়ি ক্যালকুলেশন করতে লাগল।

ইচ্ছে করলেই কোমর থেকে ছ'-ঘরা বের করে ছেলেটার সিনায় তিন-তিনটে দানা ভরে দিতে পারে পলান। দিলেই রোশনের লাশ খালাস হয়ে যাবে। কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গে কলাবতীর পাড়ের ওই সাড়ে আট লাখ টাকার প্যাকেটটাও খালাস হয়ে যাবে।

সেইজন্যই পলান 'না!' বলে চিৎকার করে উঠেছে, শাগরেদদের থামতে বলেছে।

রোশন পলানের কাছে এগিয়ে এল। বেশ সংকোচের সঙ্গে বলল, 'পলানদা, সরি। তোমার সেরকম লাগেনি তো? আমি তোমার গায়ে হাত তুলতে চাইনি। কিন্তু...কিন্তু তুমি যেরকম পট করে আমার গায়ে হাত তুলে দিলে তাতে আমার মাথাটাও ঝট করে গরম হয়ে গেল।' একটু থামল রোশন। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বলল, 'তা ছাড়া বলো, সবসময় কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মার খেতে কারও ভালো লাগে? মাঝে-মাঝে পালটা দু-এক ঘা দিতেও তো ইচ্ছে করে। ব্যাপারটা হিট অফ দি মোমেন্টে হয়ে গেছে —তুমি কিছু মাইন্ড কোরো না, প্লিজ...।'

পলান চুপচাপ দাঁড়িয়ে রোশনকে দেখছিল। ওকে মাপছিল।

এটা কী হচ্ছে? ন্যাকামো?

ও আড়চোখে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। অনেকেই কৌতূহলী চোখে সকালবেলার এই অভিনব তামাশা দেখছে। হয়তো ওরা অবাক হয়ে ভাবছে, পলানদার গায়েও তা হলে হাত তোলা যায়! ওদের কারও-কারও হাতে মোবাইল ফোন। কে ক'টা ছবি তুলেছে কে জানে!

রোশন যে পলানকে ছকে ফেলেছে সেটা পলান বেশ বুঝতে পারল। ওর গাল জ্বালা করছিল। বাঁ-হাতের কনুই আর পাছার হাড়ে ব্যথা করছিল।

কী করবে এখন ও?

মনে-মনে রোশনের কূটবুদ্ধির তারিফ করল পলান। না, রোশনকে এখন যক্ষ্মা পালিশ দিয়ে সাড়ে আট লাখ টাকাকে মায়ের ভোগে পাঠাতে পারবে না ও। টাকাটা ওর দরকার। নতুন যে সাদা গুঁড়োর ব্যাবসা ও শুরু করেছে তাতে সাড়ে আট লাখ টাকা বিশ-পঁচিশ দিনে ডবল-রিডবল হয়ে যাবে।

না, রোশনকে এখন ডিসটার্ব করলে চলবে না। কলাবতীর পাড়ের ওই সাদা গুঁড়োর প্যাকেটটা পলানের চাই।

রোশনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল পলান। প্রায় দশ সেকেন্ড ওর চোখের পলক পড়ল না। রোশনও পলকহীনভাবে পলানের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

পলান লক্ষ করল, রোশনের চোয়ালের হাড় কাঠের মতো শক্ত হয়ে রয়েছে। না, ছেলেটার জেদ নেহাত ঠুনকো নয়। সুতরাং উটকো ছেলেটার শর্তে রাজি হয়ে গেল পলান। রোশনকে ও কিছুতেই বুঝতে দেবে না যে, শর্তে রাজি হওয়াটা ওর বাইরের খোলস—ভেতরে-ভেতরে ও রোশনকে শেষ করার ছক কষে চলেছে।

পলান মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তোর সব শর্তে আমি রাজি। আশাপুরে তোলাবাজি বন্ধ, গোডাউন ফাইট বন্ধ, ছোট-ছোট ছেলেদের আমি আর কখনও দলে টানব না। আর তুই ওই প্যাকেটটার ইনফরমেশন দিলে, তোকে কথা দিচ্ছি, ওই প্যাকেটের মাল আশাপুরে ডাউনলোড করব না। আমার মায়ের দিব্যি—' বলে নিজের টুটি টিপে ধরল পলান। তারপর সামনে দুটো পা ফেলে এগিয়ে রোশনের হাত চেপে ধরল : 'মা কালীর কিরে—তোর সব কন্ডিশনে আমি রাজি...।'

কথা বলতে-বলতে একটু পিছনে দাঁড়ানো তিনজন শাগরেদের দিকে আড়চোখে তাকাল পলান। ওদের তিনজনের হাতে তিনটে অস্ত্র : কানপুরিয়া, চপার আর জং ধরা সোর্ড। ওগুলো হাতে নিয়ে ওপেন রাস্তায় ওরা দাঁড়িয়ে।

পলান চাপা গলায় ধমক দিয়ে বলল, 'আরে, মালগুলো ছুপে নে। পাবলিক হাঁ করে দেখছে...।'

চ্যালারা চটপটে পায়ে বটগাছের কাছে চলে গেল, হাতিয়ারগুলো লুকিয়ে রাখল গাছের আড়ালে।

শাগরেদদের হুকুম দেওয়ার পরের সেকেন্ডেই রোশনের দিকে নরম চোখে তাকিয়ে পলান বলল, 'বস, বললাম তো, মা কালীর কিরে। এবার তো মালটার ঠিকানা দাও...।'

রোশন কিছুক্ষণ ধরে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'কোনও চিন্তা কোরো না, পলানদা। ইনডিপেন্ডেন্স ডে-র প্রোগ্রামটা হয়ে যাক—তারপর তুমি তোমার মাল পেয়ে যাবে। ওই প্রোগ্রামের আগে তোমাকে ওই গুঁড়োর প্যাকেটটা দেওয়া যাবে না। ওটা আমার ইনশিয়োরেন্স। যাতে প্রোগ্রামে তোমাদের কেউ কোনওরকমে ঝঞ্ঝাট কিংবা গোলমাল করতে না পারে।'

'তার মানে?' মুখ খিঁচিয়ে রোশনের দিকে আরও এক পা এগিয়ে এল পলান।

'চোখ গরম কোরো না, পলানদা।' ঠান্ডা গলায় রোশন বলল, 'গরমকে কী করে নরম করতে হয় সেটা আমি ভালো করেই জানি...।'

ব্যাপারটা অনেকটা ব্ল্যাকমেল বলে মনে হল পলানের।

এমন সময় একটু ভাঙা এবং ফ্যাঁসফেঁসে গলায় কে যেন চেঁচিয়ে ডাকল, 'পলান! ও পলান!'

সবাই সেই ডাক লক্ষ করে ফিরে তাকাল।

কিশোরীমোহন সামন্ত।

একটা ঝরঝরে সাইকেল পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

রোগা চেহারা, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ময়লা শার্ট-প্যান্টে বেশ কয়েকটা তালি মারা।

সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করালেন কিশোরীমোহন। বড়-বড় চোখ আরও বড় করে পলানের দিকে বেশ কয়েক পা এগিয়ে এলেন।

ঠোঁট চওড়া করে হেসে বললেন, 'কী, পলান? রোশনের হাতে মার খাচ্ছ? বেশ, বেশ—।' বলে রোশনের কাছে গিয়ে ওর পিঠে চাপড়ে দিলেন।

সারা গা জ্বলে গেল পলানের।

রোশনের ব্ল্যাকমেল ওর হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। নইলে ও দেখে নিত কত ধানে কত চাল।

কিশোরীমোহন তখন দু-হাতে রোশনের হাত চেপে ধরে ঝাঁকাচ্ছেন আর উল্লাসে প্রাণ খুলে হাসছেন।

'বুঝলে, রোশন, সায়ন আজ এখানে থাকলে তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করত। তোমার নাম তো রোশন, তাই না?'

রোশন এর আগে ভদ্রলোককে একবার মাত্র দেখেছিল—এখানে, 'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর সামনে। ওঁর হাবভাব দেখে আর কথাবার্তা শুনে ওর মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক যেন ঠিক স্বাভাবিক নন। তার ওপরে মুখ থেকে নেশার গন্ধ বেরোচ্ছে।

'আমি দূর থেকে তোমার কাণ্ড দেখছিলাম—' কিশোরী চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'তুমি আজ দেখিয়ে দিলে কে বাঘের বাচ্চা আর কে শুয়োরের বাচ্চা।' পলানের দিকে ফিরে কথা শেষ করলেন।

অপমানের পর অপমান, তার ওপরে অপমান—এই অপমানের পাহাড় পলান নস্কর আর সইতে পারছিল না। ও কিশোরীমোহনের জামার কলার লক্ষ করে ছোবল মারল। এবং এক হ্যাঁচকায় পলকা রোগা মানুষটাকে নিজের একেবারে কাছে টেনে নিয়ে এল।

কলার খামচে ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিল কিশোরীর কাঠামোটাকে। ওর স্বভাব অনুযায়ী সেইসঙ্গে কাঁচা খিস্তির বন্যা বইয়ে দিল।

কিশোরীমোহনকে বাঁচানোর জন্য রোশন সামনে এগিয়ে গেল। পলানের হাতের মুঠো থেকে কিশোরীর জামাটাকে ছাড়াতে চেষ্টা করল।

আশপাশে দাঁড়ানো লোকজন কিশোরীমোহনের হেনস্থা দেখে সহানুভূতির নানান শব্দ করছিল, নানান কথা বলছিল।

'ইসস', 'উঃ', 'কী হচ্ছে এটা!', 'পলানটা সীমা ছাড়িয়ে গেছে।', 'ছোট-বড় জ্ঞান নেই—'।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর কিশোরীকে ছাড়াতে পারল রোশন। তারপর ওঁকে ঠেলে একটু দূরে সরিয়ে দিল।

কিশোরীমোহনের জামা ছিঁড়ে গেছে। বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছেন। হাড়জিরজিরে পাঁজর উঠছে নামছে। কিন্তু জলন্ত চোখে তাকিয়ে আছেন পলানের দিকে।

রোশন পলানের কাছ থেকে সরে আসতেই কিশোরীমোহন একলাফে পৌঁছে গেলেন পলানের সামনে। রোগা হাতে ঠাঁটিয়ে একটা চড় মারলেন পলানের গালে।

'শুয়োরের বাচ্চা! বড্ড বাড় বেড়েছিস, না?' ধমকের সুরে বলে উঠলেন কিশোরী।

পলান কী করবে ভেবে ওঠার আগেই চারপাশে দাঁড়ানো লোকজন হাততালি দিয়ে হইহই করে উঠল।

পলান আর সইতে পারল না। অপমানে ওর মুখ গোলাপি হয়ে গেছে। পকেট থেকে রিভলভার বের করে ভিড় করা লোকজনের দিকে তাক করে গালিগালাজ করতে লাগল।

'ভাগ সালা, ভাগ। ফোট এখান থেকে—নইলে মাথা ফুটো করে দেব...।'

পলানের হুমকির সঙ্গে-সঙ্গে পলানের চ্যালারা উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে আর গালিগালাজ করে পাবলিক তাড়াতে লাগল।

পলান রিভলভার বের করায় ভালো কাজ হল। ওটা দেখামাত্র সব লোকজন নিমেষের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল। জায়গাটা একেবারে সুনসান ফাঁকা হয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু রোশন, কিশোরীমোহন আর কিশোরীমোহনের সাইকেল।

পলান রিভলভারটা সামনে উঁচিয়ে কিশোরীমোহনের কাছে এগিয়ে গেল। রিভলভারের নলটা রোগা মানুষটার পেটে চেপে ধরে হিংস্রভাবে হেসে উঠল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কী রে সালা, দু-চারটে দানা ভরে দেব নাকি?'

কিশোরীমোহনের শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। ওঁর বড়-বড় চোখে ভয়ের ছাপ পড়ল।

'কী করছ, পলান? কী করছ!' ভয়ার্ত কিশোরী বলে উঠলেন।

রোশন চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হচ্ছে, পলানদা—রিভলভার সরাও! পলিথিনের প্যাকেটটার কথা ভুলে যাচ্ছ?'

পলান রোশনের দিকে তাকাল। ওর মাথার ভিতরে একটা শিরা দপদপ করছে।



কিশোরীমোহনের মুখের দিকে কয়েক লহমা তাকিয়ে রইল পলান। মনে-মনে একটা হিসেবনিকেশ করতে চাইল।

নাঃ, এই খ্যাঁচা লোকটার দাম কখনওই সাড়ে আট লাখ টাকা হতে পারে না। তার অনেক-অনেক কম। তার চেয়ে...।

মাথা ঝাঁকাল পলান। রিভলভারটা কিশোরীমোহনের পেট থেকে সরিয়ে নিল। তারপর আচমকা খপ করে চেপে ধরল কিশোরীমোহনের ডানহাতের কবজি।

'এই হাত দিয়ে আমাকে চড় মেরেছিস, না?'

ক্ষিপ্তভাবে কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে কিশোরীর ডানহাতের ঠিক মাঝখানে রিভলভারের নলটা চেপে ধরল পলান।

এবং গুলি করল।

'পলানদা!' বলে চেঁচিয়ে উঠল রোশন।

গুলির শব্দ আর রোশনের চিৎকারে কিছুটা দূরত্বে হেঁটে চলা পথচারীদের কয়েকজন বটতলার দিকে ঘুরে তাকাল।

'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর মালিক আর দুজন কর্মী দোকানের দরজা আর কাউন্টারের কাছে এসে গলা লম্বা করে বটতলার দিকে দেখতে লাগল।

কিশোরীমোহন তখন ডানহাতের তালু চেপে ধরে যন্ত্রণার চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে পাগলের মতো লাফাচ্ছেন, ছটফট করছেন।

কিশোরী কঁকিয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন, 'রোশন, বাঁচাও! বাঁচাও! গুলি করে দিয়েছে! শুয়োরের বাচ্চাটা গুলি করে দিয়েছে!' ওঁর রোগা শরীরটা টলছিল। মনে হচ্ছিল এখুনি পড়ে যাবে।

হাতের তালুতে গুলি লাগার সঙ্গে-সঙ্গে কিশোরীমোহন কোনও যন্ত্রণা টের পাননি, কারণ, ওঁর ডানহাতটা কিছুক্ষণের জন্য অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তিনি শুধু দেখেছিলেন, ওঁর হাতের তালুর মাঝখানে একটা ছোট ফুটো—গুলিটা তালু এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে! আর সেই গর্তের পরিধি থেকে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত।

রোশন ছুটে গিয়ে কিশোরীকে জাপটে ধরল। টের পেল, ওঁর রোগা পলকা শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। মানুষটা তখনও ভয় আর যন্ত্রণায় হাঁউমাউ করে চিৎকার করে চলেছে।

পলান বোধহয় বুঝল, হিট অফ দ্য মোমেন্টে ও একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এই ওপেন রাস্তায় কিশোরীমোহনের হাতে ওভাবে গুলি করাটা মোটেই ঠিক হয়নি। কারণ, কিশোরীমোহন যদি আশাপুর পুলিশ চৌকিতে ওর নামে একটা এফ. আই. আর. করে দেন তা হলে সুরেন দাস সেটাকে দু-নম্বরি করে ধামাচাপা দিতে পারবেন কি না তা নিয়ে পলানের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তা ছাড়া কিশোরীমোহন তো এখন একা নন, ওঁর সঙ্গে রোশন হারামজাদাটা আছে, আর তার পিছনে আছে রতনমণি মাঝি, অবনীমাস্টার, সুধীরডাক্তার, এবং এলাকার আরও অনেক লোক।

ফলে সুরেন দাস শেষ পর্যন্ত হয়তো পলানকে লক আপে ঢোকাতে বাধ্য হবে।

সেরকম যদি কিছু হয়, তা হলে আশাপুরে পলানের কি আর ইজ্জত বলে কিছু থাকবে?

পলান হঠাৎ যেন কেমন ভয় পেয়ে গেল। ও চট করে নিজের বাইকে চেপে বসল। বাইকে স্টার্ট দিয়ে চ্যালাদের লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলল, 'তোরা সব যে-যেখানে পারিস ফুটে যা! জলদি! এই কেসটা নিয়ে পুলিশের ল্যাঠা-লাফড়া হতে পারে...।'

অনেকগুলো বাইক একসঙ্গে স্টার্ট নিল। তারপর গরগর আওয়াজ তুলে বাইকগুলো নানান দিকে ছিটকে গিয়ে উধাও হয়ে গেল।

পলান আর ওর দলবল পালিয়ে যাওয়ার পর রোশন আর কিশোরীকে ঘিরে একজন-দুজন করে ভিড় জমতে লাগল। কেউ-কেউ কিশোরীমোহনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলল। আবার কেউ-কেউ পুলিশে খবর দেওয়ার জন্য বলতে লাগল, 'পুলিশ! পুলিশ!' বলে চেঁচাতে লাগল।

রোশন পকেট থেকে রুমাল বের করে কিশোরীর ডানহাতে চেপে ধরেছিল। রুমালটা রক্তে ভিজে একেবার লাল। সেটা থেকে টপটপ করে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ছিল রাস্তায়। দুটো ছেলে মোবাইল ফোন তাক করে আহত কিশোরীমোহনের ফটো তুলছিল, রক্তে ভেজা রাস্তার ফটো তুলছিল।

রোশন চিৎকার করে সবাইকে একটা সাইকেল রিকশা ডেকে দেওয়ার জন্য বলছিল। কিন্তু ভিড় জমানো লোকজনের হইহট্টগোলে সে-কথা কারও কানে পৌঁছোচ্ছিল না।

কিছুক্ষণ পর রোশনের চিৎকার বোধহয় কারও কানে ঢুকল, কারণ, দেখা গেল, একটা সাইকেল রিকশা রোশনদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

আশাপুরে হাসপাতাল বলে কিছু নেই। তার বদলে আছে একটা হেলথ সেন্টার। রোশন কিশোরীমোহনকে নিয়ে কোনওরকমে সাইকেল রিকশাটায় উঠল। কিশোরী তখনও যন্ত্রণা আর আতঙ্কে চিৎকার করছেন। রিকশা রওনা হতেই রোশন দেখল চারটে সাইকেল ওর রিকশার পিছু নিয়েছে।

রোশন ওদের দিকে হাতের ইশারা করে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাদের মধ্যে দুজন এক্ষুনি সুধীর ডাক্তারবাবুর চেম্বারে চলে যাও। ডাক্তারবাবুকে কেসটা সব খুলে বলবে। বলবে যে, আমি কিশোরীদাকে নিয়ে হেলথ সেন্টারে যাচ্ছি। সেখানে ট্রিটমেন্ট করিয়ে তারপর ওঁকে থানায় নিয়ে যাব। সেখানে কিশোরীদা পলান নস্করের নামে একটা এফ. আই. আর. করবেন। তারপর...তারপর ওঁকে হয়তো আবার হেলথ সেন্টারে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। খুব ব্লিডিং হচ্ছে। সুধীর ডাক্তারবাবু চেক আপ করে যদি বলেন, সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, তা হলে তাই যাব। তোমরা জলদি যাও...সুধীরডাক্তারবাবুকে একটা খবর দাও...।'

দুটো সাইকেল তখনই অন্য দিকে স্টিয়ারিং ঘোরাল। আর বাকি দুটো সাইকেল রোশনের সাইকেল রিকশার পিছন-পিছন চলল।

'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান'-এর সামনে পলানদের বটতলা ঘিরে তখন অনেক মানুষের ভিড়। তারা রাগ আর বিরক্তিতে হইচই করছে, নানান মন্তব্য করছে। কারণ, কিশোরীমোহন সামন্ত আশাপুরের খুব পরিচিত মুখ। সবাই জানে, ওঁর ছেলে সায়ন আর ওঁর স্ত্রী কীভাবে মারা গেছে। পাগল এই মানুষটা নেশা করে, একটা ভাঙা লজঝরে সাইকেল নিয়ে আশাপুরে খেয়ালখুশি মতো ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু মানুষটা কখনও কারও ক্ষতি করেনি। শুধু পলান নস্করের ওপরে কিশোরীমোহনের রাগ ছিল। তবে সেই রাগ ছিল নিষ্ফলা রাগ। অথবা, দুর্বলের আস্ফালন কিংবা অক্ষমের বদলা নেওয়ার সাধ।

কিশোরীমোহন নিতান্ত নিরীহ ভালোমানুষ। আশাপুরের অনেকেই ওঁকে পছন্দ করে। সেই নিরীহ মানুষটাকে পলান এমন নৃশংসভাবে গুলি করেছে শুনে অনেকেই রাগে একেবারে খেপে উঠল। কেউ-কেউ বলল, 'চলো, পলানের বাড়ি ঘেরাও করব আমরা!'

জবাবে চার-পাঁচজন ক্ষিপ্ত মানুষ বলে উঠল, 'ঘেরাও কেন? ওর বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে ছারখার করে দাও। ওকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে খতম করে দাও!'

একদল বয়স্ক মানুষ নিজেদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছিল। তারা পুলিশে খবর দেওয়ার কথা বলছিল। তাদের মধ্যে একজন বলছিল, 'থানায় খবর দিয়ে কোনও লাভ নেই। কারণ, সুরেন দাস পলানের থেকে মান্থলি পায়। ও কেসটা পুরো ঘুরিয়ে দেবে। হয়তো খাতায় লিখবে কিশোরী সামন্ত নিজেই নিজের ডানহাতের পাতায় গুলি করে সুইসাইড করার চেষ্টা করেছেন...।'

রোশনরা সেবাকেন্দ্রের দিকে রওনা হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আট-দশজন মানুষ নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে সেদিকে হাঁটা দিল। কিশোরীমোহনের আঘাত কতটা সিরিয়াস সেটা নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

পুলিশে খবর দেওয়া উচিত কি উচিত নয় সে নিয়ে তর্কবিতর্ক তখনও চলছিল। শেষ পর্যন্ত একজন বয়স্ক ভদ্রলোক থানায় ফোনই করে ফেললেন।

'হ্যালো, আশাপুর থানা?'

'হ্যাঁ, বলুন—।'

'সাব-ইনস্পেকটর সুরেন দাস আছেন?'

ও-প্রান্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে শোনা গেল : 'হ্যাঁ—বলছি।'

তখন বয়স্ক ভদ্রলোক ফোনে নিজের পরিচয় দিয়ে কিশোরীমোহন সামন্তের আহত হওয়ার ঘটনাটা উত্তেজিতভাবে গড়গড় করে বলে গেলেন।

সুরেন দাস ভদ্রলোকের সবকথা ধৈর্য ধরে শুনলেন। তারপর একটা লম্বা হাই তুললেন। বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা বাঁ-কানের গর্তে ঢুকিয়ে দিলেন। সেটাকে বারকয়েক ক্লকওয়াইজ আর অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ প্যাঁচ দিয়ে কানকে সন্তুষ্ট করলেন। তারপর :

'শুনুন। আপনি যা বললেন, সব শুনলাম। কিন্তু শোনার বেশি আর কিছু করতে পারব না। কারণ, প্রথম কথা আপনি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। আপনার কথায় কিছু করা যাবে না। তার ওপরে ফোনে কমপ্লেন

করছেন। যিনি উন্ডেড হয়েছেন তাঁকে নিয়ে থানায় আসুন। সামনাসামনি এফ. আই. আর. নিয়ে নেব। তা ছাড়া আরও একটা কথা বলি : পলান নস্কর কী করে ওখানে গোলমাল করলেন জানি না। তিনি তো আজ ভোরবেলা থানায় রিপোর্ট করে ওনার ব্যাবসার কীসব কাজে কলকাতায় গেছেন।'

যিনি থানায় ফোন করেছিলেন তিনি ফ্যালফ্যাল চোখে আউট অফ ফোকাস দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে রইলেন। ভদ্র মানুষটার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা বাজে গালাগাল বেরিয়ে এল। তিনি মনে-মনে ভাবলেন, 'জগন্নাথ মার্কা পুলিশ এ ব্যাপারে কিছুই করবে না। যা করার পাবলিককেই করতে হবে।'

সকাল গড়িয়ে দুপুর হল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। কিন্তু পাবলিকের জটলা, আলোচনা ইত্যাদি চলতেই লাগল। আগে যারা পলান নস্করের বিরুদ্ধে মুখ খুলত না, তারা এবার মুখ খুলতে লাগল। কে পলানকে কতবার কত টাকা করে দিয়েছে সেসব খোলাখুলি বলতে লাগল।

একদল পলানের খোঁজে ওর বাড়ির দিকে রওনা দিল। আর একদল লোক রওনা দিল আশাপুর সেবাকেন্দ্রের দিকে।

সুধীর ডাক্তারবাবু, রতনমণি মাঝি, অবনী মাস্টারমশাই খুব তাড়াতাড়ি খবরটা পেয়ে গেলেন। ওঁরা আরও অনেক মানুষকে জড়ো করে প্রথমে গেলেন সেবাকেন্দ্রে, তারপর সেখান থেকে থানায়।

সেখানে সাব-ইনস্পেকটর সুরেন দাসের সঙ্গে ওঁদের কথাকাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। দাসবাবুর সেই এক কথা : পলান নস্কর সকালবেলা থানায় রিপোর্ট করে কলকাতায় গেছেন; উনি গোলমালের স্পটে ছিলেন না; ওঁর নাম করে কেউ গুজব ছড়াচ্ছে।

পলানের নামে আগেকার কতকগুলো খুচরো কেস আছে। সেগুলোর সবক'টাতেই ও জামিন পেয়ে গেছে। তবে থানা থেকে ওকে বলা হয়েছিল, রোজ থানায় হাজিরা দিতে। সেটা ও নিয়মিতভাবে মেনে চলে—একদিনও হাজিরায় বাদ দেয় না। সেইজন্যই আজ সকালে থানায় হাজিরা দিয়ে ও কলকাতায় গেছে।

সুধীরডাক্তারবাবুদের চাপে শেষ পর্যন্ত সুরেন দাস ডায়েরি নিল। তবে ডায়েরির পাতায় লিখল, 'অজ্ঞাত কোনও আততায়ী কিশোরীমোহন সামন্তকে হাতে গুলি করেছে।

সুধীরডাক্তার বললেন, 'জানতাম এরকম হবে। পলানের এগেইনস্টে আমাদের লোকাল থানা কোনও এফ. আই. আর. নেবে না। আমাদের বোধহয় ওপরের লেভেলে যেতে হবে।'

অবনীমাস্টার উত্তেজিতভাবে বললেন, 'ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। আশাপুর আর কতদিন পলানের কাছে পড়ে-পড়ে মার খাবে?'

রতনমণি ওঁদের সঙ্গী মানুষগুলোর দিকে একবার তাকালেন। দু-চারজন চেনামুখ থাকলেও বেশিরভাগই অচেনা। তা সত্ত্বেও ওরা সবাই রতনমণিদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছে। একজোট হয়েছে।

রতনমণি মনে-মনে ভাবলেন, 'আমরা সংখ্যায় অনেক। পলান আর ওর দলবল সংখ্যায় কতজন হবে? বড়জোর পনেরো কি কুড়িজন। অথচ আমরা এতদিন ধরে পলানের গুন্ডারাজ দিব্যি মাথা নীচু করে মেনে নিয়েছি! আশ্চর্য! আবার আমরাই চারদিন পর স্বাধীনতা দিবসের ফাংশান করতে চলেছি! ছিঃ!'

ধিক্কার আর লজ্জায় মাথা নোয়ালেন রতনমণি।

হা ভগবান! এই মেকি স্বাধীনতার গ্লানি মাথায় নিয়ে আর কতদিন পথ চলতে হবে?

আর কতদিন?

□

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আশাপুরে যে দুটো অনুষ্ঠান হচ্ছে সেটা পলান নস্কর পুরোপুরি জানতে পারল পনেরোই আগস্টের তিনদিন আগে—কারণ, সেদিনই একটা সস্তার ব্যানার টাঙানো হয়েছে বিবেকানন্দ মূর্তির রেলিঙে। তাতে লেখা :

## স্বাধীনতা দিবস উৎসব
## আয়োজনে 'আমরা সবাই'

আর লেখার নীচে দুজন মানুষের নাম রয়েছে : ডাঃ সুধীরচন্দ্র পাঠক আর অবনীনাথ পাত্র। নামের পাশে দুজনের মোবাইল নম্বর লেখা।

সুধীরডাক্তার আর অবনীমাস্টারের উদ্যোগে কিছু ছেলেছোকরা আশাপুরের নানান জায়গায় ঘুরে-ঘুরে চাঁদা তুলছে। সে-চাঁদা তোলার স্লোগান ভারী অদ্ভুত : 'আপনারা যে যা খুশি চাঁদা দিন।' তাতে কেউ দিচ্ছে একটাকা, দু-টাকা, পাঁচটাকা—আবার কেউ দিচ্ছে দশটাকা কি কুড়িটাকা। কেউ আবার মুখ-চোখ কুঁচকে বলছে, 'স্বাধীনতা দিবসের প্রোগ্রামে আবার চাঁদা কীসের? সকাল ন'টায় একটা ফ্ল্যাগ তুলে ছেড়ে দাও!' কিন্তু এসব কথায় ছেলেপিলেদের চাঁদা তোলার উৎসাহে কোনও ভাটা পড়েনি। কারণ, অনেকদিন পর আশাপুরে একটা খোলামেলা উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। অনেকদিন পর ওরা সবাই হইহই করে চাঁদা তুলতে নেমেছে।

আশাপুরের কিছু মানুষ ভয়ে অথবা ভক্তিতে নিয়মিত পলানের চর হিসেবে কাজ করে। ওকে হেলপও করে। পলান তাদের বাড়িতে ওর আর্মস লুকিয়ে রাখে। লুকিয়ে রাখে ওর দলের ছেলেপিলেদের চুরি, ডাকাতি অথবা ছিনতাই করা মাল। তার জন্য পলান সেইসব 'রাজাকার'-দের কমবেশি মাসোহারা দেয়।

আশাপুরে কোথায় কী হচ্ছে তার খুঁটিনাটি খবর সবসময় পৌঁছে যায় পলানের কাছে। যেমন, এলাকায় কে-কে দু-নম্বরি কারবার করছে, কে জমি বিক্রি করতে চাইছে, কে চোরাই মালের ব্যাবসা করে, কার আলমারিতে ব্ল্যাক মানি ঠাসা আছে—এইরকম সব খবরই পলান পায়।

পলান খবর পেয়েছিল যে, এলাকায় কিছু একটা গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর চলছে। রোশনকে যে মাঝে-মাঝেই ডাঃ সুধীর পাঠকের 'সুনিরাময়'-এ দেখা যাচ্ছে সে-খবরও এসেছিল পলানের কাছে। ও মনে-মনে তৈরি হচ্ছিল কোনও একটা ক্যাচালের জন্য। তারই মধ্যে ঘটে গেল কিশোরীমোহনের কেসটা। পলানের কেন যে হঠাৎ টেম্পার চড়ে গেল কে জানে! তাতে কলাবতীর পাড়ে লপকে রাখা সাড়ে আটলাখ টাকার মালটা বোধহয় হাত থেকে হড়কে গেল।

সুরেন দাস হেলপ না করলে কিশোরীমোহনের কেসটা অনেক দূর গড়াত। কিশোরী সামন্ত এখনও সেবাকেন্দ্রে ভরতি রয়েছেন। সুধীরডাক্তাররা রোজ কিশোরীকে সেবাকেন্দ্রে দেখতে যান। দু-চারজন সঙ্গীসাথীকে নিয়ে রোশনও দু-বেলা কিশোরীমোহনকে দেখতে যায়। এই বেকার ছেলেটার কি আর কোনও কাজ নেই! ওকে যে করে হোক ঠিকানায় লাগাতে হবে।

'আমরা সবাই' নামটা আশাপুরের বেশিরভাগ মানুষের খুব মনে ধরেছে। এই নামটা শুনলেই মনে হয় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানটা 'আমাদের সবার অনুষ্ঠান'। ডাক্তারবাবু আর মাস্টারমশাই মিলে তিরিশপ্যাকেট বিস্কুট কিনেছেন, তার সঙ্গে লজেন্সের চারটে বড় প্যাকেট। পনেরোই আগস্ট অনুষ্ঠানের শেষে বাচ্চাদের মধ্যে লজেন্স আর বিস্কুট বিলি করা হবে। তবে বাচ্চাদের সঙ্গে বড়রাও সামিল হলে কোনও অসুবিধে নেই।

কলকাতা থেকে একহাজার ছোট-ছোট কাগজের পতাকা কিনে এনেছে রোশন। তার সঙ্গে পাটের সুতলির লাছি আর দুশো কাঠি। সুতলিতে আঠা দিয়ে কাগজের পতাকা লাগিয়ে 'চেইন' তৈরি করা হবে। সেই 'চেইন' স্কুলের মাঠের চারদিকে বাঁশের খুটি পুঁতে লাগানো হবে। আর দুশো কাঠিতে দুশো পতাকা আঠা দিয়ে আটকানো হবে। তারপর সেই 'হাতলওয়ালা' ছোট-ছোট পতাকা অনুষ্ঠানের দিন তুলে দেওয়া হবে বাচ্চা-বড় সবার হাতে।

সুতলি আর কাঠিতে পতাকা লাগানোর কাজটা রোশন নিতুকে দিয়েছিল। নিতু সেই কাজে সাবিত্রী আর আশপাশের তিন-চারজনকে জড়িয়ে নিল। তারপর ময়দার আঠা তৈরি করে ওরা কাজে নেমে পড়ল। বারো

নম্বর বস্তিতে যেন উৎসব লেগে গেল। বহুদিন পরে ওরা সবাই একটা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হইহই করে মেতে উঠেছে। কাঠিতে আঠা দিয়ে পতাকা লাগানোর সময় ববিনও পিসির কাছে পতাকা লাগানোর বায়না করছিল। সাবিত্রী ওর বায়নায় বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ওকে কয়েকটা পতাকা আর কাঠি দিয়েছে। সেইসঙ্গে সাবধান করে বলেছে, 'দেখিস, একটাও পতাকা যেন নষ্ট না হয়! নষ্ট হলে মার খাবি!'

ববিন তাতে সায়ে দিয়ে ছোট-ছোট হাতে পতাকা লাগানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে।

রোশন সাইকেল নিয়ে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছিল। সবার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অনুষ্ঠানের নানান কাজের তদারকি করছিল। ঠিক হয়েছিল, স্কুলের মাঠের এককোণে একটা বড় স্টেজ তৈরি করা হবে। যেহেতু এখন বর্ষার সময়, তাই স্টেজের মাথায় একটা পলিথিনের শিট টাঙানোর জন্য ডেকরেটারকে বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, দুশো প্লাস্টিকের চেয়ার মাঠে পেতে দেওয়ার জন্য।

আশাপুরের একটা ছোট ডেকরেটার 'মাধব ব্রাদার্স'। তার মালিক মাধব দাসের সঙ্গে রোশন আর রতনমণি মাঝি যখন স্টেজ, চেয়ার আর পলিথিনের ব্যাপারে কথা বলেছিলেন তখন দাসবাবু শুধু যে রাজি হয়েছিলেন তা নয়, পাঁচশো টাকা অ্যাডভান্সও নিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎই তেরো তারিখ রাতে তিনি বেঁকে বসলেন। বললেন, 'এই কাজটা আমি করতে পারব না—রিস্ক হয়ে যাবে। আপনারা আমার কাছ থেকে হাতভাড়া নিন—সব মাল আমি দিয়ে দেব, কিন্তু কাজটা করতে পারব না। আমাকে মাপ করবেন।'

রতনমণি জিগ্যেস করলেন, 'পলান নস্কর কি আপনাকে থ্রেট করেছে?'

'না, না, কেউ কিছু করেনি, কেউ কিছু করেনি—' মাধব দাস তাড়াতাড়ি হাত-টাত নেড়ে বললেন, 'কারও নাম-টাম নেওয়ার দরকার নেই। আপনারা বরং মালগুলো আমার কাছ হাতভাড়া নিয়ে নিন—তারপর...তারপর নিজেরা কাজটা করে নিন। শুধু একটা রিকোয়েস্ট : আমি যে আপনাদের হাতভাড়া দিয়েছি সে-কথাটা একটু সিক্রেট রাখবেন।'

মাধব দাসের ভয় পাওয়া মুখ দেখে রোশন আর রতনমণি সবই বুঝতে পারলেন। রতনমণি ফোন করে ডাক্তারবাবু আর মাস্টারমশাইকে সব জানালেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর ঠিক হল, মাধব দাস যা বলছেন তাই হবে। রোশনরা মাধব দাসের কাছ থেকে বাঁশ, চৌকি, পলিথিন, চেয়ার এসব ভাড়া নিয়ে নিজেরা সবকিছু করে নেবে। তারপর দেখা যাক...।

রোশন একটুও না দমে রতনমণিকে বলল, 'রতনদা, কোনও চিন্তা করবেন না। আমি এখুনি বারো নম্বর বস্তিতে গিয়ে নিতুদাকে বলছি। তারপর ঘোষপাড়ায় গিয়ে রনিত আর অতুলকে বলছি। ব্যস, ওরা দলবল জোগাড় করে স্টেজের কাজ নামিয়ে দেবে। তারপর মাঠে চেয়ার সাজানোর ব্যাপারটা ছেলেপিলের দল হাতে-হাতে করে দেবে। আপনি একটুও ভাববেন না। ডাক্তারবাবু আর মাস্টারমশাইকে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করবেন। আমি যাচ্ছি...।'

রোশন সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল। তখন হঠাৎ করে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হল।

রনিত আর অতুল রোশনের কাছাকাছি বয়েসি দুটি ছেলে। আশাপুরের ঘোষপাড়ায় থাকে। রোশনের সঙ্গে ওদের পরিচয় হয়েছে মাসদুয়েক। পলানের ওপরে ওরা যাচ্ছেতাইরকম বিরক্ত। মনে-মনে বিশাল রাগ হলেও ওরা সাহস করে কিছু করে উঠতে পারেনি। রোশনের প্রতিবাদের কেসগুলো শুনে ওরা রোশনের একরকম ফ্যানই হয়ে গেছে। তাই স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের খবর পেয়ে ওরা প্রবল উৎসাহে রোশনের সঙ্গে জুড়ে গেছে। রোশন ওদের কাছে হয়ে গেছে 'রোশনদা'।

রোশন বৃষ্টির মধ্যেই সাইকেল নিয়ে চরকি কাটতে লাগল। প্রথমে নিতুয়া, তারপর রনিত আর অতুল। রোশন মাধব দাসের কেসটা ওদের খুলে বলল। বলল যে, মাধব দাস বাঁশ, চৌকি সব ভাড়া দেবে। ওদের নিজেদের স্টেজ তৈরি করতে হবে, মাঠে চেয়ার পাততে হবে।

'তুমি চিন্তা কোরো না, রোশনদা। আমরা সব নামিয়ে দেব। ওসব কোনও ব্যাপার নয়—' উৎসাহ দেখিয়ে বলে উঠল অতুল আর রনিত।

নিতুয়া যখন এ-খবরটা শুনল তখন হেসে বলল, 'তুমি কি ভুলে গেছ যে, আমি ঘরামির কাজ করি? একটা স্টেজ দাঁড় করিয়ে দেওয়া তো খুব ইজি। কোনও টেনশন কোরো না ভাই, রোশন। তোমার নিতুদা এখনও আছে, না কী! তুমি পাশে থাকলে আমি পলান সালাকে পরোয়া করি না—।'

বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল রোশন। কিন্তু কাজটা এমার্জেন্সি—ফেলে রাখার উপায় নেই। নিতুয়া ওকে বসতে বলছিল। বলছিল এক কাপ চা খেতে। চা খেয়ে—বৃষ্টি ধরলে পরে তারপর রওনা হতে। কিন্ত রোশন বসল না। মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা। এখনও ছোট-ছোট অনেক খুচরো কাজ বাকি।

রোশনের সাইকেল আবার চলতে শুরু করল।

কিশোরীদার কথা মনে পড়ল রোশনের। কিশোরীমোহন তো হাসপাতালে। স্বাধীনতা দিবসের হইহই উৎসব ওঁর আর দেখা হবে না। সামনের বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

কিশোরীমোহনের ঘটনার পর পলান নস্কর পুরো একটা দিন উধাও হয়ে গিয়েছিল আশাপুর থেকে। সাইকেল নিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরার সময় রোশন দেখেছে, 'জনপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর সামনে বটতলা খালি। সেখানে বসবার বেঞ্চিগুলোও নেই। ওগুলো মিষ্টির দোকানের ভিতরে থাকে—পলানের ছেলেরা রোজ সকালে বেঞ্চি দুটো বের করে বটতলায় বসায়, আবার রাতে দোকানের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়।

পলান কি তা হলে কিশোরী সামন্তের কেসটার জন্য উধাও হল?

কিন্তু এখন 'জনপ্রিয়'-র পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় রোশন অবাক হয়ে দেখল দুটো বেঞ্চি বটতলায় পাতা রয়েছে। তবে বৃষ্টি পড়ছে বলে সেখানে কেউ বসে নেই।

তারপরই ও পলানকে দেখতে পেল। পাঁচটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে 'জনপ্রিয়'-র শেডের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রোশন সবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জোরে প্যাডেল করায় মন দিয়েছে, তখনই পিছন থেকে ডাকটা ভেসে এল।

'অ্যাই রোশন!'

পলান ডাকছে।

সাইকেল থামাল। তাকাল পিছন ফিরে।

পলান ওকে হাত নেড়ে ডাকছে।

রোশন সাইকেল ঘোরানোর আগেই 'জনপ্রিয়'-র কাছ থেকে একটা বাইক গরগর করে উঠেছে। একটা ছেলে বাইকটা নিয়ে পলকে চলে এসেছে রোশনের কাছে।

'অ্যাই, পলানদা তোমাকে ডাকছে—।'

ছেলেটার মুখটা চেনা-চেনা হলেও রোশন ওর নাম জানে না।

রোশন ছেলেটার কথার কোনও জবাব না দিয়ে সাইকেল ঘুরিয়ে 'জনপ্রিয়'-র দিকে চলল।

মিষ্টির দোকানের কাছে এসে সাইকেল থেকে নামতেই পলান ওকে ডাকল, 'আয়—এই শেডের নীচে আয়। বৃষ্টি পড়ছে...।'

রোশন পায়ে-পায়ে দোকানের শেডের দিকে এগিয়ে গেল।

পলানের সঙ্গে যে আরও পাঁচটা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে তিনজনকে রোশন চেনে : নোনতা, নগেন আর সুবু। বাকি দুজনের কারওরই ও নাম জানে না।

'অ্যাই, তুই নাকি ফিফটিন আগস্ট ফাংশান মানাচ্ছিস?' পলান একটু বাঁকা সুরেই জিগ্যেস করল যেন।

রোশন বলল, 'ফাংশান আমি করছি না—আশাপুরের লোক করছে।'

'আমি তো একটা ফাংশান রেগুলার করি—তা হলে আবার সেকেন্ড ফাংশান কেন?' পলানের চোখ রোশনের চোখের দিকে তাকিয়ে।

'আমি তার কী জানি! হয়তো আশাপুরের মানুষ সেকেন্ড একটা ফাংশান চাইছে—। তুমি বরং সুধীরডাক্তারবাবু আর অবনীস্যারকে জিগ্যেস কোরো...।'

'তুই তা হলে এর মধ্যে নেই?'

'কেন থাকব না! এর মধ্যে আশাপুরের সবাই আছে...সব্বাই।' রোশন পলানের দিকে ঠান্ডা চোখে তাকাল। এখন পলানকে পালটা দেওয়ার সময় এসে গেছে। কিশোরীদা এখনও সেবাকেন্দ্রের ময়লা বিছানায় শুয়ে আছে। পলানের জন্য।

'এই ফাংশানে আশাপুরের সব্বাই আছে—' আবার বলল রোশন, 'শুধু তুমি ছাড়া, পলানদা। আর তোমার আমচা-চামচাগুলো ছাড়া...।' কথা শেষ করার সময় পলানের পাঁচজন চ্যালার দিকে ইশারা করল ও।

ঠিক তখনই খেয়াল করল পলানের একজন চ্যালা চোখ সরু করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

ছেলেটাকে আগে পলানের টিমে দেখেনি রোশন। কিন্তু তবুও ছেলেটার মুখটা ওর কেন জানি না চেনা-চেনা মনে হল।

ছেলেটা ঠিক ছেলে নয়—লোকের কাছাকাছি। বয়েস চল্লিশ-টল্লিশ হবে। গায়ের রং কালো। নাক, মুখ, চোখ ধারালো। মাথার চুল লম্বা, ব্যাক ব্রাশ করা। শক্তপোক্ত কাঠামো। দেখলে বোঝা যায়, এককালে চেহারা ভালো ছিল—এখন ভেঙে গেছে। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। মাথায় পলানের সমানই বলা যায়।

পলান পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করল। সেটা খুঁটিয়ে পরখ করতে-করতে বলল, 'তুই সবে ছ'-সাত মাস হল আশাপুরে ঢুকেছিস। এর মধ্যেই আশাপুরের ঠেকা নিয়ে বসে আছিস?'

রোশন কোনও জবাব দিল না—চুপচাপ পলানের দিকে চেয়ে রইল। আর মাঝে-মাঝে ওর চোখ ছিটকে গিয়ে পড়ছিল পলানের হাতের ইস্পাত-নীল মেশিনটার দিকে। স্বাধীনতা দিবসের ফাংশানের আগে রোশন আর কোনও ঝামেলার ভেতরে ঢুকতে চায় না।

রোশন কোনও জবাব দিচ্ছে না দেখে পলান চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'আমার পলিথিনের প্যাকেটটার কী হল? কলাবতীর পাড়ে যেটা চাম্পু করে দিয়েছিস? ওতে সাড়ে আটলাখ টাকার মাল আছে...।'

'তোমার মাল তুমি পেয়ে যাবে, পলানদা। আগে আমাদের ফাংশানটা হয়ে যাক। বলেছি না, ওটা ইনশিয়োরেন্স।'

পলান কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কী যেন ভাবল। তারপর গলার স্বরটা একটু নীচু করে বলল, 'অ্যাই, বল তো, কিশোরীদা কেমন আছেন? শুনলাম কে না কে ওঁর হাতে গুলি করে দিয়েছে...।'

রোশন অবাক চোখে পলানের দিকে তাকাল। এই শয়তানটা বলে কী!

'তার মানে!' রোশন কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

পলান রিভলভারের বডিটা জামায় ঘষে পরিষ্কার করতে-করতে নির্বিকারভাবে বলল, 'আমি সেদিন ভোরবেলা কলকাতা চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে সাব-ইনস্পেকটর সুরেন দাসের মুখে শুনলাম, কে যেন আমাদের কিশোরীদার হাতে দানা ঠুকে দিয়েছে। পুলিশ লোকটাকে এখনও খুঁজছে। তুই কেসটার কিছু জানিস?'

পলান এবার প্রচার করে-করে হয়কে নয় করে ছাড়বে। হয়তো সুরেন দাসের সঙ্গে সাঁট করে রোশনকেই কেসটা খাইয়ে দেবে।

রোশন মাথা নাড়ল, বলল, 'না, জানি না...!'

'কিশোরীদা কেমন আছেন এখন? ভাবছি কাল সকালে কিশোরীদাকে একবার দেখতে যাব—ফল-টল দিয়ে আসব...।'

রোশনের এবার গা-রিরি করছিল। ও কোনওরকমে বলল, 'আমি এখন আসি, পলানদা—।'

রোশনের সাইকেলের চাকা সামান্য ঘুরতেই পলানের পাশে দাঁড়ানো লোকজনের মধ্যে কে একজন যেন বলে উঠল, 'আরে, রোশন বিশ্বাস না!'

রোশন চলে যেতে গিয়েও ফিরে তাকাল।

চল্লিশ বছরের কালো লোকটা ওর পুরো নাম ধরে ডেকে উঠেছে।

এই অচেনা লোকটা কী করে জানল ওর পুরো নাম?

লোকটা পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল রোশনের সাইকেলের কাছে।

রোশন খুব খুঁটিয়ে লোকটাকে দেখতে লাগল। মুখটা কি সামান্য চেনা-চেনা লাগছে? স্মৃতির অতল থেকে অচেনা মুখটা কি পরিচয়ের তকমা নিয়ে ভেসে উঠতে চাইছে?

'কী রে, রোশন, আমাকে চিনতে পারছিস না?' অচেনা মানুষটা বেশ আবেগ মাখানো গলায় প্রশ্নটা ভাসিয়ে দিল ভেজা বাতাসে।

রোশন পাগলের মতো মনের ভেতরে হাতড়াতে লাগল।

কে তুমি? কে?

মিহি বৃষ্টি বিপন্ন রোশনের মাথায় মুখে ঝরে পড়ছিল।

'রোশন, আমাকে চিনতে পারছিস না!' লোকটা গভীর চোখে রোশনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার বলল, 'আমি দুনুদা—দীনেশ সামন্ত। কী রে, এর মধ্যেই আমাকে ভুলে গেলি!'

পলানের ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল দীনেশের কাছে। ওর পিঠে হাত রেখে বলল, 'কী দীনেশদা, তুমি রোশনকে চেনো নাকি?'

পলানের দিকে ঘুরে তাকাল দীনেশ : 'চিনব না! দমদম জেলে রোশন আমার সঙ্গে তিন-তিনটে বছর কাটিয়েছে...।'

পলান যেন একটা ধাক্কা খেল। রোশন জেল খেটেছে! রোশন দাগি আসামি!

রোশনের চোখের সামনে বৃষ্টি-ভেজা রাতের পৃথিবীটা লাট্টুর মতো পাক খেতে শুরু করেছিল। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। দীনেশ সামন্ত। দুনুদা। দমদম জেলে ওর সঙ্গে ছিল। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় ড্রাগ পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল। পাঁচবছরের সাজা হয়েছিল দুনুদার। সেই পাঁচবছরের তিনবছর কেটেছিল রোশনের সঙ্গে।

লাট্টুর মতো পাক খাওয়া পৃথিবীটার আর. পি. এম. ধীরে-ধীরে কমে এল। তারপর একসময় ওটা থামল।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ও চিনতে পেরেছে দুনুদাকে।

রোশন সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল।

'দুনুদা!'

দীনেশ রোশনের কাঁধ চাপড়ে বলল, 'কী দারুণ বডি বানিয়েছিস! জেলে যখন ছিলি তখন তো শুকনো রোগাপটকা ছিলি!'

রোশন অল্প হাসল। জিগ্যেস করল, 'তুমি কেমন আছ, দুনুদা?'

'ভালো। চলে যাচ্ছে।'

রোশন লক্ষ করল, দীনেশের চেহারা আগের চেয়ে অনেক শুকিয়ে গেছে। চল্লিশেই মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। কী একটা অস্বস্তিতে চোয়ালে হাত বোলাচ্ছে বারবার। দেখে মনে হচ্ছে, মুখে 'ভালো' আছে বললেও দুনুদা আসলে ভালো নেই।

পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল রোশনের।

বাবা মারা যাওয়ার পর টুকটাক কাজের খোঁজ করছিল ও। সেই সময়েই একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করার চিন্তা ওর মাথায় ঢোকে। পাড়ার এক সিনিয়ার দাদা মদনমোহন পাল ট্যাক্সি চালাতেন। তিনি ওকে রাতের দিকে গাড়ি চালানো শেখাতে শুরু করেন। আর পাশাপাশি ওকে একটা মোটর ট্রেনিং স্কুলে পরিচয় করিয়ে দেন : 'মহাদেব মোটর ট্রেনিং স্কুল'।

দিন কুড়ি-পঁচিশ মদনদার কাছে গাড়ি চালানো শেখার পর রোশন 'মহাদেব মোটর ট্রেনিং স্কুল'-এ 'হাফ লাইসেন্স'-এর জন্য ভরতি হয়ে যায়।

লাইসেন্স হাতে পাওয়ার পর মদনদা রোশনকে এক ট্যাক্সি মালিকের সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেন। ব্যস, রোশন তাঁর ট্যাক্সি চালাতে শুরু করে।

দেখতে-দেখতে সাড়ে তিন-চার বছর কেটে গেল। রোশনের ট্যাক্সির চাকা ঘুরতে লাগল। দিন-রাত পরিশ্রম করে ও টাকা রোজগার করতে লাগল, যদি মা-কে নিয়ে আরও একটু ভালোভাবে থাকা যায়।

এরকম একটা সময়ে হঠাৎই একদিন রোশনের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। ঘুরে গেল কোনও নোটিস না দিয়েই। ঘুরে গেল খারাপ দিকে।

পলান রোশনের দিকে চোখ মটকে তাকাল। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'কী রে সালা যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা! নিজে সালা জেলখাটা দাগি মাল হয়ে আশাপুরে এসে জ্ঞান আর নীতি চমকাচ্ছিস!'

রোশন এতটুকুও ঘাবড়াল না। মুখে হাত বুলিয়ে বৃষ্টির জল মুছে নিল। তারপর পলানের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি কোনও অন্যায় করিনি। দীনেশদা সব জানে।'

পলান রোশনের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'দাঁড়াও সালা, এবার তোমার ফাইনাল খবর নিচ্ছি। আশাপুরের ঘরে-ঘরে তোমার আসলি স্টোরি এবার হোম ডেলিভারি করে দেব...।'

দীনেশ সামন্ত পলানের কথার মাঝখানে কথা বলতে চেষ্টা করল : 'পলানবাবু, রোশন কিন্তু কোনও ক্রিমিনাল অ্যাকটিভিটিতে ডায়রেক্টলি জড়িয়ে ছিল না। মানে...।'

একটা হাত তুলে পলান দীনেশকে থামতে ইশারা করল।

সঙ্গে-সঙ্গে দীনেশ সামন্ত চুপ করে গেল। কারণ, দীনেশ পলানের ইয়ার-দোস্ত নয়। পলানের সঙ্গে ওর যা কিছু রিলেশন সবটাই বিজনেসের ব্যাপারে।

দীনেশ সামন্ত বরাবরই ট্রান্সপোর্টের ব্যাবসা করে। সেই ব্যাবসার ফাঁকফোকরে মাঝে-মাঝে দু-নম্বরি কারবার করে। যেমন, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান থেকে কখনও-কখনও ড্রাগ পাচার করে দীনেশ। পলানের মালও মাঝে-মাঝে আনা-নেওয়া করে। এই ছ'মাসে পলানের আশেপাশে দুনুদাকে কখনও দেখেনি রোশন। আর যদিও বা দেখে থাকে তা হলে চিনতে পারেনি। এখন দুনুদা নিজেকে চিনিয়ে দিল বলে ও চিনতে পারল।

রোশন আর দাঁড়াল না। পলানের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিল।

বৃষ্টি একটু বেড়েছে, কিন্তু ও সেটা গায়ে মাখল না। ও সাইকেল চালাতে লাগল। ওর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। ও জেলফেরত দাগি আসামি এই কথাটা আশাপুরের ঘরে-ঘরে প্রচার করে পলান নস্কর কি ওকে আশাপুর থেকে তাড়াতে চায়?

এই চ্যালেঞ্জে পলান যদি জিতে যায় তা হলে আশাপুরে ওর নোংরা উৎপাত তো কম করে পাঁচ গুণ বেড়ে যাবে!

সাইকেল চালাতে-চালাতে রোশন আপনমনে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল : না, এটা হতে দেওয়া যায় না।

ও ঠিক করল, গেস্টহাউসে ফিরে ও সবার আগে বিশ্বরূপদাকে সব খুলে বলবে। তারপর নিতুদাকে। তারপর রতনমণি মাঝি, সুধীরডাক্তারবাবু, অবনীস্যার, বাবুনদা—সবাইকে।

যে-কথা এতদিন ধরে কাউকে বলেনি ও সে-কথাই মন খুলে বলবে সবাইকে। পলান নস্করকে কিছুতেই ও 'জিততে' দেবে না।

দুনুদার সাতবছর আগের মুখটা মনে পড়ছিল রোশনের। তেল চকচকে মুখ, পেটানো চেহারা, গালে চাপদাড়ি, চোখে সুরমা। গায়ের রং কালো বলে প্রথম নজরে সুরমাটা বোঝা যায় না।

জেলের যে-খোপে রোশনকে ঢোকানো হয়েছিল সেখানে দীনেশ সামন্ত ছিল বস। সরু-সরু চোখে তেরছা নজরে তাকাত সবার দিকে। মনে-মনে মেপে নিত সবাইকে।

রোশনকে নিয়ে মোট চারজন ছিল সেই খুপরিতে। কারণ, জেলে তখন খুপরি খালি ছিল না।

রোশনকে দেখে আলাপ-টালাপ করার পর দীনেশ জিগ্যেস করেছিল, 'কী রে বাচ্চা, কোন লাফড়ায় ঢুকলি?'

রোশন দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে উবু হয়ে বসেছিল। হাঁটুতে মাথা রেখে কাঁদছিল। মায়ের কথা খুব মনে পড়ছিল ওর। কী কষ্টটাই না মা-কে দিয়েছে ও!

আদালতে দাঁড়িয়ে ও মা-কে বারবার বলেছিল, 'মা, বিশ্বাস করো—আমার কোনও দোষ নেই। আমি কিচ্ছু করিনি—কোনও অন্যায় করিনি আমি!'

মা ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'আমি জানি, বাবু, তুই কোনও পাপ করিসনি। কিন্তু আমরা তো সবরকম চেষ্টা করেও হেরে গেলাম। হেরে গেলাম রে, বাবু—হেরে গেলাম...।'

সর্বনাশা পাপী দিনটার কথা ভীষণভাবে মনে আছে রোশনের।

রোদ ঝকঝকে দিন ছিল সেটা। ঘড়িতে সকাল প্রায় ন'টা। রোশন খোশমেজাজে ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়েছিল রাস্তায়। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে ও ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে বউনির কাস্টমারের জন্য অপেক্ষা করছিল।

রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল। হর্ন বাজছিল। লোকজন ব্যস্তভাবে হেঁটে যাচ্ছিল এদিক-ওদিক। অফিস টাইমে যেমনটা দেখা যায় আর কী!

রোশনের সঙ্গে আরও একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। সেটার বয়স্ক পাইলট গাড়ির বনেটের কাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে চঞ্চল চোখে চারপাশে তাকাচ্ছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, সেও একজন সওয়ারি পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। রোশন মনে-মনে মা-কালীকে ডাকছিল, যেন ওর ভাগ্যে আগে শিঁকে ছেঁড়ে। আর একইসঙ্গে বলছিল, আজ যেন কমসেকম হাজার টাকা ভাড়া পকেটে আসে।

হঠাৎই রোশন একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পেল।

ও ট্যাক্সি নিয়ে যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল তার পাশেই খানিকটা ফাঁকা জমি ছিল। জমিটার কোথাও ঘাস আছে, আবার কোথাও টাক। তার একপাশে কিছুটা আগাছা আর জংলা ঝোপ। ঝোপের গা ঘেঁষে আবর্জনার স্তূপ।

একটা বিশ-বাইশের ছেলে হঠাৎ কোথা থেকে এসে ওই আবর্জনার স্তূপের পাশে দাঁড়াল। গায়ে সাধারণ জামাকাপড়। চুলগুলো খাড়া-খাড়া। রং তামাটে। নাকের ওপরে হালকা গোঁফ। পায়ে স্পোর্টস শু। কাঁধে একটা কালো রঙের বড়সড় ডাফল ব্যাগ।

ছেলেটা পকেট থেকে একটা ছোট মাপের মোবাইল ফোন বের করল। তারপর কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলল—দু-দু-বার। মনে হল যেন একই লোকের সঙ্গে কথা বলল। তারপর শেষ কথাটা বলল, 'জলদি আয়, আমি ওয়েট করছি—।'

শেষ কথাটা একটু জোরে বলেছিল ছেলেটা। তাই রোশন সেটা শুনতে পেল।

একজন খদ্দের এসে রোশনকে কোথাও একটা ভাড়া যাওয়ার জন্য বলল। কিন্তু রোশন একটু আনমনা থাকায় তক্ষুনি জবাব দিতে পারল না। ফলে ভদ্রলোক বিরক্তির একটা শব্দ করে সটান রোশনের সামনের ট্যাক্সিটার দরজা খুলে উঠে পড়ল। পাইলটও তাড়াহুড়ো করে উঠে বসল গাড়িতে। গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

রোশনের ভীষণ আপশোশ হল। হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল ওর।

আর ঠিক তখনই বিচিত্র ব্যাপারটা ওর চোখে পড়ল।

মোবাইলের পিছনের কভারটা খুলে ফেলল ছেলেটা। আঙুল দিয়ে কসরত করে সিমকার্ডটা বের করে নিল। তারপর সেটা মুখে পুরে দিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কষে চিবোতে লাগল।

ট্যাক্সির ড্রাইভিং সিটে বসে রোশন অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগল। ছেলেটা সিমকার্ডটাকে বাবল গামের মতো চিবোচ্ছে কেন!

একটু পরেই চিবোনো সিমকার্ডটা মুখ থেকে বের করে নিল ছেলেটা। দোমড়ানো মোচড়ানো বস্তুটার দিকে একপলক তাকিয়ে হাসল। তারপর সেটা ছুড়ে ফেলে দিল আগাছার ঝোপে। তারপর...।

সিমকার্ডের পর মোবাইল ফোন।

আবর্জনার স্তূপের পাশে বেশ কয়েকটা আধলা ইট পড়ে ছিল। সেগুলোর কাছে গেল ছেলেটা। কাঁধের ডাফল ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে উবু হয়ে বসে পড়ল। মোবাইল ফোনটা একটা ইটের ওপরে রেখে আর-একটা আধলা ইট দিয়ে সেটাকে পাগলের মতো পেটাতে লাগল।

আবর্জনার পরিসীমাতে তিন-চারটে কাক ঘোরাফেরা করছিল, মাঝে-মধ্যে আবর্জনা ঠোকরাচ্ছিল। ছেলেটার 'কাণ্ড' শুরু হতেই ওরা লাফিয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল। বারবার ছেলেটার দিকে সাবধানী নজরে দেখতে লাগল।

মোবাইলটাকে থেঁতলে কয়েক টুকরো করে তারপর থামল ছেলেটা। ব্যাক কভারটাকেও রেহাই দিল না। শেষে সমস্ত টুকরোগুলো ফেলে দিল আগাছার ঝোপে।

ছেলেটা হাত-টাত ঝেড়ে ডাফল ব্যাগটা সবে কাঁধে ঝুলিয়েছে, তখনই আরও দুটো ছেলে ওর কাছে এসে হাজির হল। ওরা তিনজনে খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কীসব কথা বলতে লাগল—রোশন একটুও শুনতে পেল না।

নতুন যে-দুজন এসে হাজির হয়েছে তাদের একজন বেশ মোটা, মুখটা ফোলা-ফোলা, ঠোঁটে সিগারেট। আর অন্যজন ফ্যাকফ্যাকে ফরসা, সামনের দাঁতগুলো উঁচু, গায়ে একটা বাদামি রঙের টি-শার্ট।

রোশনের যেটা অবাক লাগল, বাকি দুজনের কাঁধেও কালো রঙের একইরকম দুটো ডাফল ব্যাগ।

ও আর বেশি কিছু ভেবে ওঠার আগেই দেখল, ছেলে তিনটে ওর ট্যাক্সির দিকেই এগিয়ে আসছে। মোটা ছেলেটা সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিল।

ট্যাক্সির পিছনের দরজা দুটো খুলে গেল। ছেলে তিনটে উঠে বসল ট্যাক্সিতে। দড়াম-দড়াম করে দরজা বন্ধ হল।

রোশন রিয়ার ভিউ মিরারে তাকিয়ে ওদের লক্ষ করছিল। ডাফল ব্যাগগুলো ওরা যে-যার কোলে নিয়ে বসেছে।

ফরসা ছেলেটা বলল, 'আমরা অনেকগুলো জায়গায় যাব। তার মধ্যে কোথাও-কোথাও একটু ওয়েট করতে হতে পারে...।'

রোশন কিছু বলার আগেই চুল খাড়া-খাড়া প্রথম ছেলেটা বলল, 'টাকা দিয়ে আমরা তোমার ওয়েটিং চার্জ পুষিয়ে দেব...।'

কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে মোটা ছেলেটা একটা হাজার টাকার নোট রোশনের সামনে বাড়িয়ে ধরল : 'এই নোটটা অ্যাডভান্স রেখে দাও।'

টাকাটা নিয়ে রোশন ওপরওয়ালার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাল। বউনির কাস্টমারের কাছ থেকেই চলে এল এক হাজার টাকা! ভাবা যায়! এরা কত জায়গায় ঘুরে বেড়াবে কে জানে! হয়তো এই প্রথম কলকাতায় এসেছে—কলকাতা ঘুরে-টুরে দেখবে। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে সঙ্গে বড়-বড় ব্যাগগুলো বয়ে বেড়াবে কেন?

রোশন গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছিল। আয়নার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কোনদিকে যাব, দাদা?'

মোটা ছেলেটা বলল, 'ঠিক আছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে আপাতত চলো—।'

রোশন কোনও কথা না বলে গাড়ি ঘোরাল হাজরা রোডের দিকে।

হাজরা রোডে ব্যস্ত কলকাতার ছবি। দোকানপাট, গাড়ি-বাস, এদিক-ওদিক হেঁটে চলা ব্যস্তবাগীশ সব মানুষ।

মাতঙ্গিনী হাজরার কথা মনে পড়ল রোশনের। এই রাজপথটা যারা রোজ ব্যবহার করে তারা কি জানে মাতঙ্গিনী হাজরার নামে এই রাস্তাটার নাম হাজরা রোড রাখা হয়েছে?

পিছনের সিটে ছেলে তিনটে নিজেদের মধ্যে অল্প-সল্প কথা বলছিল। রোশন খেয়াল করল, কথাবার্তার মধ্যে ওরা কোনও নাম ব্যবহার করছে না। কোনও একজন মানুষের পরিচয় ওদের কারও বুঝতে অসুবিধে হলে তখন তাঁর চেহারার ডেসক্রিপশন দেওয়া হচ্ছে।

এ আবার কী অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তার স্টাইল!

চুল খাড়া ছেলেটা নিজের মোবাইল ফোন এবং সিম কার্ড 'খতম' করার গল্পটা সঙ্গী দুজনকে শোনাল। ওরাও বলল, কীভাবে ওরা ওদের মোবাইল ফোন দুটো সিমসমেত অকেজো করেছে।

রোশন ভাবছিল, নিজেদের মোবাইল ধ্বংস করার জন্য এদের এত উৎসাহ কেন?

কিন্তু হাজার টাকা অ্যাডভান্স পাওয়ার আনন্দ ওর সব সন্দেহ আর কৌতূহলকে চাপা দিয়ে দিল।

রোশন একমনে গাড়ি চালাতে লাগল। আর মাঝে-মাঝে রিয়ার ভিউ মিরারে আড়চোখে ছেলেগুলোকে দেখতে লাগল।

রোশনের ট্যাক্সি ছুটে চলল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে।

ছেলে তিনটির হুকুম মতো রোশন গোটা কলকাতা চষে বেড়াতে লাগল। মনে-মনে বেশ আনন্দ হচ্ছিল ওর। এরা যেরকম দরিয়াদিল কাস্টমার তাতে সারাটা দিন যদি ওরা রোশনের ট্যাক্সি নিয়ে টো-টো করে ঘুরে বেড়ায় তা হলে শেষ পর্যন্ত হয়তো হাজার তিনেক টাকা রোশনের কপালে জুটে যেতেও পারে।

কলকাতা আর তার আশেপাশে নানা জায়গায় ঘুরপাক খেয়ে বেলা দেড়টা নাগাদ ওরা সোদপুরের কাছাকাছি বি. টি. রোডে ট্যাক্সিটা দাঁড় করাতে বলল।

রোশন যেখানে গাড়িটা দাঁড় করাল সেখানে ফুটপাথ বলে কিছু নেই। সামনেই দুটো বড়-বড় গাছ। তার পাশে একটা ইলেকট্রিকের পোল। দুটো গাছের মাঝে একটা পুঁচকে চায়ের দোকান। সেটা থেকে দু-পা পিছিয়ে পাশাপাশি দুটো টায়ারে হাওয়া দেওয়ার দোকান। দুটো দোকানেরই গা ঘেঁষে পুরোনো টায়ার একটার ওপরে একটা সাজানো—ঠিক যেন টায়ারের পিলার। তার পাশ দিয়ে চোখে পড়ছে কালচে হয়ে যাওয়া হাওয়া মেশিন।

ঘোর দুপুর। রাস্তায় গাড়ি অনেক কম। চায়ের দোকানদার একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় রুটি-তরকারি নিয়ে খেতে বসেছে। ডানদিকের হাওয়ার দোকানটার সামনে ঝলঝলে হাফপ্যান্ট পরা একটা বছর পনেরো-ষোলোর ছেলে খালি গায়ে বসে ঝিমোচ্ছে।

সবমিলিয়ে একটা অলস দুপুর।

ওরা তিনজনেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সঙ্গে ওদের কালো ডাফল ব্যাগ। ট্যাক্সি থেকে নামার সময় ওদের ব্যাগগুলো যেভাবে ভাঁজ-টাজ খেয়ে যাচ্ছিল তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল ওগুলো খালি।

গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রোশন স্বাভাবিকভাবেই ইঞ্জিন বন্ধ করেছিল। গাড়ি থেকে নামার পর মোটা ছেলেটা ওর জানলার সামনে এসে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ইঞ্জিন চালু রাখো। তেল খরচের চিন্তা কোরো না—টাকায় পুষিয়ে দেব।'

রোশন বেশ অবাক হল।

ইঞ্জিন চালু রাখতে বলল কেন?

সে যাই হোক, মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই ভেবে রোশন গিয়ার নিউট্রালে নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ওরা তিনজন পা চালাল। রোশন ট্যাক্সির জানলা দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর যা দেখল তাতে ওর ভুরু কুঁচকে গেল।

কাছেই নীল-সাদা রং করা একটা তিনতলা বাড়ি। তার একতলাটা জুড়ে একটা সরকারি ব্যাংক। ব্যাংকের কোলাপসিবল গেট খোলা।

সেই গেট থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠলেই অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম লাগানো কাচের দরজা।

ছেলে তিনটে কাচের দরজা ঠেলে ব্যাংকে ঢুকল।

ছোট ব্যাংক। তাই কর্মীর সংখ্যা কম, কাস্টমারের সংখ্যাও বেশি নয়।

দরজার কাছে বছর তিরিশের একজন সিকিওরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে। গায়ে নীল রঙের ইউনিফর্ম, হাতে রাইফেল। সে একজন কাস্টমারকে হাত নেড়ে বোঝাচ্ছিল, কোন কাউন্টারে গেলে চেক ডিপোজিট স্লিপ পাওয়া যাবে।

গার্ড ছেলেটি দেখতে-শুনতে স্মার্ট, চোখ চনমনে, রং ফরসা। তবে ওর ইউনিফর্ম থেকে ঘামের গন্ধ বেরোচ্ছিল।

কালো ব্যাগ কাঁধে তিনজন ছেলে পায়ে-পায়ে গার্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চেক কোন কাউন্টারে জমা নেয়, উইথড্রয়াল স্লিপ কোন কাউন্টারে রাখা আছে, চেক ফেলার ড্রপ বক্সটা কোথায়—এইসব মামুলি প্রশ্ন করতে লাগল।

ওদের কাঁধের কালো ব্যাগগুলো দেখে গার্ডের ভুরু কুঁচকে গেল। সে দেখল ছেলে তিনজন তাকে প্রায় ঘিরে ধরেছে। তখন সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'যান, যান, ওদিকে যান—এক নম্বর আর দু-নম্বর কাউন্টারে জিগ্যেস করুন।'

সিকিওরিটি গার্ডের কথা শেষ হতে-না-হতেই ফরসা দাঁত উঁচু ছেলেটা পকেট থেকে একটা ওয়ান শটার বের করে গার্ডের কোমরের কাছে চেপে ধরেছে।

সেটা দেখতে পেয়ে টাকা তুলতে আসা একজন মহিলা কাস্টমার চিল চিৎকার শুরু করে দিলেন। অন্য দু-চারজন কাস্টমার চমকে ফিরে তাকাল ভদ্রমহিলার দিকে এবং তাঁর নজর অনুসরণ করে সিকিওরিটি গার্ডের দিকে, তারপর তাকে ঘিরে থাকা তিনটে ছেলের দিকে।

ওয়ান শটারটা ওরা সবাই দেখতে পেল।

দুটো ছেলে দৌড়ে চলে গেল কাউন্টারের ভেতর দিকে যাওয়ার খাটো সুইং দরজার দিকে। চোখের পলকে পাল্লা ঠেলে ঢুকে পড়ল ব্যাংক কর্মীদের বসবার এলাকায়।

দাঁত উঁচু ছেলেটা গার্ডের কোমরে ওয়ান শটারটা ঠেসে ধরে দাঁড়িয়েই রইল।

গোঁফওয়ালা চুলখাড়া ছেলেটা কখন যেন একটা ওয়ান শটার হাতের মুঠোয় বাগিয়ে ধরেছে। লোকজনকে ভয় দেখাতে সেটা এদিক-সেদিক তাক করে ভয়ংকরভাবে নাচাচ্ছে।

'খবরদার! যে যেখানে আছিস সেখানেই ছবি হয়ে যা! নইলে সালা পারমানেন্টলি ছবি করে গলায় মালা ঝুলিয়ে দেব!'

একজন রোগা বেঁটে-খাটো কাস্টমার পা টিপে-টিপে ব্যাংকের দরজার দিকে এগোতে চেষ্টা করছিল, সেটা লক্ষ করে চুল খাড়া ছেলেটা ফয়ার করল। টিপটা ঠিকঠাক না থাকায় বেঁটে লোকটার বাহু ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। লোকটা হাঁউমাউ করে চিৎকার করে শূন্যে একলাফ দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল মেঝেতে। একইসঙ্গে অন্যান্য কাস্টমার ভয়ে চেঁচাতে শুরু করল।

হইচই চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ব্যাংকের ম্যানেজার ততক্ষণে তাঁর চেম্বার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন এবং ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছেন।

মোটা ছেলেটা তখন টপাটপ ক্যাশ লুঠ করে ওর কালো ব্যাগটায় ভরছিল। সেই কাজ করতে-করতেই ও দাঁত খিঁচিয়ে চুল খাড়া ছেলেটাকে কাছে ডাকল, 'আবে অ্যাই গোঁফু! চটপট এদিকে আয়। ব্যাগে মাল তোল! জলদি! টাইম চলে যাচ্ছে—।'

চুল খাড়া তখন ওয়ান শটারটা শূন্যে উঁচিয়ে জনগণকে প্রবল খিস্তিসমেত হুমকি দিল। বলল যে, জায়গা থেকে একটু নড়লেই গুলি করে উড়িয়ে দেবে।

ওর পিস্তলে আর গুলি ছিল না। কিন্তু পাবলিক সেটা বুঝলে তো!

ওরা দুজনে দু-মিনিটের মধ্যে ওদের কালো ব্যাগ দুটো যতটা পারল ভরতি করে নিল। তারপর ছুট লাগাল ব্যাংকের দরজার দিকে।

ব্যাংকের ম্যানেজার ততক্ষণে চেম্বারে ঢুকে গিয়ে ইমার্জেন্সি অ্যালার্মের বোতাম টিপে দিয়েছেন। এবং তখনই আকাশ থেকে বৃষ্টি নামল।

দু-বন্ধুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে দাঁত উঁচু ছেলেটাও ব্যাংকের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরের বৃষ্টিতে। তারপর তিনজনেই ছুটতে লাগল রোশনের ট্যাক্সির দিকে।

ছেলে তিনটে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ব্যাংকের দিকে রওনা হওয়ার পর রোশন ট্যাক্সিতে বসে অপেক্ষা করছিল। চাপা গরগর শব্দ করে গাড়ির ইঞ্জিন চলছিল। ও ভাবছিল, ওদের ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগবে। ক্লান্তিতে ওর ঝিমুনি আসছিল, দু-চোখ বুজে আসতে চাইছিল। হাওয়া-বাতাস বন্ধ হয়ে চারপাশটা কেমন গুমোট ধরে গেছে। চায়ের দোকানের লাগোয়া গাছের কোনও একটা ডালে বসে একটা কাক 'কা-কা' করে ডাকছিল। ডাকটা রোশনের কানে ক্লান্ত বিষণ্ণ শোনাল। কর্কশ স্বর যে কখনও বিষণ্ণ শোনাতে পারে ও সেটা আগে কোনওদিনও ভাবেনি। হঠাৎই সেই বিষণ্ণতার সুরে সুর মিলিয়ে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামল। সোঁদা গন্ধ ভেসে এল রোশনের নাকে। ওর ঝিমুনি কেটে গেল। বৃষ্টি ক্রমশ সুর তুলতে লাগল উঁচু পরদায়।

বৃষ্টির ঝালরের মধ্যে দিয়ে রোশন আচমকাই তিনটে কালো ব্যাগকে ওর দিকে ছুটে আসতে দেখল। তার সঙ্গে ছেলে তিনটে পড়িমড়ি করে ছুটে আসছে। একজনের হাতে খোলা পিস্তল—ওয়ান শটার।

খালি ব্যাগটা ওরা ছুলে ফেড়ে দিল রাস্তায়। রোশন লক্ষ করল, ব্যাংকের সিকিওরিটি গার্ড ছেলেটি কখন যেন ব্যাংকের দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। রাইফেল তুলে তাক করছে ছুটন্ত ছেলেগুলোর দিকে।

আর তার পরের মুহূর্তেই ফায়ারিং-এর শব্দ হল : ক্র্যাক।

ফরসা দাঁত উঁচু ছেলেটা ছুটতে-ছুটতেই ছিটকে পড়ল ভিজে রাস্তায়। ওর হাতের অস্ত্র ছিটকে গেল দূরে। বাকি দুজন কিন্তু তাদের দৌড় থামাল না।

রোশন ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারল : তিনজন ব্যাংক-ডাকাতকে ও আজ ট্যাক্সিতে তুলেছে।

ও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। সবকিছু বুঝতে পারার পরেও ও এখন কী করবে সেটা বুঝে উঠতে পারছিল না। এদিকে দুটো ছেলে ততক্ষণে ওর ট্যাক্সির কাছে এসে পড়েছে।

দরজা খুলে ওরা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। কালো ব্যাগ দুটোকে টেনে-হিঁচড়ে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। মোটা ছেলেটা হাঁপাতে-হাঁপাতে হুকুম দিল, 'চালাও—!'

গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া ছিল, কিন্তু রোশন ক্লাচ চেপে গিয়ার দিতে পারল না। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে গেল। কারণ, জানলা দিয়ে ও দেখতে পেয়েছে তৃতীয় ছেলেটি টলতে-টলতে কোনওরকমে ওর গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। যেভাবে ও আসছে সেটাকে হাঁটা আর দৌড়োনোর মাঝামাঝি কিছু একটা বলা যায়।

ছেলেটার টি-শার্টের বাঁ-দিকের খানিকটা জায়গা জুড়ে কালচে লাল ছোপ। বোধহয় গার্ডের রাইফেলের গুলিটা ওর পিঠের একপাশে লেগেছে।

মোটা ছেলেটা আবার ধমকে চেঁচিয়ে উঠল, 'আবে ডাব্বু, চালা—! জলদি গাড়ি চালা!'

রোশনের ঘোর তাতেও কাটল না। ও তৃতীয় ছেলেটির দিকে তাকিয়েই রইল।

ছেলেটার মুখ যন্ত্রণায় কুঁচকে গেছে। হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। ওর চোখ দুটো কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছে।

মোটা ছেলেটা আবার চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে রোশনের ঘোর কাটল। কারণ, ফরসা দাঁত উঁচু ছেলেটা তখন ট্যাক্সির পিছনদিকের একটা দরজা খুলে ফেলেছে। ওর মুখে যন্ত্রণার আর্ত গোঙানি। ঘোলাটে চোখ প্রায় বুজে আসছে। মুখের সব পেশি কুঁচকে কেমন যেন বিকৃত হয়ে গেছে। ছেলেটা পিছনের সিটে বলতে গেলে জাস্ট টলে পড়ে গেল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'হাসপাতাল। আ-আ আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল। হেভি পেইন। হে-হেভি রক্ত। হাসপাতাল...।'

রোশন তার মধ্যেই গাড়ি চালাতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ও শহরের এদিকটা চেনে না। কাছাকাছি হাসপাতাল কোথায় আছে সেটা ওর জানা নেই।

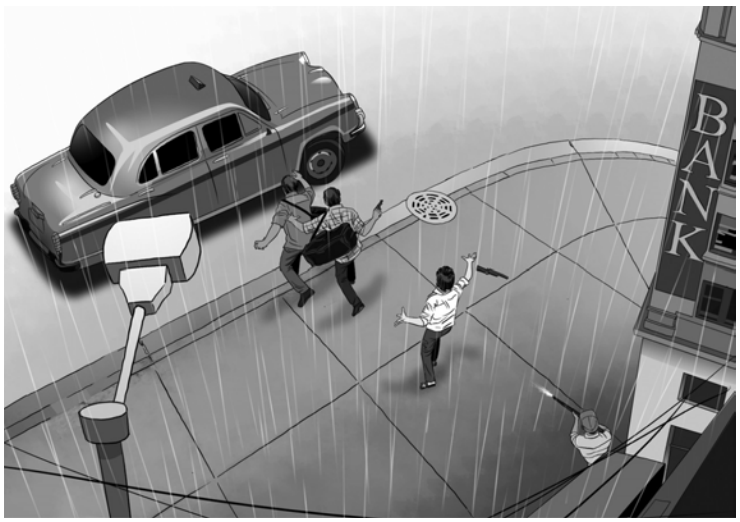
ও আয়নার দিকে তাকিয়ে মোটা ছেলেটার মুখ দেখতে পেল। ছেলেটা কুলকুল করে ঘামছে।

আয়নার মধ্যে দিয়ে ওর সঙ্গে রোশনের চোখাচোখি হল। রোশন ওকে জিগ্যেস করল, 'এদিকে...এদিকে হসপিটাল কোথায় আছে?'

রোশন বেশ টের পেল ওর গলা কাঁপছে।

মোটা ছেলেটার চোখে ভয়। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ওর ব্রেন আর কাজ করছে না।

ও কোনওরকমে বলল, 'হ-হসপিটাল না, হসপিটাল না—স্টেশনে চল, ব্যারাকপুর স্টেশন। তোকে অনেক টাকা দেব।'




রোশনের ভারী তাজ্জব লাগল। ওদের এক বন্ধুর প্রাণ নিয়ে টানাটানি, আর মোটা ছেলেটা টাকার কথা বলছে!

রোশন বলল, 'ব্যারাকপুর স্টেশন কোনদিকে আমি চিনি না।'

কথাটা সত্যি, কারণ, কলকাতার এদিকটায় ও গাড়ি নিয়ে আগে প্রায় আসেইনি বলা যায়।

কিন্তু মোটা ছেলেটা রাগে ফেটে পড়ল : 'চিনিস না! ক্যালানে কার্তিক! রাস্তাঘাট চেনে না সালা কলকাতায় ট্যাক্সি নিয়ে মারাচ্ছে!'

খাড়া চুল ছেলেটা মোটাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করল। ওর পিঠ আলতো করে দুবার চাপড়ে দিয়ে বলল, 'কুল ডাউন ইয়ার। কুল ডাউন...।' তারপর রোশনকে বলল, 'সোজা চল—জোরসে...।'

রোশন সামনের দিকে তাকাল। উইন্ডশিল্ডের ওপারে বৃষ্টি। ঝমঝমে না হলেও ঝুমঝুম ছন্দে চলছে। একটা ওয়াইপার উইন্ড শিল্ডের ওপরে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। রোশন যতটা জোরে পারা যায় বি. টি. রোড ধরে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। অ্যাক্সিলারেটর আরও চেপে ধরল। খাড়া চুল ছেলেটা পিছনের সিট থেকে গলা বাড়িয়ে রোশনের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র গলায় বলল, 'আমি যেভাবে বলব টো-টো সেভাবে চালাবি। নইলে সব কাম তামাম করে দেব...।'

মোটা ছেলেটা উত্তেজিত গলায় বলল, 'জোরে চালা, সালা...আরও জোরে...।'

আহত ফরসা ছেলেটা ওর দু-বন্ধুর মাঝে ভেজা ন্যাকড়ার মতো নেতিয়ে পড়ে আছে। ভাঙা গলায় বিড়বিড় করে বলছে, 'তোরা আমাকে...আমাকে ভাই হাস...হাসপাতালে নিয়ে চল। হেভি...হেভি পেইন হচ্ছে...ওঃ!' ওর বড়-বড় শ্বাস হাপরের শব্দ তুলছে, রোগা বুক উঠছে-নামছে। ওর বাদামি টি-শার্টের অনেকটাই রক্তে ভিজে গেছে। বাদামি আর লাল মিশে এক অদ্ভুত কালচে রং তৈরি হয়েছে।

খাড়া চুল ছেলেটা রাস্তার ডিরেকশন দিচ্ছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, এদিককার রাস্তা-ঘাট ওর ভালো করেই চেনা।

ছেলেটা থেকে-থেকেই 'ডাইনে', 'বাঁয়ে', 'সোজা'—এইসব ছোট-ছোট শব্দ বলছিল, আর ওর মুখ থেকে ছিটকে আসা গরম বাতাস রোশনের কানে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

পিছনের সিট থেকে আহত ছেলেটার কথাবার্তা আর গোঙানি ক্রমশ ঝিমিয়ে আসছিল। রোশন বেশ বুঝতে পারছিল, সময় ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু ওর কিছু করার নেই। এই ছেলে দুটো সাংঘাতিক। ওরা ওদের 'বন্ধু'-কে বাঁচাতে চায় না।

কিছুক্ষণ পর খাড়া চুল ছেলেটার ডিরেকশন মতো ট্যাক্সিটা একটা সরু রাস্তায় ঢোকাল রোশন। সেখানে জল, কাদা, ছাতা মাথায় লোকের ভিড়, রাস্তার একপাশে বাজার বসেছে। বাজারের দিকটায় ফ্লাই-ওভারের উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া পোস্টার সাঁটানো। তার আশেপাশে ঘুঁটের ছাপ।

ট্রেনের হুইসল শুনতে পেল রোশন। মনে হল স্টেশন খুব কাছেই।

মোটা ছেলেটা হঠাৎই কর্কশ গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'অ্যাই, থামা! গাড়ি থামা!'

রোশন আচমকা ব্রেক কষে গাড়ি থামাল। সঙ্গে-সঙ্গে দুটো হাজার টাকার নোট ওর পাশে সিটের ওপর এসে পড়ল। এবং রোশনকে হতবাক করে দিয়ে মোটা আর চুল খাড়া চটপট ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল। হাতে ওদের কালো ডাফল ব্যাগ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ব্যাগগুলো এখন কোনও কিছুতে ঠাসা।

বৃষ্টি এখনও পড়ছে। কিন্তু ছেলে দুটো সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই ব্যাগ কাঁধে ছুট লাগাল। এবং কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

রোশনের চিন্তাগুলো কেমন জট পাকিয়ে গেল।

বন্ধুকে ট্যাক্সিতে ফেলে রেখে ছেলে দুটো কেমন অনায়াসে চলে গেল! অথচ ফরসা ছেলেটার যেভাবে ব্লিডিং হচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত ওকে বাঁচানো যাবে কিনা সন্দেহ।

গাড়ির ভেতরে কেমন যেন একটা চাপা গুমোট। তার মধ্যে মিশে আছে ঘামের গন্ধ, রক্তের আঁশটে গন্ধ। ফরসা ছেলেটা হাত-পা অদ্ভুতভাবে ভাঁজ করে ট্যাক্সির সিটে এলিয়ে পড়ে আছে। চোখ দুটো বড়-বড় করে খোলা—শূন্য দৃষ্টিতে ট্যাক্সির সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে। মুখ হাঁ করে ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে।

আর কতক্ষণ বাঁচবি তুই? আর কতক্ষণ? রোশন মনে-মনে মরণাপন্ন ছেলেটাকে জিগ্যেস করল।

হঠাৎই ছেলেটা রোশনের দিকে তাকাল। কী অদ্ভুত দৃষ্টি ওর চোখে! ও বাঁচতে চাইছে। বাঁচতে চাওয়ার প্রবল আকুতি নিয়ে দেখছে রোশনকে। নীরব চিৎকারে বলছে, 'আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচতে দাও! প্লিজ...!'

রোশনের বুকের ভেতরে ওর আত্মা ভীষণভাবে ছটফট করছিল। কোথায় হসপিটাল? কোথায়? রাস্তার পথচলতি লোকজনকে জিগ্যেস করা যায়। কিন্তু তারপর? তারপর রোশনের কী হবে! থানা, পুলিশ, অ্যারেস্ট, এবং সব শেষে সাজা।

মনে-মনে হিসেব কষে রোশন বেশ বুঝতে পারছিল যে, ওর থানা-পুলিশ করে সাজা হওয়ার চেয়ে এই অল্পবয়েসি ছেলেটার জানের দাম অনেক বেশি। কিন্তু তবুও ওর মনের ভেতরে দোটানা চলতে লাগল। সেই দোটানায় নৃশংসভাবে ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল রোশন।

হঠাৎই ও একটা যন্ত্রণার চিৎকার করে উঠল। লড়াইয়ে আহত কোনও পশুর মরিয়া হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চিৎকার।

সেই চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে রোশন এক ঝটকায় ট্যাক্সির দরজা খুলে নেমে এল ভিজে রাস্তায়। দু-হাত শূন্যে তুলে 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে যক্ষ্মা পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল।

দুটো কমবয়েসি ছেলে খানিকক্ষণ আগেই পিছনের সিটে এলিয়ে থাকা রক্ত মাখা ফরসা ছেলেটাকে লক্ষ করেছিল। ওরা পায়ে-পায়ে ট্যাক্সির পিছনের একটা জানলার কাছে এগিয়ে এসেছিল। জানলার কাচের

ওপরে বৃষ্টির ছোট-ছোট ফোঁটা ঠিকরে পড়ে সাপের মতো গড়িয়ে-গড়িয়ে নামছে।

ছেলে দুটো কাচের ওপরে চোখ প্রায় ছুঁইয়ে ফেলেছে। দু-হাতের তালু বাঁকিয়ে আশপাশ থেকে ছিটকে আসা আলো আড়াল করেছে। তারপর নজর তীক্ষ্ণ করে ট্যাক্সির ভেতরটা দেখতে চাইছে।

কে যেন আলুথালু হয়ে পড়ে আছে না!

তার গায়ের জামায় রক্তের বড়-বড় ছোপ!

ঠিক সেই সময়েই রোশনের পাগল করা চিৎকার ওদের কানে এল।

কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই রোশনের ট্যাক্সিটা ঘিরে জনতার ভিড় জমে গেল!

'হাসপাতাল! হাসপাতাল! বাঁচাও! হসপিটালে না নিয়ে গেলে ছেলেটা এখনই মরে যাবে! বাঁচাও!' রোশনের চিৎকার কিছুতেই থামতে চাইছিল না।

রোশনের ভেতর থেকে আর একটা রোশন কখন যেন বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। অবাক হয়ে সে প্রথম রোশনকে দেখছিল।

একটা ছেলে...তাকে রোশন চেনে না, জানে না...তার ওপরে ছেলেটা ব্যাংক-ডাকাত...অথচ তাকে বাঁচানোর জন্য রোশন পাগলের মতো চিৎকার করছে, ওর গলার শিরা ফুলে উঠেছে, ভোকাল কর্ড চিরে গিয়ে গলার ভিতরে রক্তের সরু রেখা ফুটে উঠল কি না কে জানে!

প্রথম রোশনকে দেখে দ্বিতীয় রোশন অবাক হচ্ছিল। কারণ, প্রথম রোশনকে দেখে মনে হচ্ছিল, কোনও অচেনা ব্যাংক-ডাকাত নয়, ওর ভাই কুশান মারা যাচ্ছে।

এরপর যা হওয়ার তাই হল।

লোকজনের ভিড় ক্রমশ বাড়তে লাগল। কিছু পাবলিক উঠে পড়ল রোশনের ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। রোশনের হাতে স্টিয়ারিং। ওর পাশে গাদাগাদি করে বসে দুজন। তাদেরই একজন পথের ডিরেকশন দিচ্ছে। রোশনের ট্যাক্সি ছুটে চলেছে একটা বেসরকারি হাসপাতালের দিকে।

বৃষ্টি বৃষ্টির মনে পড়ছিল। ওয়াইপার কাচের ওপরে এপাশ-ওপাশ যাতায়াত করছিল। ট্যাক্সির হেডলাইটের আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো চিকচিক করছিল। আর রোশন যেন একটা ঘোরের মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছিল।

হাসপাতালে পৌঁছে রোশন যখন আহত ছেলেটিকে ভরতি করার জন্য রিসেপশনে কথা বলছে, তখন তারা কিছু টাকা জমা করতে বলল।

টাকার কথা শুনে সঙ্গের লোকজন মুখচাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে রোশন পকেট থেকে ডাকাতদের দেওয়া দু-হাজার টাকা বের করে দিল। মনে-মনে বলল, 'টাকা যাক, কিন্তু ছেলেটা বেঁচে যাক...।'

হাসপাতালের যত্ন আর চিকিৎসায় ছেলেটা শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল। তবে ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশ কেস হল।

তারপর ক্রিমিনাল কেসে মাসছয়েক ধরে বিচারের টানাপোড়েনের পর রোশনের তিনবছরের জেল হয়ে গেল।

রোশন যখন লজে ঢুকল তখন রাত প্রায় সওয়া দশটা।

মনটা অস্থির হয়ে উঠেছিল বলে ও বৃষ্টির মধ্যেই সাইকেল নিয়ে এলোমেলো ঘুরে বেড়িয়েছে। পুরোনো কথাগুলো পাগলের মতো ছুটোছুটি করছিল ওর মাথার ভেতরে।

খেতে ইচ্ছে করছিল না রোশনের। তাই রুটি-তরকারি কিনতে পাইস হোটেলে আর গেল না। এদিক-ওদিক সাইকেলের চাকা গড়িয়ে একসময় পৌঁছে গেল বিশ্বরূপদার 'আশাপুর লজ'-এ।

বিশ্বরূপ সাড়ে ন'টার পর সামনের ঘরের টেবিল-চেয়ারে আর থাকেন না। আলো নিভিয়ে নিজের একতলার ছোট্ট ঘরে ঢুকে যান। তারপর সামান্য খাওয়া সেরে নিয়ে ঘুম।

আজ কিন্তু সেটা পারেননি। রাত সাড়ে ন'টা পেরিয়ে দশটা বাজতে চলল, অথচ রোশন এখনও ফিরল না—দুশ্চিন্তায় ভালোমানুষটার কপালে ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল। এত দেরি হচ্ছে কেন রোশনের? ও কি এত রাতে পলানের সঙ্গে কোনও ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল? তার ওপর আবার বৃষ্টি নেমেছে। ছাদে জমে ওঠা বৃষ্টির জল ছরছর করে ঝরে পড়ছে একতলার কলতলা আর চৌবাচ্চায়। সেই শব্দে বাইরে থেকে ভেসে আসা বৃষ্টির শব্দ চাপা পড়ে গেছে।

বাইরের ঘরে, মানে লজের 'রিসেপশান'-এ বসে বিশ্বরূপ অনাত্মীয় ছেলেটার জন্য চিন্তা করছিলেন। ওঁর কপালের ভাঁজ কিছুতেই মসৃণ হচ্ছিল না। রোশন সাড়ে ছ'মাসের বোর্ডার হলেও বিশ্বরূপের মনে হচ্ছিল সময়টা সাড়ে ছ'মাস নয়—সাড়ে ছ'বছর।

বিশ্বরূপ কখনও চেয়ারে বসছিলেন, আবার কখনও পায়চারি করছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন ভাবছেন নিজের সাইকেলটা নিয়ে বেরোবেন, ঠিক তখনই সদর দরজায় ঠকঠক এবং দরজা খুলতেই রোশন।

রোশন সাইকেলটা টেনে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ও ভালোরকম ভিজেছে বৃষ্টিতে। ভেজা চুল কপালে লেপটে আছে। চোখের পাতায়, নাকের ডগায় জলের ফোঁটা।

'কী ব্যাপার, রোশন? এত রাত করলে!'

রোশন সাইকেলটা নিয়ে ভেতরের দিকে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল বিশ্বরূপ জোয়ারদারের দিকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, 'পরশুদিনের ফাংশানের সব ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।'

হাত দিয়ে মাথার জল ঝাড়ল। মুখ মুছল। তারপর সাদা-সরল ভালোমানুষটার মুখের দিকে তাকাল। মানুষটার মুখে কেমন একটা মায়া জড়িয়ে আছে। ছোটভাইয়ের জন্য বড় ভাইয়ের মুখে যেমন মায়া জড়িয়ে থাকে।

রোশন অন্যদিকে চোখ সরিয়ে বলল, 'কাল রাতে আপনাকে ক'টা কথা বলব, বিশ্বরূপদা...।'

'কী কথা?'

'কাল রাতে বলব—।' হেঁয়ালির খানিকটা ধোঁয়া শূন্যে ভাসিয়ে রেখে রোশন সাইকেল নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

মনে-মনে ভাবল, 'ওর জেল খাটার কথা শোনার পর বিশ্বরূপদা ওকে আগের মতন ভালোবাসবেন তো?'

রোশনের মনটা বসে গিয়েছিল। ও কোনও পাপ করেনি জেনেও এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা ভিজে চাদরের মতো ওর হৃদয়টাকে জড়িয়ে ধরেছিল। ওর কোনও কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। মনে হচ্ছিল, কথা বলতে গেলেই ওর কান্না পেয়ে যাবে।

সাধারণত রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে ফেরার পর রোশন বিশ্বরূপদার সঙ্গে একটু গল্পসল্প করে—তারপর নিজের ঘরে চলে যায়। অথচ আজ ছেলেটা কেমন যেন চুপচাপ। বিশ্বরূপের মনে হল, ছেলেটার ভেতরে কোনও চাপা দুঃখ নড়াচড়া করছে।

রোশন চলে এল নিজের ঘরে। রোবটের মতো জামাকাপড় ছেড়ে টুকিটাকি কাজ সেরে ঘরের আলো নিভিয়ে দিল—শুয়ে পড়ল বিছানায়।

অন্ধকারে নিজেকে নিয়ে ভাবতে লাগল।

জেলের দিনগুলো অসহ্য ছিল রোশনের কাছে। একে তো বিনা দোষে ওকে জেল খাটতে হচ্ছিল, তার উপর জেলের জঘন্য পরিবেশ আর জেলের অন্যান্য কয়েদিদের হিংস্র ব্যবহার।

রোশনের বেশ মনে আছে, সেইসব অসহ্য দিনে দীনেশ সামন্ত—দুনুদা ওকে কাছে টেনে নিয়েছিল। মা-পাখির মতো ডানা দিয়ে ওকে আগলে রাখত সবসময়। দুনুদার সাহস আর বডি—এই দুয়ের কম্বিনেশন ছিল

মারাত্মক। ওর কাছে এগোনোর আগে যে-কোনও পাবলিক অন্তত দুবার কি তিনবার ভাবত।

দীনেশ সামন্ত রোশনকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল। সবসময় ওকে বলত, 'শোন, রোশন—লড়াই করে বাঁচতে গেলে তোর দুটো জিনিস দরকার—সাহস আর বডি। তোর এই ল্যাকপ্যাকে খাঁচায় না আছে জোর, না আছে সাহস। তাই এই দুটো জিনিস তোকে কবজা করতে হবে, বুঝলি?'

ব্যস, তারপর থেকেই দুনুদার 'কোচিং ক্লাস'-এ রোশনের পাঠ শুরু। দুনুদা ওকে শিখিয়েছিল কী করে নানারকম আটপৌরে জিনিস দিয়ে ব্যায়াম করা যায় : দেওয়াল, পাঁচিল, লোহার গরাদ, বালি, স্টোনচিপস, জলের বোতল—সবই ব্যায়ামের হাতিয়ার।

দুনুদা ওকে এও শিখিয়েছিল, কী করে শত্রুকে ব্যথা দিতে হয়, ব্যথায়-ব্যথায় কাবু করতে হয়।

সব মিলিয়ে দীনেশ সামন্ত ওকে শিখিয়েছিল, জেলের ভিতরে কীভাবে ইজ্জত আর সমীহ নিয়ে বাঁচতে হয়।

রোশন নিজের কথা সবই বলেছিল দুনুদাকে।

সব শুনে দুনুদা বলেছিল, 'শোন, তুই বিনা দোষে জেল খাটছিস এটা খুব দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু পাশাপাশি এটা ভেবে দ্যাখ, তোর চেষ্টায় একটা মরো-মরো ছেলের জান বেঁচে গেল। কারও জান ফিরিয়ে দেওয়া কি চাট্টিখানি ব্যাপার? আমরা চাইলেও একটা পিঁপড়ের জানও ফিরিয়ে দিতে পারি না—পারি, বল? তা হলে সেটা কি আনন্দের ব্যাপার নয়?'

রোশন চুপচাপ শুধু মাথা নেড়েছে। হ্যাঁ, দুনুদা ঠিকই বলছে।

'তা হলে, এই দুটো ব্যাপার কমপেয়ার করে দ্যাখ, তোর দুঃখটা কত ছোট, আর আনন্দটা কত বড়...।'

সবকিছু রোশনের মনে পড়ে যাচ্ছিল।

দীনেশ সামন্তের তিন বছরের 'কোচিং ক্লাস' রোশনকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। শিখিয়েছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে কীভাবে আনন্দ পেতে হয়। শিখিয়েছে, আনন্দ মাপে যত বড় হয়, দুঃখের মাপ কীভাবে তত ছোট হতে থাকে।

মনে পড়ে যাচ্ছে বাবার কথাও। বাবা বলতেন, 'অন্যায় করা যেমন পাপ, অন্যায় সওয়াটাও তেমনই পাপ। তাই তুমি অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারো আর না পারো, অন্তত প্রতিবাদটুকু করতে ভুলো না। প্রতিবাদ করলে দেখবে, আনন্দের কয়েকটা কণা কোথা থেকে যেন উড়ে এসে তোমার বুকের ভেতরে প্রজাপতির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। এই আনন্দের কোনও তুলনা হয় না। এই আনন্দ পয়সা দিয়ে কেনা যায় না।'

কিন্তু আজ রাতে অন্ধকারের আঁচল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে-শুয়ে রোশনের কান্না পাচ্ছিল। এই সাড়ে ছ'মাস ধরে আশাপুরের 'নাগরিক' হয়ে ও প্রতিবাদের যে-সম্মান আর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে তার সবটাই মিথ্যে হয়ে যাবে একটা মিথ্যে অভিযোগে? পলানের অভিযোগই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে দাঁড়াবে? আশাপুরের মানুষ বিশ্বাস করবে যে, রোশন একজন ক্রিমিনাল—জেল খাটা দাগি আসামি? রোশনের সত্যি কথাগুলো কেউ বিশ্বাস করবে না?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে অন্ধকারে ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল রোশন। আর ওর চোখ ভাসিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

যত কষ্টই হোক, এই প্রশ্নের উত্তর ওকে খুঁজে পেতেই হবে।

পনেরোই আগস্টের সকালটা ভারী সুন্দর হয়ে দেখা দিল। আকাশের এক দিকে ছাই আর সাদাটে রঙের জলদ মেঘ। আর অন্যদিকে ভোরের আলোর আভায় সিঞ্চিত অপূর্ব এক কোমল রং ছেয়ে আছে।

সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই রোশন প্রাইমারি স্কুলের মাঠে চলে এসেছিল। এসে দ্যাখে, রনিত, অতুল, নিতুয়া সবাই মাঠে হাজির। শুধু তাই নয়, ওদের সঙ্গে রয়েছে আরও অনেক ছেলের দল। তার মধ্যে বারো নম্বর বস্তির অনেকগুলো চেনা মুখ নজরে পড়ল।

রোশন অবাক হয়ে দেখল, অবনীমাস্টারমশাই এই সাতসকালেই মাঠে এসে হাজির হয়েছেন। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। হাতে একটা পুরোনো ফোল্ডিং ছাতা—এখন বৃষ্টি পড়ছে না, তাই ছাতা বন্ধ।

রোশন মনে-মনে শুধু এটাই প্রার্থনা করছিল, আজ সকালটা যেন বৃষ্টির হাত থেকে বেঁচে যায়।

ছ'জন ছেলে মাঠে চেয়ার সাজাচ্ছে। সাদা আর সবুজ রঙের প্লাস্টিকের চেয়ার। মাধব দাস তাঁর কথা রেখেছেন—ভোর ছ'টার সময় একটা ঠেলাগাড়ি করে দুশো চেয়ার স্কুল-মাঠে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মাস্টারমশাই চেয়ার সাজানোর ব্যাপারটার তদারকি করছিলেন। বন্ধ ছাতাটা লাঠির মতো সামনে বাড়িয়ে হাঁকডাক পেড়ে কীভাবে চেয়ার সাজাতে হবে তার নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

রোশন নিতুয়ার কাছে গেল।

নিতুয়ার চুল উসকোখুসকো, চোখ লাল। চারটে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কাল সারা রাত ধরে ও স্টেজ তৈরি করেছে। এ ছাড়া রোশন আরও ছ'জন ছেলেকে মাঠে রাত-পাহারায় থাকতে বলেছিল, কারণ, পলান ওদের উৎসব পণ্ড করার জন্য রাতে স্কুল-মাঠে আচমকা হামলা চালাতে পারে। একই কারণে মাঠে সারা রাত ধরে চারটে মেটাল ল্যাম্প জ্বেলে রাখার ব্যবস্থাও হয়েছিল।

নিতুয়া রিপোর্ট দিল রোশনকে : রাতে নানা সময়ে কয়েকটা বাইক এই স্কুল-মাঠকে চক্কর দিয়ে গেছে। বাইকে যারা ছিল তাদের মধ্যে কাটা নগেন, নোনতা, কালুয়া আর সুবুকে নিতুদা চিনতে পেরেছে। তবে বাইকগুলো শুধু চক্কর কেটেছে—কোনও ঝঞ্ঝাট করেনি।

এই স্কুল-মাঠে ফাংশান হবে বলে রোশনরা মিউনিসিপ্যালিটি আর লোকাল থানার পারমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল—সেসব পারমিশন ওরা পেয়েও গেছে। পারমিশনের নানা চিঠিচাপাটি, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদি হ্যাপা সামাল দিয়েছেন ডাক্তারবাবু, মাস্টারমশাই আর রতনদা—রতনমণি মাঝি। সাব-ইনস্পেকটর সুরেন্দ্রনারায়ণ দাস নানা ফ্যাঁকড়া তুললেও শেষ পর্যন্ত অফিশিয়াল পারমিশন দিতে বাধ্য হয়েছেন।

নিতুয়ার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে রোশন মাঠের চারপাশে চোখ বোলাচ্ছিল। হ্যাঁ, সত্যিই উৎসবের মাঠ বলে মনে হচ্ছে মাঠটাকে, যদিও মাঠ সাজানোর ব্যাপারটা খুবই সাধারণ।

মাঠের চারপাশে বাঁশ পুঁতে দড়ি বেঁধে ছোট-ছোট কাগজের পতাকার চেন লাগানো হয়েছে। তাতেই উৎসবের মূল সুরটা বেজে উঠেছে। তার সঙ্গে রয়েছে নিতুয়ার তদাররিকে তৈরি সাদামাঠা মঞ্চ। মঞ্চের মাথায় কোনও ছাদ নেই। পিছনে একটা নীল-সাদা কাপড়ের 'দেওয়াল'। তার ওপরে পিন দিয়ে আটকানো কাপড়ের তৈরি একটা বড় মাপের জাতীয় পতাকা। তার নীচে একটা সালু। তাতে লেখা : 'স্বাধীনতা দিবস উৎসব / আয়োজনে "আমরা সবাই"।' এই ব্যানারটাই বিবেকানন্দ মূর্তির রেলিঙে ক'দিন ধরে টাঙানো ছিল —স্টেজে লাগানোর জন্য কাল রাতে সেটা খুলে আনা হয়েছে।

সবকিছু দেখে রোশনের খুব ভালো লাগছিল। মনে পড়ছিল, ছোটবেলায় ওদের ঘরের সামনে ছোট্ট গলিতে ও আর কুশান স্বাধীনতা দিবসে একটা লাঠির ডগায় পতাকা লাগিয়ে লাঠিটা কয়েকটা ইটের সাপোর্টে দাঁড় করাত। গলিটা ভীষণ সরু বলে লোকজন যাতায়াতের যথেষ্ট অসুবিধে হত। অনেকে বিরক্ত হয়ে রাগারাগি করত, কিন্তু ওরা সেসব গ্রাহ্য করত না। পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে 'জনগণমন' গাইত। তারপর কবিতা শেষ হলে পতাকার দিকে তাকিয়ে সেলাম ঠুকে সম্মান, শ্রদ্ধা ইত্যাদি জানাত। যদিও ওইটুকু বয়েসে শ্রদ্ধা বা সম্মানের কিছুই ঠিকঠাক বুঝত না ওরা। ওরা শুধু জানত, সেলাম ঠোকার পরই ওরা 'প্রসাদ' খাবে। কারণ, পতাকার সামনে একটা ছোট্ট পিতলের থালায় সাজানো রয়েছে কয়েকটা বাতাসা আর

নকুলদানা। মায়ের কাছে বায়না করে এই 'প্রসাদ'-এর ব্যবস্থা করেছে দু-ভাই। এবং 'প্রসাদ' খাওয়ার পরই ওদের 'অনুষ্ঠান' শেষ হত।

পুরোনো কথা মনে পড়ে একচলিতে হাসির ছোঁয়া ফুটে উঠল রোশনের ঠোঁটে। একইসঙ্গে দুঃখের একটা আলপিন হৃদয়ে বিদ্ধ হল। কুশান! কুশানের জায়গাটা শূন্যস্থান হয়ে গেছে—সেটা আর পূরণ করা সম্ভব নয়।

বেলা আটটা বাজতে না বাজতেই রোশনদের মাইক মুখ খুলল। 'আমরা সবাই' আয়োজিত স্বাধীনতা উৎসবে সবাইকে আন্তরিক আহ্বান জানাতে লাগল।

মাঠে দু-চারজন মানুষের ভিড় এমনিতে ছিলই। মাইক সক্রিয় হওয়ার পর সেই ভিড়টা বাড়তে লাগল। ছোট-বড় সবাই এসে জড়ো হতে লাগল। মাইক তখন আশাপুরের সবাইকে স্কুল-মাঠে আসার জন্য লাগাতার আহ্বান জানাচ্ছে।

মঞ্চের সামনে বিশাল মাপের কয়েকটা নীল প্লাস্টিক পাতা হয়েছে। এখানে ছোট-ছোট বাচ্চাকাচ্চারা বসবে।

প্লাস্টিকের পর থেকে সাজানো হয়েছে সারি-সারি চেয়ার। চেয়ারের সারির মাঝবরাবর যাতায়াতের একটা অলিপথ রাখা হয়েছে।

ঘড়ির কাঁটা গড়াতে-গড়াতে ন'টার দাগে পৌঁছোল। ততক্ষণে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা প্লাস্টিকের ওপরে বসে পড়েছে। চেয়ারগুলোও আধাআধি ভরতি হয়ে গেছে।

মাইকে যে-ছেলেটি ঘোষণা করছিল, সে তখন বারবার বলে চলেছে, 'আমাদের অনুষ্ঠান আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হচ্ছে। আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। ছোটদের বলছি, তোমরা শান্ত হয়ে বোসো—গোলমাল কোরো না...।'

এই অনুষ্ঠানে বড় মাপের কোনও মানুষকে বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করা হয়নি। তাই মঞ্চের আশেপাশে আশাপুরের সাধারণ মানুষজনের ভিড়। এরকম অনুষ্ঠান আশাপুরের মানুষ এই প্রথম দেখছে, যেখানে কোনও রাজনৈতিক নেতা নেই, নামকরা গায়ক-গায়িকা নেই, কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এটা শুধুই আশাপুরের সাধারণ মানুষের অনুষ্ঠান—মঞ্চের ওপরে কিংবা নীচে শুধুই সাধারণ মানুষ।

মঞ্চ খুব সাদামাঠাভাবে সাজানো হয়েছে। একটা সারিতে পাশাপাশি দশটা প্লাস্টিকের চেয়ার। তার সামনে একটা খাটো টেবিল। আলোচনা করে এটা ঠিক হয়েছে যে, আশাপুরের দশজন প্রবীণ মানুষ এই দশটি চেয়ারে বসবেন। তার মধ্যে সুধীরডাক্তারবাবু, অবনীমাস্টারমশাই আর রতনমণি মাঝি থাকবেন।

ওঁরা সবাই এসে গেছেন। মঞ্চে উঠে চেয়ারে বসেছেন।

মঞ্চের একপাশে খানিকটা দূরত্বে একটা লম্বা বাঁশ খাড়াভাবে মাটিতে পোঁতা রয়েছে। তার সঙ্গে লাগানো রয়েছে দড়ি আর একটা জাতীয় পতাকা। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই অবনীমাস্টারমশাই পতাকা তুলবেন। কারণ, উদ্যোগী মানুষদের মধ্যে উনিই বয়েসে সবচেয়ে প্রবীণ।

রোশন চারপাশে চোখ বুলিয়ে সবকিছু দেখছিল আর ওর মনে হচ্ছিল, ও একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে রয়েছে। আশাপুরে সত্যি-সত্যিই যে এরকম একটা অনুষ্ঠান হতে পারে সেটা ও ভাবতেও পারছিল না। এটা সাধারণ মানুষের এমন একটা অনুষ্ঠান যার মধ্যে পলান নস্কর বা তার দলবলের কোনও ভূমিকা নেই। এতদিন ধরে পলান আশাপুরের মানুষকে একজোট হতে দেয়নি—তাদের ভাগ-ভাগ করে রেখেছে। 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসি। তো আজ সেই 'পলিসি' ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এত মানুষ এখানে জড়ো হয়েছে, চারপাশে এত হইচই-গুঞ্জন-চেঁচামেচি—অথচ কেউই 'পলানদা জিন্দাবাদ!' স্লোগান দিচ্ছে না। এই ঘটনা আশাপুরে সত্যিই নতুন।

তৃপ্তির একটা নাম-না-জানা সুবাস রোশনের বুকের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছিল। এখন ওর শুধু একটাই চাহিদা : পলান যেন ওর দলবল নিয়ে এখানে কোনও গন্ডগোল তৈরি না করে।

রোশন কোনও চান্স নেয়নি। পলানরা যাতে কোনও গোলমাল করে অনুষ্ঠান পণ্ড না করতে পারে তার জন্য ও দশজনের একটা ভলান্টিয়ার টিম তৈরি করেছে। সেই টিমের 'ক্যাপ্টেন' হচ্ছে নিতুয়া। রাত জেগে কাজ করেছে বলে রোশন সাড়ে সাতটার সময় নিতুয়াকে শুতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখন ন'টা বাজার আগেই ও অল্পস্বল্প ঘুমিয়ে ফ্রেশ হয়ে মাঠে আবার ফিরে এসেছে।

নিতুয়ার নির্দেশে ন'জন ছেলে স্কুল-মাঠের নানান জায়গায় গিয়ে পোস্টিং হয়ে গেছে। ওরা তীক্ষ্ণ নজরদারির কাজ চালাচ্ছে। ওদের হাতে কোনও হাতিয়ার নেই। তবে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনের জন্য রোশন আর নিতুয়া আটটা বাঁশের লাঠি জোগাড় করে এনেছে। সেগুলো এখন মাঠের কিনারায় আগাছার ঝোপের মধ্যে সকলের চোখের আড়ালে 'ঘুমিয়ে' আছে। সেগুলো সত্যি-সত্যি দরকার পড়বে বলে রোশনের মনে হয় না।

অবনীমাস্টারমশাইয়ের কথা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হল। তিনি আশাপুরের মানুষের এই পবিত্র উদ্যোগকে অভিনন্দন জানালেন। বললেন যে, এই উদ্যোগের একজন সক্রিয় অংশীদার হিসেবে তিনি গর্বিত। তারপর সেই বর্ষীয়ান মানুষটি নিজেই অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব নিলেন। বললেন, 'এখন আপনাদের সামনে উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়ে শোনাবে আশাপুরের ছোট্ট মেয়ে কমলকলি জানা।'

তখন একটি বছর দশেকের মেয়ে স্টেজে উঠে 'ধনধান্য পুষ্প ভরা...' গানটি গাইল। তার গানের সঙ্গে একজন দিদি হারমোনিয়াম বাজিয়ে সহযোগিতা করলেন, আর একজন কাকু কমলকলির গানের সঙ্গে তবলা বাজালেন।

ধীরে-ধীরে অনুষ্ঠান সামনে এগিয়ে যেতে লাগল।

রোশন ভিড়ের মধ্যে সাধারণ একজন হয়ে অনুষ্ঠান দেখছিল। ওর খুব ভালো লাগছিল। এই অনুষ্ঠানটাকে সফল করার জন্য আশাপুরের বহু মানুষ আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করেছে। এখানকার স্কুলের দুজন দিদিমণি, মালিনী আর স্মৃতি ম্যাডাম, অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক দিকটা অনেক পরিশ্রমে তৈরি করেছেন। আজ যত গান বা আবৃত্তি হবে তার সবগুলোই ওঁদের দুজনের পরিকল্পনা এবং পরিচালনায়।

রোশনকে অল্প কিছু বক্তব্য রাখার জন্য সুধীরডাক্তারবাবু আর রতনমণিদা অনেক চাপাচাপি করেছিলেন, কিন্তু রোশন কিছুতেই রাজি হয়নি। লজ্জা, সংকোচ আর অযোগ্যতা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বরং এখন 'ভিড়ের মধ্যে একজন' হয়ে দূর থেকে অনুষ্ঠান দেখতে ওর বেশ ভালো লাগছে।

একটা ছোট কাঁটা রোশনের বুকের ভেতরে খচখচ করছিল। গতকাল অনেকবার চেষ্টা করেও ও বিশ্বরূপদাকে নিজের জেল খাটার ব্যাপারটা বলে উঠতে পারেনি। বারবারই ওর মনে হয়েছে, কথাটা মুখ থেকে বের করলেই যেন আশাপুরে ওর অস্তিত্বের সুর কেটে যাবে। ঠিক মনে হবে যেন সুন্দর শান্তভাবে বয়ে চলা একটা নদীতে কেউ একটা প্রকাণ্ড পাথর ছুড়ে মারল। এখন সেই পাথরটা রোশনের গলার ভেতরে আটকে রয়েছে।

রোশন যদি ওই আহত ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা না ভাবত এবং ট্যাক্সি ছেড়ে স্রেফ পালিয়ে যেত তা হলে হয়তো শেষ পর্যন্ত ওর কোনও সাজা হত না। কিন্তু ও সেরকমটা করতে পারল কোথায়! ওর চোখের সামনে একটা তাজা প্রাণ ছটফটিয়ে মরে যাবে এটা ও সইতে পারছিল না। ওর বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে ওকে বলতেন, 'শিগগির উন্ডেড ছেলেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করো— যাও...।'

রোশন তাই করেছে। বাবার কাছ থেকে শেখা সহজপাঠ ও বুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। কারণ, তার মধ্যে আনন্দ আছে।

ও আকাশের দিকে তাকাল। কোথাও মেঘ, কোথাও রোদ।

'হে ভগবান! আজ কিছুতেই যেন বৃষ্টি না হয়।' মনে-মনে প্রার্থনা জানাল।

মঞ্চে সুধীরডাক্তারবাবু তখন বলছেন, 'আপনারা অন্যায়ভাবে কাউকে টাকা-পয়সা দেবেন না। অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াবেন না। অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করুন। ভুলে যাবেন না, ভারতের স্বাধীনতা এইভাবেই

এসেছিল। আজ থেকে আমরা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শপথ নিলাম। জয় ভারতমাতার জয়!'

দর্শকদের মধ্যে থেকে পালটা জিগির উঠল, 'জয় ভারতমাতার জয়!'

ডাক্তারবাবুর বলা শেষ হল।

তারপর জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পালা। অবনীমাস্টারমশাই পতাকা তুললেন। তারপর মঞ্চে উঠে এসে মাইকে ঘোষণা করলেন, 'সামনের দিকে প্লাস্টিকের ওপরে যেসব ছোট্ট-ছোট্ট ভাই-বোনেরা বসে আছ, তোমাদের বলছি। তোমাদের সব্বাইকে এখন লজেন্স-বিস্কুট বিলি করা হবে। তার সঙ্গে দেওয়া হবে একটা করে জাতীয় পতাকা। তোমরা চুপটি করে বোসো—হইচই কোরো না...।'

চারটে ছেলে বিলি করার কাজ শুরু করে দিল। বাচ্চারা কাড়াকাড়ি চেঁচামেচি করে লজেন্স, বিস্কুট আর পতাকা নিতে লাগল। ওদের অনেকেই পতাকা নিয়ে শূন্যে এপাশ-ওপাশ দোলাতে লাগল।

এই অনুষ্ঠানের শেষে বাচ্চা-বড় সব্বাইকে নিয়ে একটা র‍্যালি বেরোবে। সেই র‍্যালি আশাপুরের নানান রাস্তায় ঘুরে আবার এই স্কুল-মাঠে এসে শেষ হবে।

সামনের দৃশ্যটা রোশনের দারুণ লাগছিল। ছোট-ছোট কাগজের পতাকা এপাশ-ওপাশ দুলছে। আর মাইকে তখন 'আমরা করব জয় নিশ্চয়...' গানটির সুর বাজছে। ওঃ, দারুণ!

আর ঠিক তখনই স্কুল-মাঠের কোথাও পরপর দুটো বোম পড়ল।

বোমের শব্দে সবাই চমকে উঠল। অনেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে তড়িঘড়ি বড় রাস্তার দিকে রওনা দিল। বেশ কয়েকজন ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পলিথিন ছেড়ে উঠে ছুট লাগাল। উৎসবের সুর মুছে গিয়ে একটা ভয়ের আবহ নেমে এল পলকে।

কারণ, বোমের শব্দ এবং ধোঁয়া আশাপুরের মানুষের খুব চেনা। পলান ও তার দলবল বহুকাল আগেই আশাপুরের মানুষজনকে এ-দুটি জিনিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

বোমের শব্দে রোশনও চমকে উঠেছিল। যে-ভয়টা সকাল থেকে ওর মনের ভেতরে আঁচড় কাটছিল সেটা আচমকা তার ধারালো নখ বিঁধিয়ে দিল। বোমের ধোঁয়া যে-দু-জায়গায় দেখা গেছে, সেই জায়গা দুটো খুব কাছাকাছি। রোশন সেইদিক লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল। একইসঙ্গে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ভয় পাবেন না—সবাই বসে থাকুন! ভয় পাবেন না...!'

রোশন যতই বলুক, জনগণ সে-কথা শুনলে তো!

ও ছুটছিল, কিন্তু ওর মনে হচ্ছিল পথের দূরত্ব কিছুতেই কমতে চাইছে না।

অবনীমাস্টারমশাই মঞ্চ থেকে হালহকিকত খেয়াল করছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন, ভয় পাওয়া মানুষজনকে ধরে রাখতে হলে এক্ষুনি কিছু একটা করা দরকার।

মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে তিনি মাইকের সামনে এসে বললেন, 'বাজির শব্দে আপনারা ভয় পাচ্ছেন? আজ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের আশাপুরের ছেলেরা পটকা ফাটানো শুরু করে দিয়েছে। আপনারা কেউ যাবেন না। একটু পরে আমরা আরও বাজি ফাটাব। বাজির শব্দে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনারা স্থির হয়ে যার-যার জায়গায় বসে পড়ুন।'

অবনীস্যারের কথায় অনেকটা কাজ হল। বেশিরভাগ লোকজন শান্ত হয়ে যে-যার জায়গায় বসে পড়ল। তবে আওয়াজ দুটো যে বাজি কিংবা পটকার নয় সেটা বেশ কিছু মানুষ বুঝতে পেরেছিল।

রোশন ছুটে যখন অকুস্থলে পৌঁছোল তখন সেখানে ধোঁয়া-টোয়া কিছু নেই। তবে দুটো জায়গায় পোড়া বারুদের স্পট রয়েছে। আর সেই দুটো অপচিহ্ন ঘিরে উত্তেজিত মানুষের জটলা। অনেকেই বলছে, 'ভাগ্য ভালো যে, পেটোদুটো কারও গায়ে লাগেনি।'

রোশন এটুকু বুঝতে পারল, বোম যে-ই ছুড়ে থাকুক সে কাউকে আহত করার জন্য ছোড়েনি। বোম দুটো ছোড়া হয়েছে শুধুমাত্র সন্ত্রাস তৈরির জন্য। এবং এটা অবশ্যই পলান অ্যান্ড কোম্পানির কাজ। এ ছাড়া আর আছেটা কে!

মঞ্চে খানিকটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। বয়স্ক মানুষদের পাঁচ-ছ'জন তাড়াহুড়ো করে মঞ্চ থেকে নেমে গিয়েছিলেন। অবনীমাস্টারমশাই, রতনমণি মাঝি আর সুধীরডাক্তারবাবু মাইকে পালা করে ঘন-ঘন অভয় দিতে লাগলেন।

'আপনারা কেউ যাবেন না। নিজের-নিজের জায়গায় স্থির হয়ে বসুন—।'

এইসব আশ্বাসে কিছুটা কাজ হচ্ছিল, তবে পুরোপুরি যে হচ্ছিল না সেটা মঞ্চের ওপর থেকে তিনজন প্রৌঢ় বেশ বুঝতে পারছিলেন। কারণ, ওঁরা দেখছিলেন, এদিক-ওদিক থেকে দু-চারজন করে মানুষ মাঠ ছেড়ে ব্যস্তভাবে সরে পড়ছে।

মাঠে যথেষ্ট ভিড় হয়েছে। সব চেয়ার তো ভরতি হয়ে গেছেই, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও অসংখ্য মানুষ।

নিতু ওর দলবল নিয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করছিল—যদি পলানের কোনও চ্যালাকে দেখতে পায়।

হঠাৎ দুটো চেনা মুখকে দেখতে পেল নিতু। পলানের দলে ওদেরকে ও অনেকবার দেখেছে। তাই নাম না জানলেও মুখ দুটোকে চিনতে ওর অসুবিধে হয়নি। দুটোরই চেহারা রোগা, কালো—চোখে দু-নম্বরি ছাপ।

খপ করে একজনের হাত চেপে ধরল নিতু : 'অ্যাই, তোরা এখানে কী করছিস রে!'

সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটা কোনও কথা না বলে নিমেষে পকেট থেকে একটা চাকু বের করে নিতুর হাত লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল।

যে-হাত দিয়ে ছেলেটার হাত চেপে ধরেছিল আঘাতটা সেই হাতেই লাগল। কনুইয়ের ওপরে ইঞ্চিদুয়েক ফাঁক হয়ে গেল। সাদা মাংস দেখা গেল। তারপর সূক্ষ্ম অদৃশ্য পথ ধরে অসংখ্য রক্তবিন্দু চুঁইয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল।

যন্ত্রণায় নিতুয়ার মুখ কুঁচকে গেল। ব্যথার একটা ছোট্ট চিৎকার করে ও চাকুওয়ালাকে জাপটে ধরল। নিতুর সঙ্গে যে-তিনজন ছেলে ছিল তারা মুহূর্তের মধ্যে ছেলে দুটোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাঠের সেই জায়গাটায় জটলা আর হইচইয়ের একটা নিউক্লিয়াস তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু তারই মধ্যে থেকে পলানের চ্যালাদুটো কীভাবে যেন পিছলে পালিয়ে গেল।

রোশন কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছিল না। ও কি মঞ্চে ছুটে গিয়ে মাইকে কথা বলে সবাইকে ভরসা দেবে? নিতুদাকে সাহায্য করতে ছুটে যাবে? নাকি অগতির গতি নক্কাছক্কা অফিসার সুরেন দাসকে এই 'অশান্তি'-র খবর দেবে?



মনের মধ্যে বিপন্নতা তৈরি হলেও রোশনের মনের একটা অংশ জেদিভাবে বলছিল, 'যে-কোনও দামে এই অনুষ্ঠানকে সফল এবং সম্পূর্ণ করতে হবে।'

ঠিক সেইসময় একটা গুলির শব্দে স্কুল-মাঠে হাজির সবাই চমকে উঠল। এবং শব্দ লক্ষ্য করে তাকিয়ে যে-দৃশ্য সবাই দেখল তাতে চমকটা একটা বিপজ্জনক মাত্রা পেল।

মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পলান নস্কর। ওর দুপাশে দুজন চ্যালা। তাদের হাতে খোলা তরোয়াল।

পলানের হাতে একটা পিস্তল—সেটার নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কারণ, একটু আগেই পলান আকাশের দিকে তাক করে ওটা থেকে একটা গুলি ছুড়েছে।

পলানের গায়ে লাল রঙের রাউন্ড নেক টি-শার্ট, পায়ে কালো ট্রাউজার্স। টি-শার্টটা ট্রাউজার্সের ভেতরে ইন করে পরা। ওর ডানহাতের স্টিলের বালা, ডানকানের সোনার মাকড়ি চকচক করছে।

অবনীস্যার তখন মাইকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, কিছু একটা বলছিলেন। পলানের কাণ্ড দেখে তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অবাক হওয়ার ঘোরটা কাটিয়ে তিনি পলানকে বকুনির সুরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না। কারণ, সবাইকে অবাক করে দিয়ে পলান বাঁ-হাতে মাস্টারমশাইয়ের গালে সপাটে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল। থাপ্পড়ের নোংরা শব্দটা মাইকে শোনা গেল।

মাস্টারমশাই টলে গেলেন। গালে হাত দিয়ে অবাক বিস্ময়ে পলানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওঁর চোখে জল এসে গেল। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এই পলানকে কত ছোট দেখেছেন! চিলড্রেন্স পার্কে খেলা করত। একটু লাজুক ধরনের ছিল। তারপর দিনের পর দিন পালটাতে-পালটাতে এরকম হয়েছে! এই পালটে যাওয়ার সুতো কি উলটো দিকে গোটানো যায়?

মঞ্চের ওপরে এইরকম নোংরা কাণ্ড দেখে সুধীরডাক্তারবাবু, রতনমণি মাঝি ও অন্যান্য সিনিয়াররা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

সামনে বসে থাকা দর্শকদের মধ্যে অনেকেই ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠেছিল—কারণ, মাস্টারমশাই আশাপুরের সম্মানিত মানুষ, আর পলান নস্কর নর্দমার পোকা। সে কি না এরকমভাবে সবার সামনে মাস্টারমশাইকে অপমান করল!

মানুষজন ফিসফাস করছিল, গুনগুন করছিল, প্রতিবাদের কথাও ভাবছিল। কিন্তু শুধুই ভাবছিল, করছিল না কেউ।

অবনীমাস্টারমশাই হাতের পাতা দিয়ে চোখের জল মুছলেন। তারপর বৃদ্ধ মানুষটি চোয়াল শক্ত করে মাইক্রোফোনের দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পলানের লাথি এসে পড়ল ওঁর গায়ে। মাস্টারমশাই স্টেজের ওপরেই ছিটকে পড়লেন।

সুধীরডাক্তার এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পলান, তুমি কী করছ! তুমি কিন্তু লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছ!'

রতনমাণি মাঝি ও আর-একজন প্রৌঢ় মাস্টারমশাইকে সাহায্য করতে ছুটে গেলেন। ওঁকে ধরে সাবধানে দাঁড় করালেন। ওঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কিন্তু সেগুলো ওঁদের নিজেদের কানে কেমন যেন ফাঁপা শোনাচ্ছিল।

সুধীরডাক্তারের দিকে তাকিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল পলান, এবং একইসঙ্গে খিস্তি-খেউরের বন্যায় স্টেজ ভাসিয়ে দিল। তার কিছু-কিছু টুকরো লাউডস্পিকার গোটা স্কুল-মাঠে ছড়িয়ে দিল।

মাঠে নিতুয়া তখন চিৎকার করছিল। হাতের কাটা জায়গায় ও একটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো বেঁধে নিয়েছে। সেই অবস্থাতেই ও চেঁচিয়ে ওর 'কমরেড'-দের ছুটে গিয়ে স্টেজে ওঠার জন্য বলছিল। মাস্টারমশাই আর ডাক্তারবাবুর হেনস্থা ওর ভেতরে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। তার ওপর পলানের ছেলে দুটো ওদের হাত ছাড়িয়ে পিছলে পালিয়েছে বলে নিতুর ভেতরে একটা চাপা রাগ ফুটছিল।

পলান ওর রিভলভারটা কখন যেন পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে। স্ট্যান্ড মাইকের রডটা চেপে ধরে মাইকের কাছে মুখ নিয়ে এসে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে।

'আসাপুর আমাদের জন্মভূমি। আসাপুর একটাই অঞ্চল। সেই অঞ্চলকে আমি জান থাকতে ভাগ হতে দেব না। আসাপুরে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বরাবর একটাই হয়—যেটা আমি করি—চিলড্রেন পার্কে। সেখানে দুটো পোগ্রাম করার মানে আসাপুরকে ভাগ করার চেস্টা। সেটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

'আমি জানি, আসাপুরের মানুস হেব্বি ভালো। কিন্তু আসাপুরের বাইরে থেকে আসা একটা পচা মাল গোটা আসাপুরকে পচিয়ে দিচ্ছে। আসাপুরের এই বিপদের দিনে আমাকে তো রুখে দাঁড়াতেই হবে, কড়া মোকাবিলা করতে হবে। আসাপুরের ক্ষতি আমরা কিছুতেই হতে দেব না...।'

দর্শকের আসন থেকে একজন মাঝবয়েসি লোক উঠে দাঁড়িয়ে বাঁকা হাসি হেসে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, 'সেই পচা মালটা কে?'

'রোশন বিশ্বাস !' পলান যেন গর্জন করে উঠল, 'ওই সুয়ারের বাচ্চাটা সুধু যে পচা মাল তা নয়—ব্যাটা একনম্বরের জেলখাটা দাগি মাল। এখন সালা এই স্কুল-মাঠেই কোথাও ছুপে রয়েছে...।'

নিতু ওর দলবল নিয়ে পলানের জঘন্য অন্যায় দেখছিল, ওর লম্বা-চওড়া কথা শুনছিল।

নিতুয়ার রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। কিন্তু স্টেজের দু-পাশে সোর্ড হাতে দুটো চ্যালা দাঁড়িয়ে থাকায় ও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ভাবছিল, কী করা যায়।

ওর সঙ্গী একটি ছেলে বলল, 'নিতুদা, পুলিশে খবর দিলে হয় না?'

তাতে নিতুর পাশে দাঁড়ানো আর-একটি ছেলে জবাব দিল, 'কোনও লাভ নেই। এখানকার পুলিশ সবসময় পলান নস্করের নাম-কেত্তন করে—।'

নিতুর গায়ে জ্বালা ধরে গিয়েছিল। ও হঠাৎই দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'পলান সালা লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তোরা এক্ষুনি ছোট—ঝোপ থেকে খেটোগুলো নিয়ে স্টেজের দু-পাশ থেকে অ্যাটাক কর—সুয়ারের বাচ্চাদের এক্ষুনি অ্যাটাক কর...!'

দর্শকদের মধ্যে থেকে নানান কথা উঠে আসছিল। রোশনের এগেইনস্টে পলান উলটোপালটা কথা বলায় অনেকে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলছিল। রোশনের হয়ে অনেকে কথা বলছিল। কেউ-কেউ আবার প্রশ্ন তুলল, 'রোশন কোথায়? কোথায় গেল রোশন?'

রোশন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পলানের নোংরামো দেখছিল। পলানের শেষ কথাগুলো এমন যে, মাঠে হাজির পাবলিকের সামনে এর একটা জবাব দেওয়া দরকার। এবং এক্ষুনি।

এসব কথা ভাবতে-ভাবতেই রোশন দেখল, স্টেজের দু-পাশ থেকে চার-চারটে তেজিয়ান ছেলে হঠাৎ করে হনুমানের মতো লাফিয়ে উঠে এল স্টেজে—হাতে তাদের লাঠি। একটি সেকেন্ডও নষ্ট না করে তাদের লাঠি গিয়ে পড়ল পলানের দুই চ্যালার পিঠে, তাদের তরোয়াল ধরা হাতে, হাঁটুতে, কোমরে—এবং পড়তেই থাকল।

স্টেজে সিঁটিয়ে দাঁড়ানো বয়স্করা 'কী করছ! কী করছ! থামো! থামো!' বলে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইলেন, কিন্তু অবস্থা তখন সামাল দেওয়ার জায়গায় আর ছিল না। পলানের চ্যালাদুটো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে স্টেজের ওপরে। ওদের ওপরে লাঠির ঝড় তখনও চলছে।

ঘটনাগুলো এত আচমকা ঘটে গিয়েছিল যে, পলান চটপট রিয়্যাক্ট করতে পারেনি। ও ভুলেই গিয়েছিল যে, ওর পকেটে একটা রিভলভার রয়েছে। সেটার কথা যখন ওর মনে পড়ল তখন ও পকেটের দিকে হাত বাড়ানোর আগেই ওর যক্ষ্মাশত্রু লাফিয়ে উঠে পড়ল স্টেজের ওপরে।

রোশন স্টেজে উঠল একটু অদ্ভুতভাবে।

পাঁচ-সাত সেকেন্ড আগে চেয়ারের সারির মাঝের অলিপথ ধরে ও স্টেজ লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছিল। পেস বোলাররা বল করার আগে গতিবেগ বাড়ানোর জন্য যেরকমভাবে ছুটে যায়, অনেকটা সেইরকম।

রোশনের লক্ষ্য ছিল স্টেজের মাঝবরাবর—যেখানটায় পলান মাইক্রোফোনের স্ট্যান্ডের রডটা ধরে দাঁড়িয়েছিল। পলানের চোখ ভিড়ের মধ্যে রোশনের মুখটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎই ও দেখল, চেয়ারের সারির মাঝের অলিপথ ধরে রোশন পাগলের মতো ছুটে আসছে স্টেজের দিকে।

মাঠে তখন শৃঙ্খলা আর ততটা নেই। অনেকেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে, সরে যাচ্ছে নিরাপদ দূরত্বে। কারণ, গোলমাল বেশ জোরালোভাবে শুরু হয়ে গেছে, শুরু হয়ে গেছে অস্ত্রের ব্যবহার।

ঠিক তখনই বৃষ্টি যে নামতে পারে সেই খবরটা জানান দিয়ে মেঘ ডেকে উঠল আকাশে।

হরিণের মতো ছুটে গিয়ে স্টেজের কিনারায় হাতের ভর দিয়ে একলাফে স্টেজে উঠে পড়ল রোশন। এবং গতি বজায় রেখেই প্রচণ্ড ভরবেগে পলানের বুকে ঢুঁ মারল মাথা দিয়ে। পলান ছিটকে গিয়ে পড়ল স্টেজের পিছনদিকের কাপড়ের দেওয়ালে। ওর মুখ থেকে একটা 'আঁক' শব্দ বেরিয়ে এল শুধু। কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে গিয়ে পলানের বডি তার ভেতরে কিছুটা ঝুলে পড়ল থলের মতো।

নিতুয়ার লেঠেলরা পলানের জোড়া চ্যালার তরোয়ালদুটো সরিয়ে দিয়েছিল নিরাপদ জায়গায়—চ্যালাদের নাগালের বাইরে। এখন পলানকে পড়ে যেতে দেখেই ওরা দৌড়ে গেল পলানের কাছে। ওকে টেনে তুলল, সোজা করে দাঁড় করাল। দুজন ওর পকেট সার্চ করে মেশিনটা খুঁজে পেল। একজন সেটা টেনে বের করে নিয়ে এল পকেট থেকে। তারপর ওটা ওদের হাতে-হাতে এগিয়ে গেল জোড়া তরোয়ালের পথে।

নিতুর চারজন 'ক্যাডার' পলানকে চেপে ধরে রেখেছিল। আর সেই বাঁধনে বাঁধা পড়ে পলান ফুঁসছিল। ঘেন্না আর রাগ নিয়ে তাকিয়ে ছিল রোশনের দিকে। একটু আগে ঢুঁ খেয়ে ওর বুকে ব্যথা টনটন করছিল।

রোশন চট করে মাইকের কাছে চলে এল। বারবার বলতে লাগল, 'আপনারা কেউ যাবেন না। প্লিজ। আর কোনও ভয় নেই—আর কোনও গোলমাল হবে না। আপনারা সবাই শান্ত হয়ে বসুন। প্লিজ, যাবেন না।

আমার কথাগুলো শুনে যান—জেনে যান, আমি জেল-খাটা দাগি আসামি কি না...। প্লিজ, আপনারা বসুন...'

রোশন বলতে শুরু করল, 'তখন আমার বয়েস বাইশ বছর। কলকাতায় ট্যাক্সি চালিয়ে সামান্য কিছু রোজগার করি। সেই রোজগারে আমি আর আমার বিধবা মা কোনওরকমে দিন চালাই—।'

এমন সময় ভিড়ের কিনারা থেকে একটা লোক হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, 'রোশন! রোশন! চুপ করো—আমি যাচ্ছি—আমি সবাইকে জানাচ্ছি সব কথা—।'

দুনুদা। দীনেশ সামন্ত।

দীনেশের কালো মুখ ঘামে ভেজা। চোখে উৎকণ্ঠা। ভিড়ের মধ্যে থেকে গলা লম্বা করে রোশনের দিকে তাকিয়ে আছে। দীনেশ খেয়াল করেনি, অন্যান্য বহু মানুষ কৌতূহলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

দীনেশ সামন্ত ভিড় ঠেলে এগোতে লাগল স্টেজের দিকে। ওর মুখটা আশাপুরে অচেনা। তাই অনেকেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'লোকটা কে? একে তো আশাপুরে আগে দেখিনি!'

স্টেজের ডানদিকের সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেল দীনেশ। তক্তা ঠুকে তৈরি তিনটে সিঁড়ির ধাপ। সিঁড়ি পেরিয়ে স্টেজ। তারপর রোশনের পাশে। মাইকের সামনে।

সুরেন দাসের মোবাইলে খবর চলে গিয়েছিল বেশ কিছুক্ষণ আগেই। কিন্তু তিনি থানা থেকে বেরোননি। তিনি খবর পেয়েছিলেন যে, প্রাইমারি স্কুলের মাঠে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানকে ঘিরে লোকজন বেশ ভালোই জড়ো হয়েছে। এবং দাঁড়িপাল্লা ঝুঁকে পড়েছে পলানের উলটোদিকে। সুতরাং জায়গাটাকে এখন এড়িয়ে চলাই ভালো। একটা হেস্তনেস্ত আগে হয়ে যাক—তারপর সুরেন দাস ঠিক করবেন যে, কোনদিকে যোগ দেবেন। তবে ওঁর মোবাইল ফোনে ঘন-ঘন ফোন আসছিল—যদিও সুরেন একটা ফোনও রিসিভ করছিলেন না।

রোশনের কাঁধে স্নেহের হাত রেখে দীনেশ সামন্ত মাইকে বলতে শুরু করল, 'পলানবাবু রোশনের নামে এতক্ষণ যা-যা বলেছেন সেগুলো মোটেই সত্যি নয়। রোশনকে জেল খাটতে হয়েছিল, কারণ, ও একটা অচেনা ছেলের জান বাঁচিয়েছিল। আমি ওর সব ঘটনা জানি—কারণ, আমি ওর সঙ্গে জেলে ছিলাম...।'

দীনেশ সামন্ত বলেই চলল, বলেই চলল। মনে হচ্ছিল, ওর ওপরে কিছু একটা ভর করেছে। মঞ্চ আর মাঠে হাজির লোকজন দীনেশের কথা শুনতে লাগল, আর মাঝে-মাঝেই হইহই করে উঠতে লাগল।

পলান নিতুর ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে যুঝছিল, নিজেকে ছাড়ানোর জন্য হাত-পা মোচড়াচ্ছিল। বলতে গেলে পলান ওদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিই করছিল, কিন্তু নিজেকে ছাড়াতে পারছিল না। তাই ওর মুখ চলছিল। আকথা-কুকথার জঘন্য স্রোত বেরিয়ে আসছিল ওর মুখ থেকে।

স্টেজে দাঁড়ানো সিনিয়ার মানুষরা আশঙ্কায় কাঁপছিলেন। স্টেজে থাকবেন, না কি স্টেজ থেকে নেমে যাবেন, সেটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

রোশন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। দীনেশ সামন্তর কথা শুনতে-শুনতে ওর চোখ ভিজে আসছিল। ওর মনে হচ্ছিল, দুনুদা ওর ভালোটাকে বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে-টারিয়ে বলছে। সত্যিই কি ও বেশ কিছু ভালো কাজ করেছে, মানুষের কাজে লেগেছে? ওর জীবনটা তা হলে পৃথিবীর বুকের ওপরে অর্থহীন ফালতু বোঝা নয়?

হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছল। ঠিক তখনই পিঠের ওপরে দুনুদা ছাড়াও আরও কয়েকটা হাতের ছোঁয়া পেল। সেই ছোঁয়াগুলোয় বাবার আন্তরিক মমতা মাখানো।

পিছন ফিরে তাকাল রোশন।

চারজন বয়স্ক মানুষ দু-পাশ থেকে ওর কাছে এগিয়ে এসেছেন।

হাত রেখেছেন ওর পিঠে।

শিরা ওঠা, চামড়ায় ভাঁজ পড়া হাত। সেই হাতগুলোর কোনও-কোনও আঙুলে রঙিন আংটি। নখের রং হলদেটে। অথচ এই পুরোনো হাতগুলো থেকে স্নেহ, ভালোবাসা আর আশীর্বাদ অলৌকিক স্রোতে ভেসে

চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঢুকে পড়েছিল রোশনের দুঃখ-ভেজা অপমানিত শরীরে। রোশনের পিছন থেকে সেই হাতগুলোর চারজন মালিক যেন একসঙ্গে কোরাসে বলে উঠলেন, 'রোশন, আমরা তোমাকে ভালোবাসি। আশাপুর তোমাকে ভালোবাসে...।'

রোশন একরাশ আবেগ নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে একজন বৃদ্ধ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

জনগণের হইহই চিৎকার কয়েক পরদা চড়ে গেল।

'রোশন! রোশন!' বলে চেঁচিয়ে উঠল কমবয়েসি ছেলের দল।

প্রথম আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হতে-না-হতেই সুধীরডাক্তারবাবু রোশনকে বুকে টেনে নিলেন। ওঁর চোখে জল। ধরা গলায় বললেন, 'তুই আমাদের ছেলে। আশাপুর তোকে ভালোবাসে।'

মাইকে কথাগুলো শোনা যাচ্ছিল। রোশনের বুকের ভেতরে একটা চাপা আবেগ অন্তঃসলিলা নদীর ঢেউয়ের মতো ওর হৃদয়ের একূল-ওকূল দু-কূল ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

দীনেশ সামন্ত আপনমনে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছিল আর বলছিল, 'না, না—মিথ্যে কথা বলতে পারব না—।'

বিশ্বরূপ জোয়ারদার একটু দেরি করে মাঠে এসে হাজির হয়েছিলেন। একটা চেয়ার জোগাড় করে বসে-বসে দেখছিলেন স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। দেখতে-দেখতে ওঁর মনে হচ্ছিল, আশাপুরে রোশনের মতো একটা টগবগে তাজা ছেলে ভীষণ দরকার।

অবনীমাস্টারমশাই খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে মাইকের কাছে এগিয়ে এলেন। পলানের চড় আর লাথি ওর সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছিল। কোনওরকমে তিনি বললেন, 'আমাদের অনুষ্ঠান আবার শুরু হচ্ছে—' পলানের দিকে আঙুল দেখিয়ে আরও বললেন, 'পলান নস্করের মতো এই নোংরা জানোয়ারটার জন্য আমাদের অনুষ্ঠানের মাঝে এরকম বিঘ্ন ঘটে গেল...।'

কথাটা শুনে ভয়ংকর জ্বালায় জ্বলে উঠল পলান। ভলান্টিয়ারদের হাতে প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে পশুর মতো গর্জে উঠল। ভলান্টিয়াররা ওর শক্তির সঙ্গে আর এঁটে উঠতে পারছিল না। পলানের এক-এক টানে ওরা বারবার এদিক থেকে ওদিকে টলে যাচ্ছিল।

নিতুয়া কখন যেন ভিড় ঠেলে স্টেজের কাছে চলে এসেছিল। ও পলানকে জোরে ধমকে উঠল। একইসঙ্গে স্টেজের সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ল ওপরে। উত্তেজিত হয়ে ছুটে গেল পলানের কাছে। ওর গালে সপাটে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল।

তার পরের ঘটনাটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল।

বন্দি পলান কেউটের ছোবলের মতো নিমেষে গলা বাড়িয়ে খ্যাঁক করে নিতুয়ার টুটি কামড়ে ধরল।



টিভিতে দেখা ছবি চোখের সামনে ভাসছিল।

খোলা মাঠের ওপর দিয়ে জেব্রার দল ছুটে চলেছে। ওদের ছুটন্ত শরীর যেন অসংখ্য কালো বিদ্যুতের রেখা। দলের মধ্যে একটি জেব্রাকে বেছে নিয়ে ধাওয়া করেছে একটি ক্ষিপ্র চিতা। লম্বা-লম্বা লাফে শিকারের সঙ্গে নিজের দূরত্ব ক্রমশই কমিয়ে ফেলছে। দূরত্ব কমতে-কমতে শেষে ছুটন্ত চিতা জেব্রাটির প্রায় পাশাপাশি। তারপর নিখুঁত একটি লাফ। জেব্রার গলা কামড়ে ধরেছে চিতা। পায়ের নখ বিঁধিয়ে দিয়েছে জেব্রার শরীরে। চিতাকে বয়ে নিয়ে জেব্রা তখনও ছুটে চলেছে। তার গতি ক্রমশ কমে আসছে। চিতার কামড়ের পাশ দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে গলা থেকে।

একটামাত্র মুহূর্ত, কিন্তু তার মধ্যেই স্লো মোশনে ওপরের দৃশ্যটা দেখছিল পলান। হিংস্র চিতার মতো নিতুয়ার টুটি কামড়ে ধরেছে ও। প্রথমে ঘামের গন্ধ পেয়েছে পলান। তারপর জিভে নোনতা স্বাদ। আর

সবশেষে রক্তের গন্ধ—রক্তের আঁশটে গন্ধ।

নিতুয়া, একটা থার্ড ক্লাস উঠাইগিরা, আশাপুরের নর্দমার পোকা! ওর এত বড় সাহস যে, পলানের গায়ে হাত তোলে! আগে পলানকে দেখলেই যে-শুয়োরের বাচ্চাটার হাতে-পায়ে কাঁপুনি ধরত, তার এত বড় আস্পর্ধা!

রোশন হারামিটার জন্যই এই দুঃসাহস হয়েছে নিতুয়ার। শুধু নিতুয়া কেন, রোশন আশাপুরে আসার পর থেকে আরও অনেকেরই সাহস গজিয়েছে ধীরে-ধীরে।

পলান জিভে রক্তের স্বাদ পাচ্ছিল। বহু বছর পর এই স্বাদ আবার পেল ও। ছোটবেলায় একবার একটা বড় ক্যাডবেরি চকোলেট বায়না করে ভীষণ জেদ করছিল পলান। বাবা কিংবা মা, কারও কথাতেই শান্ত হচ্ছিল না ও। শেষমেশ পিসি এগিয়ে আসে ওকে শান্ত করার জন্য। তখন তুমুল খেপে গিয়ে ও পিসির হাতে কামড়ে দিয়েছিল। এত জোরে কামড়েছিল যে, চামড়া, মাংস ইত্যাদি ফুটো হয়ে পলানের দাঁত চলে গিয়েছিল অনেক গভীরে। পলান তখন রক্তের স্বাদ পেয়েছিল। এখন, এত বছর পরে, সেই স্বাদটা আবার ফিরে এল যেন।

পলানের এই কাণ্ড দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। ও যে জানোয়ার সেটা সবাই জানলেও ও যে এতটা জানোয়ার সেটা বোধহয় কেউ কল্পনাও করেনি। অনেকেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আতঙ্কের চিৎকারও করছে কেউ-কেউ।

নিতুয়া কিন্তু চিৎকার করতে পারছিল না। অসহ্য ব্যথা আর যন্ত্রণা ভালোমতন টের পাচ্ছিল ও। তবে সেগুলোকে ছাপিয়ে গিয়েছিল ওর শ্বাসকষ্ট। পলান ওর টুটি কামড়ে ধরায় নিতুয়ার শ্বাসনালী সাঁড়াশির চাপে পড়ে গিয়েছিল। ওর মনে হচ্ছিল, যেন এখুনি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। ওর চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসছিল, দু-কানে শোঁ-শোঁ শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ও দু-হাতে পলানকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু পেরে উঠছিল না।

রোশনের ভলান্টিয়াররাও কিছুতেই পলানকে কবজা করতে পারছিল না। পলানের গায়ে যেন বুনো মোষের শক্তি। ধস্তাধস্তি করতে-করতে পলানের ঘামে ভেজা বাঁ-হাতটা হঠাৎই ভলান্টিয়ারদের বাঁধন থেকে স্লিপ কেটে ছিটকে গেল। তখন পলান নিতুর ডানহাত খামচে ধরে শিকারকে আরও কাছে টেনে নিল।

পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারল রোশন। ও এটাও বুঝতে পারল, পলানকে কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করে আর লাভ নেই। জানোয়ার জানোয়ারের ভাষা বোঝে—সে মানুষের ভাষা বোঝে না।

অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় পলানের ঠিক পিছনে চলে এল রোশন। একপলক দেখল ওর নিতুদার দিকে। ওর চোখ বুজে এসেছে, মুখের মাংসপেশি ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে। এখুনি হয়তো দম বন্ধ হয়ে যাবে।

রোশনের ডানহাত পিছন থেকে ছোবল মারল পলানের নাকে। আর বাঁ-হাতে মুঠো করে ধরল পলানের চুল। রোশনের হাতের বজ্রটানে পলানের মাথা হেলে গেল পিছনে। কিন্তু নিতুয়ার গলা থেকে পলানের দাঁত একচুলও ঢিলে হল না। ফলে নিতুয়ার মাথাটা ঝুঁকে এল রোশনের দিকে। নিতুয়ার যন্ত্রণা আর কষ্ট বেড়ে গেল বেশ কয়েক গুণ। ওর মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ওর দম আটকে গেল, এই বুঝি চির-অন্ধকার নেমে এল চোখে।

ঠিক সেই মুহূর্তে রোশনের তর্জনী আর মধ্যমা ঢুকে গেল পলানের নাকের ফুটোয়। এবং রোশন প্রাণপণে সেই দুটো আঙুল টানতে লাগল পলানের কপালের দিকে।

প্রথমত, নাকের ফুটো দুটো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পলান শ্বাস নিতে পারছিল না। ফলে ওকে মুখ খুলতে হল শ্বাস নেওয়ার জন্য। তখনই ওর দাঁতের পাটি নিতুর গলার মাংস ছেড়ে দিল। পলানের ঠোঁট আর দাঁত তখন লালে লাল।

পলান কামড় ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নিতুয়ার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এক মর্মান্তিক আর্তচিৎকার—যে-চিৎকারটা এতক্ষণ ওর গলায় বন্দি হয়ে ছিল। তারপর চিৎকারটা চলতেই লাগল।

নিতুয়ার টুটির কাছটা রক্তে লালে লাল। ভালো করে ঠাহর করলে দেখা যাচ্ছে গভীর দাঁতের দাগ। পলানের ধারালো দাঁতের কয়েকটা নিতুর চামড়া-মাংস ভেদ করে ঢুকে গেছে ভেতরে। দুজন ভলান্টিয়ার ছুটে এসে নিতুয়াকে জাপটে ধরল।

রোশনের আক্রমণের দ্বিতীয় অ্যাডভানটেজ ছিল, শত্রুর শরীরে সবচেয়ে নাজুক অংশে ও ওর কবজা পত্তন করেছে। নাকের ফুটোয় দু-আঙুল ঢুকিয়ে কপালের দিকে টেনে এনে শত্রুকে নিজের নোকর বানিয়ে ছেড়েছে রোশন।

নাকের মাংসে অসহ্য যন্ত্রণা কমাতে পলান চিত হয়ে হেলে পড়েছিল রোশনের গায়ে। একইসঙ্গে দু-হাতে খামচে ধরেছিল রোশনের ডানহাত। যন্ত্রণার গোঙানি বেরিয়ে আসছিল ওর মুখ থেকে।

না, আর কোনও ক্ষমা নেই। এ-লড়াই জঙ্গলে দুই হিংস্র পশুর লড়াই। রোশনকে পশু অবতার হয়ে এই লড়াইয়ের হেস্তনেস্ত করতে হবে।

একসেকেন্ডও দেরি করল না রোশন। পলকে সামনে গলা বাড়িয়ে দিল ও। পলানের বাঁ-হাতের কবজির নাগাল পেয়েও গেল। আর তারপরই সেই কবজিতে বসিয়ে দিল ভয়ংকর এক কামড়। ওর দাঁতগুলো যেন নিমেষে বদলে গেল হায়নার দাঁতে।

চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, কামড়ের বদলে কামড়।

পলান ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠল। ওর মুখ হাঁ হল। সঙ্গে-সঙ্গে এক হ্যাঁচকায় ওর নাকের ফুটোয় আঙুলের টান দশ কি বিশ নিউটন বেড়ে গেল। নাকের মাংস খানিকটা ছিঁড়ে উঠে এল ওপরদিকে।

ওই অবস্থাতেই পলানের বডিটাকে টান মেরে স্টেজের ওপরে পেড়ে ফেলল রোশন। পলানের তখন হাওয়া বেরিয়ে গেছে।

ওর চিত হয়ে পড়ে থাকা শরীরের দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে রোশন বলল, 'পলানদা, তোমার কালো রঙের খেলা সব শেষ। এবার সাদা রঙের খেলা শুরু। দ্যাখো, তোমার এখন কী হাল করি!'

স্টেজের ওপরে ভিড় জমে গিয়েছিল। আহত নিতুয়াকে নিয়ে চার-পাঁচজন ছেলেপিলে তড়িঘড়ি করে রওনা হল হেলথ সেন্টারের দিকে।

মাঠে দর্শকদের অবস্থা প্রায় ছত্রখান বলাটাই ভালো। তবে বহু মানুষ পলান আর রোশনের মোকাবিলা দেখার জন্য আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সকলেই মনে-মনে চাইছিল এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে রোশন জিতুক। কারণ, ওদের কাছে পলান একরকম অসহ্য হয়ে উঠেছে।

মঞ্চে দাঁড়ানো সিনিয়াররা বারবার রোশনের নাম ধরে ডাকছিলেন। রোশন পলকের জন্য ফিরে তাকাল ওঁদের দিকে। বড়-বড় শ্বাস টানতে-টানতে বলল, 'ডাক্তারবাবু, মাস্টারমশাই—আর দু-পাঁচ মিনিট—তারপরই আমাদের প্রোগ্রাম আবার শুরু হবে...।'

দু-চারজন ছেলেকে কাছে ডাকল রোশন। রোশনের ইশারায় সাড়া দিয়ে চার-পাঁচজন ছেলে চটপট ওর কাছে এগিয়ে এল।

রোশন পলানের দিকে তাকাল। ওর মুখ রক্তে মাখামাখি। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। নাকের মাংস ছিঁড়ে গেছে। দু-চোখে ভয় নিয়ে তাকিয়ে আছে রোশনের মুখের দিকে। ওর বাঁ-হাতের কবজি থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। একইসঙ্গে পলানকে বীভৎস এবং করুণ দেখাচ্ছে। ওর ঠোঁট আর গালের পেশি তিরতির করে কাঁপছে।

ছেলেগুলো রোশনের কাছে এসে পলানের দিকে একবার ঘেন্নার চোখে তাকাল, তারপর রোশনকে জিগ্যেস করল, 'একে কি ট্রিটমেন্টের জন্যে কোথাও নিয়ে যাব?'

পলানের দিকে তাকিয়ে চোখ রেখে রোশন ঠান্ডা গলায় বলল, 'কোথায় আর নিয়ে যাবে? আমাদের এখানে তো আর জানোয়ারদের হাসপাতাল নেই। ওর ট্রিটমেন্ট এখানেই হবে—।'

কয়েকসেকেন্ড চুপ করে থেকে রোশন আবার বলল, 'একে তুলে নিয়ে যাও। স্টেজের সামনে দাঁড় করিয়ে পিছমোড়া করে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে দাও। দেখবে, ওর বডিটা যেন একদম খাড়া হয়ে থাকে—যাতে যে-কেউ এসে ওকে সহজে চড়-থাপ্পড় মারতে পারে।' হাত দিয়ে মুখ মুছল রোশন। টের পেল, গলা শুকিয়ে গেছে, খুব জলতেষ্টা পাচ্ছে।

ছেলেগুলো যখন পলানকে বাগিয়ে ধরে চাগিয়ে তুলছে তখন রোশন বলল, 'যদি কোনওরকম নক্কাছক্কা করে তা হলে ধরে বেধড়ক ক্যালাবে। একেবারে ফ্রি স্টাইলে ক্যালাবে। কোথায় রক্ত বেরোল কি হাড় ভাঙল সেসব নিয়ে ভাববে না। তোমরা বরং দু-একটা আধলা ইট হাতে নিয়ে নাও—।'

পাঁচজন ছেলে পলানকে নিয়ে চলে গেল।

ওরা স্টেজ থেকে নেমে যেতেই রোশন দুজন ভলান্টিয়ারকে কাছে ডাকল। বলল, স্টেজটাকে একটু ঠিকঠাক করে গুছিয়ে দিতে। কারণ, একটু আগের হাতাহাতি আর ধস্তাধস্তিতে দুটো চেয়ার উলটে পড়ে গেছে। খাটো টেবিলে চারটে ছোট-ছোট জলের বোতল দাঁড় করানো ছিল, তার মধ্যে দুটো কাত হয়ে গড়িয়ে পড়েছে স্টেজের সাদা চাদরের ওপরে।

ডাক্তারবাবু, মাস্টারমশাই ও আরও চারজন সিনিয়ার এগিয়ে এলেন রোশনের কাছে।

একজন রোশনকে জিগ্যেস করলেন, 'এখন কী করব আমরা? মাঠের তো এই অবস্থা!'

রোশন মাঠের দিকে তাকাল।



দর্শকরা অনেকেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। এখানে-সেখানে ভিড় জমিয়ে জটলা করছে। ছোটদের কেউ-কেউ এখনও বসে আছে পলিথিনের ওপরে—বাকিরা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফাংশান শেষ হয়ে যাওয়ার পর মাঠের যেরকম বিশৃঙ্খল অবস্থা হয় মোটের ওপর স্কুল-মাঠের চেহারাটা অনেকটা সেইরকম।

রোশনের খুব তেষ্টা পাচ্ছিল। ও অবনী মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে অনুমতি চাওয়ার ঢঙে বলল, 'মাস্টারমশাই, খুব তেষ্টা পাচ্ছে। এই বোতল থেকে একটু জল খাব?' টেবিলে রাখা জলের বোতলের দিকে দেখাল রোশন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—খাও...খাও...।' তড়িঘড়ি বলে উঠলেন মাস্টারমশাই।

রোশন একটা বোতল তুলে নিয়ে ঢকঢক করে জল খেল। তারপর হাত দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে মাইকের সামনে গিয়ে দাড়াল আবার।

'আপনারা সবাই যার-যার জায়গায় বসে পড়ুন। আমাদের ফাংশান সত্যি-সত্যি আবার শুরু হচ্ছে। প্লিজ, যার-যার জায়গায় বসে পড়ুন....প্লিজ, বসে পড়ুন...।'

দর্শকরা মুখ ফিরিয়ে রোশনের দিকে তাকাল। এত কাণ্ডের পর ফাংশান আবার শুরু হবে!

ওদের অনেকেই স্টেজের কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পলান নস্করকে পাঁচ-সাতজন ছেলে-ছোকরা স্টেজের সঙ্গে যে পিছমোড়া করে বাঁধছিল সেটা ওরা সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। ওরা অবাক হয়ে ভাবছিল, এরকমটাও তা হলে করা যায়! যে-পলান নস্কর এলাকার ত্রাস, যার মুখোমুখি হলেই অনেকের হাত-পা কাঁপত, তাকে সাধারণ ছেলের দল পিছমোড়া করে বাঁধছে!

অনেকেই মোবাইল ফোন বের করে পটাপট ছবি তুলতে লাগল।

পলানের নাকে-মুখে রক্তের ধারা। কী বীভৎস দেখাচ্ছে ওকে! সেই অবস্থাতেই নোংরা ছেলেটা নোংরা গালিগালাজ করে চলেছে।

রোশন স্টেজের ওপরে দাঁড়িয়ে পলানকে স্টেজের সঙ্গে বাঁধার ব্যাপারটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। পলানের শরীর দুর্বল হয়ে এসেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ও মাঝে-মাঝে ফুঁসে উঠছিল, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

রোশন চেঁচিয়ে বলল, 'ঝামেলা করলেই ওকে কেলিয়ে দাও—কিল, চড়, লাথি, ঘুসি যা পারো...।'

রোশনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দু-খানা থাপ্পড় সপাটে এসে আছড়ে পড়ল পলান নস্করের দু-গালে। ক্যাপ ফাটার মতো শব্দ হল। পলানের মাথাটা একবার ডানদিকে একবার বাঁ-দিকে ছিটকে গেল। ছেলেদের মধ্যে দুজন হাত চালিয়ে দিয়েছে।

রোশন মাঠের মধ্যে পলানের চ্যালাদের খুঁজছিল। কোথায় গেল ওরা? নোনতা, কাটা নগেন, সুবু, কানুয়া ওরা সব গেল কোথায়? ওদের হিরো বেধড়ক মার খাচ্ছে অথচ তাকে বাঁচাতে ওরা অস্ত্র নিয়ে ছুটে আসছে না!

মাঠের এখানে-সেখানে নজর চালিয়ে রোশনের চোখ পলানের চ্যালাচামুণ্ডাদের কাউকে খুঁজে পেল না। পাবলিকের ধোলাইয়ের ভয়ে নিশ্চয়ই ওরা সব পালিয়েছে।

পলানকে স্টেজের সঙ্গে বাঁধার কাজ হয়ে গিয়েছিল। ওর পেটানো শরীরটা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর দু-হাতের কবজি দড়ি দিয়ে বাঁধা। দু-পায়ের গোড়ালিকে ঘিরে নিষ্ঠুর দড়ির প্যাঁচ। এ ছাড়া পেটে, বুকে, গলায় শক্ত দড়ি ওকে সাপের মতো সাপটে ধরেছে।

পলানকে কাছ থেকে দেখার জন্য মাঠের পাবলিক ওকে ঘিরে জড়ো হয়েছে। সেই আগ্রহী ভিড়ে বাচ্চা, বুড়ো, পুরুষ, মহিলা কেউ বাদ নেই।

কয়েকজন সিনিয়ার রোশনের কাছে এগিয়ে এলেন। তার মধ্যে সুধীর ডাক্তারবাবুও ছিলেন।

ডাক্তারবাবু রোশনকে জিগ্যেস করলেন, 'এখন কি প্রোগ্রাম আবার স্টার্ট হবে?'

রোশন সায় দিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। আমি মাইকে একটু বলে দিই—। আপনারা আমার পাশে থাকুন...।'

আবার মাইকের কাছে এল রোশন। ওর দুপাশে ডাক্তারবাবুরা কয়েকজন দাঁড়ালেন।

'আপনারা যার-যার জায়গায় বসে পড়ুন। আমাদের প্রোগ্রাম আবার শুরু হচ্ছে। আমাদের প্রোগ্রামের প্রধান আকর্ষণ পলান নস্কর...।'

এই কথায় সুধীর ডাক্তারবাবুরা চমকে উঠলেন।

প্রোগ্রামের প্রধান আকর্ষণ পলান নস্কর!

'হ্যাঁ, পলান নস্কর। কারণ, আজ পলান নস্করের ওপর গোটা আশাপুরের প্রতিশোধের পালা। বছরের পর বছর ধরে পলান নামের এই মাফিয়া জানোয়ারটা আশাপুরের ওপরে টরচার করে চলেছে। আশাপুরের মানুষ মুখ বুজে সেই অত্যাচার সহ্য করে এসেছে। কিন্তু আর নয়—এবার প্রতিশোধের পালা। আজ থেকে দান ঘুরে গেছে। আশাপুরের মানুষ আজ দেখিয়ে দেবে তারা কিছু কম নয়। আশাপুরের মানুষ পলান নস্করের ওপরে আজ এমন বিচিত্র প্রতিশোধ নেবে যে, সেই প্রতিশোধ পলান নস্কর চিরকাল মনে রাখবে।

'এবার মন দিয়ে শুনুন!' রোশন ওর মুখটাকে মাইকের আরও কাছে নিয়ে এল। মাইকের স্ট্যান্ডটাকে আঁকড়ে ধরে বলে চলল, 'পলান নস্করকে আপনাদের সামনে আমরা আজ পেশ করেছি। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গুন্ডাটা আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে। যেসব মানুষের পলানের ওপরে রাগ আছে, ক্ষোভ আছে, তাঁরা সবাই এগিয়ে আসুন পলানের দিকে—ওর গায়ে থুতু দিন, লাথি-চড়-ঘুসি যা খুশি বসিয়ে দিন ওই জানোয়ারটার শরীরে। পুরোনো সব দিনগুলোর কথা মনে করুন, তারপর নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন আপনার রাগ নিয়ে। আপনার রাগ আর ঘেন্না উগরে দিন পলান নস্করের ওপরে।

'এটাই আমাদের প্রোগ্রামের আজ মেন অ্যাট্রাকশন। থুতু, লাথি, চড়, কিল, ঘুসি—যার যা খুশি—।'

রোশন বেশ কয়েকবার শেষ লাইনটা রিপিট করল। রিপিট করার সময় লাইনটাতে একটা ছন্দের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

মাঠের জনগণের মধ্যে থেকে হইহই আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

হঠাৎই দুটো হাওয়াই চটি উড়ে এল পলানকে লক্ষ্য করে। তারপরই কিছু খুচরো গালিগালাজ ভেসে এল বাতাসে।

রোশন ডাক্তারবাবুকে বলল, 'এবার আমাদের প্রোগ্রাম স্টার্ট করুন, ডাক্তারবাবু—।'

'এরকম অবস্থায় প্রোগ্রাম শুরু করা যায়?' সুধীরডাক্তার খানিকটা যেন অসহায়ভাবেই রোশনের দিকে তাকালেন।

রোশন বলল, 'প্লিজ, প্রোগ্রাম শুরু করুন, ডাক্তারবাবু। কারণ, পুলিশ যদি এসে ঝামেলা করে তা হলে আমরা বলতে পারব পলান নস্কর আমাদের প্রোগ্রামে গণ্ডগোল করছিল বলে আমরা ওকে এভাবে বেঁধে রেখেছি।' অবনী মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকাল রোশন : 'প্লিজ, মাস্টারমশাই, প্রোগ্রাম শুরু করুন শিগগির!'

সঙ্গে-সঙ্গে মাস্টারমশাই মাইকের সামনে এসে বক্তৃতা শুরু করে দিলেন। দেখতে-দেখতে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। কয়েকজনের বক্তৃতা আর গানের পরই 'বন্দে মাতরম' আর 'জয় হিন্দ' জিগির তুলে জাতীয় পতাকা তোলা হল। মাইকে বাজতে লাগল জাতীয় সঙ্গীত।

ঠিক সেই সময়ে দুটো ছেলে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মেশানো পায়ে এগিয়ে এল পলান নস্করের কাছে। তারপর 'থু—থু—' করে ওর মুখে থুতু ছুড়ে দিল।

উত্তরে পলান নোংরা গালাগাল দিলেও ছেলে দুজন সেটা গায়ে মাখল না। বরং আবার থুতু দিল পলানের মুখে।

এই ছেলে দুজনের দুটো ছোট-ছোট দোকান আছে আশাপুরে। একজনের জামাকাপড় ইস্তিরির দোকান, আর-একজনের তেলেভাজার দোকান। পলান এই দুজনের কাছ থেকেই নিয়মিত তোলা তুলত।

ব্যস, জনতার দ্বিধা আর সংকোচ কেটে গেল। অনেকেই এবার সাহস করে এগিয়ে আসতে লাগল পলান নস্করের কাছে। তারপর পালা করে শুরু হয়ে গেল থুতু, লাথি, চড়, কিল, ঘুসি—যার যা খুশি।

তখন মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে : 'ছোটরা, মন দিয়ে শোনো। এবার তোমাদের জন্যে বিলি করা হচ্ছে লজেন্স, বিস্কুট আর ছোট-ছোট ফ্ল্যাগ। হুড়োহুড়ি না করে তোমরা শান্তভাবে লজেন্স, বিস্কুট আর পতাকা নাও। লজেন্স, বিস্কুট তোমরা খাবে, আর পতাকাটা হাতে নিয়ে নানা জায়গায় ছুটোছুটি করে বেড়াবে। আজ স্বাধীনতা দিবস। মনে রাখবে, আমরা সবাই স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক। নাও, হুড়োহুড়ি না করে তোমরা সবাই লজেন্স, বিস্কুট আর পতাকা নাও...।'

এরপর লজেন্স, বিস্কুট আর পতাকা বিলি করা শুরু হল। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট-ছোট হাত বাড়িয়ে সেগুলো নিতে লাগল।

মাইকে তখন দেশাত্মবোধের নানান গান বাজছে। আর উৎসাহী জনগণ পলানের কাছে এসে তাদের পুরোনো অপমান সুদে-আসলে ফেরত দিচ্ছে।

সবমিলিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

এই অদ্ভুত অনুষ্ঠানের কথা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল আশাপুরের আনাচেকানাচে। যেভাবে রক্ত পৌঁছে যায় শিরায়-শিরায়, ঠিক সেইভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল খবরটা। তাই দলে-দলে মানুষ হেঁটে আসছিল স্কুল-মাঠের দিকে।

হঠাৎই দেখা গেল একজন রোগা মানুষকে। দুটো ছেলের শরীরে ভর দিয়ে সে হেঁটে আসছে।

মানুষটার ডানহাতে ব্যান্ডেজ। গুলির ক্ষত এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি।

কিশোরীমোহন সামন্ত।

পলানের হেনস্থার খবর পেয়ে একরকম জেদ করেই অসুস্থ শরীরে চলে এসেছেন স্কুল-মাঠে।

কিশোরীমোহন আগের চেয়ে আরও অনেক রোগা হয়ে গেছেন। বলতে গেলে প্রায় কঙ্কালসার চেহারা এখন। মুখ ভরতি কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। তবে চোখ দুটো এখনও উজ্জ্বল ভেদী দৃষ্টি ছুড়ে দিচ্ছে। মনে হয়, দুটো বর্শার ফলা যেন তাকিয়ে আছে।

কিশোরী ওঁর সঙ্গী ছেলে দুটোকে কিছু একটা বলছিলেন। ওঁকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

ওরা তিনজনে ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল পলানের কাছে।

পলানের দড়ি বাঁধা বিধ্বস্ত চেহারাটা ভালো করে দেখলেন কিশোরী। চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন বন্দি জানোয়ারটার মাথা থেকে পা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। তারপর একগাল হাসলেন।

'কী পলান, কেমন আছ? বোম-টোম আর তৈরি করছ না?' কিশোরীমোহন মুখে হাসি নিয়ে জিগ্যেস করলেন। ওঁর গলার স্বর বেশ দুর্বল। বোঝা যায় পলানের গুলি আর চিকিৎসার ধকলে মানুষটার জীবনীশক্তি অনেকটাই ক্ষয়ে গেছে।

কিশোরীমোহনকে ঘিরে মানুষজনের ভিড় জমে গিয়েছিল। অনেকেই জানে যে, পলান কিশোরীমোহনের হাতের পাতায় গুলি করেছিল। এই দুর্ঘটনার আগে থেকেই ওরা কিশোরীকে চিনত। কিন্তু ওই ঘটনার পর আশাপুরের আরও অনেক মানুষ ওঁকে চিনে গেছে।

স্টেজের এক কোণে দাঁড়িয়ে রোশন কিশোরীমোহনকে দেখছিল। অসহায় পলানকেও দেখছিল। এলোমেলোভাবে ভিড় করে থাকা লোকজনকে দেখছিল। তাদের হইচই, খুশি, উত্তেজনা সবকিছুই রোশনকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। মাইকে গান বাজছে : 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা...।'

ডাক্তারবাবু, মাস্টারমশাইরা স্টেজের মাঝখানে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁদের চোখে-মুখে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। এরপর কী হবে? কী করা উচিত এরপর? মাঝে-মাঝেই রোশনের দিকে তাকাচ্ছেন ওঁরা। কিন্তু রোশন কীরকম এক সমাহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে স্কুল-মাঠের দিকে—যেন পাখির চোখে মাঠটাকে দেখছে।

কিশোরীমোহনের প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয়নি পলান। কীই-বা উত্তর দেবে আর! আজ ওকে অপমানে-অপমানে পথের ধুলোরও অধম করে দিয়েছে রোশন। আশাপুরের চরণতলেও ওর আর ঠাঁই নেই। ও এখন আশাপুরের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন।

'কী আশ্চর্য দ্যাখো, পলান! কাল রাতে সায়ন এসেছিল। কী করে পেটো বাঁধতে হয় আমাকে শেখাচ্ছিল। তারপর কান্নাকাটি করছিল। বলছিল, আমাকে ছেড়ে থাকতে ওর ভালো লাগছে না। সেসব কথা বলতে-বলতে ও হঠাৎ চলে গেল।

'তারপর কী কাণ্ড দ্যাখো! সায়ন আবার দেখা দিল আজ সকালে। তোমার কথা বলল। বলল, আশাপুরের পাবলিক তোমাকে শাস্তি দিচ্ছে। বলেই আমার কাছে বায়না করতে লাগল। বারবার বলতে লাগল, ''বাপি,

তুমি কিন্তু ওই জানোয়ারটাকে শাস্তি দিয়ো! তিনজনের জন্যেই শাস্তি দেবে—আমার, মায়ের আর তোমার জন্যে...।''

'সেইজন্যেই তো কষ্ট করে এলাম, পলান—' কথাটা বলেই কিশোরীমোহন পলানের বাঁ-উরুতে এক লাথি মারলেন। বললেন, 'এটা আমার জন্যে।'

তারপর, দু-চার সেকেন্ড গ্যাপ দিয়ে, দ্বিতীয় লাথিটা মারলেন একই জায়গায় : 'এটা আমার স্ত্রীর জন্যে। পলান, তোমার মনে আছে তো, সায়ন মারা যাওয়ার পর আমার বউ গায়ে কেরোসিন ঢেলে সুইসাইড করেছিল?'

পলান একরাশ ঘেন্না আর রাগ নিয়ে কিশোরীমোহনকে দেখছিল, ওঁর ব্যান্ডেজ বাঁধা ডানহাতের পাতা দেখছিল।

'আর এবারের লাথিটা সায়নের জন্যে—।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই কিশোরীর রোগা পায়ের লাথি এসে পড়ল পলানের পটকায়।

আগের দুটো লাথি খেয়ে পলানের মুখ দিয়ে যন্ত্রণার এককণা শব্দও বেরোয়নি। কিন্তু এবারে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। ওর মুখও যন্ত্রণায় কুঁচকে হয়ে গেল।

কিশোরী হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলেন। দু-পাশ থেকে দুজন ছেলে ওঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। ওঁকে নিয়ে ফেরার পথ ধরল। কিশোরী চোখের জল মুছছিলেন না। ঝাপসা চোখে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন সামনের দিকে। ওঁর শুকনো দু-গাল জলে ভেসে যাচ্ছিল। পলানকে লাথি মেরে ওঁর ডান পা টনটন করছিল, আর সেইসঙ্গে বুকটাও। সায়ন আর সায়নের মায়ের কথা মনে পড়ছিল যে!

পলানের ওপরে খুচরো চড়-থাপ্পড়ের ব্যাপারটা চলতেই লাগল। তবে পাবলিক যে ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠছে সেটা সুধীরডাক্তারবাবুরা বেশ বুঝতে পারছিলেন।

ডাক্তারবাবু ভেতরে-ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন। এরপর যদি বাড়াবাড়িরকম কিছু হয়ে যায়! মাস্টারমশাইও ভাবছিলেন, ব্যাপারটা কন্ট্রোল করার জন্য কিছু একটা করা দরকার।

তিনি রোশনকে লক্ষ করে বললেন, 'রোশন, চড়-থাপ্পড়ের কেসটা বাড়তে-বাড়তে মব লিঞ্চিং না হয়ে যায়—।'

রোশন কথাটার ঠিকঠাক মানে বুঝতে পারল না। ওর মুখ দেখে সুধীরডাক্তার সেটা বুঝতে পারলেন। তাই তিনি বললেন, 'মাস্টারমশাই গণধোলাইয়ের কথা বলছেন। পাবলিক আরও এক্সাইটেড হয়ে পড়লে শেষ পর্যন্ত খারাপ কিছু একটা না হয়ে যায়।'

রোশনের খুব ক্লান্ত লাগছিল, খিদেও পাচ্ছিল। চারপাশে তাকিয়ে আশাপুরের কেমন একটা ঘোর লাগছিল ওর। প্রথম দিন আশাপুরে আসার পর থেকে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো সিনেমার মতো পরপর ভেসে উঠছিল ওর মনের পরদায়।

ও ডাক্তারবাবুকে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আমার ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। আপনারা এই জানোয়ারটাকে নিয়ে কী করবেন করুন। আমি যাই...।'

রোশনের কথাতেই ক্লান্তি ছিল। ডাক্তারবাবুরা সেটা বুঝতে পারলেন।

মাস্টারমশাই ওকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যাও—ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও...।'

রোশন স্টেজ থেকে নেমে হাঁটা দিল। দু-তিনজন ভলান্টিয়ার ওর কাছে দৌড়ে এল। উতলা হয়ে জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার? রোশনদা চলে যাচ্ছে কেন? রোশন বলল যে, ওর খুব ক্লান্ত লাগছে। একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করছে।

আহত নিতুদার কথা ভাবতে-ভাবতে রোশন পিচ-রাস্তায় উঠে এল। মাইকে তখন 'ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল' বাজছে।

রোশন চলে যাওয়ার পর সিনিয়াররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন। পলানকে নিয়ে এখন কী করা যায়?

বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ওঁরা ঠিক করলেন, পলানকে এবার পুলিশের হাতে হ্যান্ডওভার করা যেতে পারে। কারণ, এখানে বেশিক্ষণ এইরকম চলতে থাকলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হয়তো মব লিঞ্চিং-এর দিকেই যাবে।

মাঠে উত্তেজিত পাবলিক তখন রীতিমতো হইহই করছে। পলানকে চড়-থাপ্পড় মারার জন্য বেশ কয়েকজন লোক পলানকে ঘিরে হুড়োহুড়ি করছে।

মাইকের গান থামাতে বললেন ডাক্তারবাবু। তারপর মাইকে বললেন, 'একটি বিশেষ ঘোষণা! একটি বিশেষ ঘোষণা!'

জনতার হইচই অনেকটা কমে গেল। সবাই স্টেজে মাইকের সামনে দাঁড়ানো ডাক্তার সুধীর পাঠকের দিকে তাকাল।

'পলান নস্করকে এবারে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দেব। আমরা ওকে আপাতত যতটুকু শাস্তি দেওয়ার দিয়েছি। এবার পুলিশ পুলিশের কাজ করুক। তারপর আবার আসবে আমাদের পালা।'

ডাক্তারবাবু মাইকের কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে চাপা গলায় কীসব আলোচনা করলেন। তারপর আবার ফিরে এলেন মাইকের কাছে।

'বন্ধুগণ, একটু মন দিয়ে শুনবেন। প্লিজ, একটু মন দিয়ে শুনুন—' একটু থামলেন ডাক্তারবাবু। তারপর : 'আমরা এই পাঁচ-ছ'জন সিনিয়ার মানুষ আলোচনা করে একটা প্রস্তাব আপনাদের সামনে রাখছি। যদি আপনারা সবাই সমর্থন করেন তা হলে সেই প্রস্তাবটাকে আমরা বাস্তবে রূপায়িত করব...' আবার থামলেন সুধীরডাক্তার। এপাশ-ওপাশ মুখ ঘুরিয়ে একবার সবার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর জোরালো গলায় বললেন, 'পলান নস্করকে আমরা আশাপুরে আর ঠাঁই দেব না। আমাদের আশাপুরকে আমরা শান্তিপূর্ণ রাখব। এখানে পলান নস্করের মতো খুনি, গুন্ডা, বদমাইশের কোনও জায়গা নেই।'

মাঠের জনতা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, 'জায়গা নেই! জায়গা নেই!'

'শুধু পলান নস্কর নয়—ওর দলের যত গুন্ডা, শাগরেদ, তাদেরও আমরা আর আশাপুরে জায়গা দেব না। আমরা, আশাপুরের আমরা সবাই, ওদের আশাপুর থেকে তাড়িয়ে দেব—।'

জনতার চিৎকার শোনা গেল, 'তাড়িয়ে দেব! তাড়িয়ে দেব!'

'আমরা সবাই মিলে আশাপুরে ''শান্তি কমিটি'' গড়ে তুলব। এখানে কোনওরকম অশান্তি আমরা হতে দেব না—।'

মাস্টারমশাই তখন আশাপুরের পুলিশ ফাঁড়িতে ফোন করছিলেন। কয়েকবার রিং বাজতেই সাব-ইনস্পেকটর সুরেন দাস ফোন তুললেন।

'হ্যালো, সাব-ইনস্পেকটর দাস বলছি—।'



অবনীমাস্টার সংক্ষেপে ওঁকে ঘটনা জানালেন। বললেন যে, এক্ষুনি এসে পলানকে অ্যারেস্ট করে হেফাজতে না নিলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। তিনি যেন ইমার্জেন্সি বেসিসে থানা থেকে লোকজন নিয়ে এসে পলান নস্করের দায়িত্ব নেন। এক্ষুনি।

ডাক্তারবাবু তখনও মাইকে শান্তি কমিটির কথা বলছিলেন। শান্তি কমিটির কাজ কী-কী হবে তার একটা আভাস দিচ্ছিলেন।

এই শান্তি কমিটি নিয়ে ডাক্তারবাবুরা নিজেদের মধ্যে আগে বহুবার আলোচনা করেছেন। সে-আলোচনায় রোশন তো ছিলই, তা ছাড়া আশাপুরের কয়েকটা ক্লাবের চার-পাঁচজন করে তরুণ সদস্যও হাজির ছিল। সেই আলোচনার সময় তরুণরা বলেছিল, পলান নস্করের কোনও অত্যাচারই ওরা আর মুখ বুজে সহ্য করবে না। পলান কিংবা ওর ছেলেপিলেরা যদি আশাপুরের কারও গায়ে হাত তোলে তা হলে খবরটা পাওয়ামাত্রই ওরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে। হাতের কাছে যে যা পাবে— লাঠি, রড, ক্রিকেট ব্যাট, হকিস্টিক—তাই নিয়ে পলানের ছেলেদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মার দিলে পালটা মার খেতে হবে ওদের। মুখ বুজে পলানদের টরচার অনেকদিন সওয়া গেছে—আর নয়।

সিনিয়াররা ছোটদের অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, শান্ত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। ওদের একরোখা জঙ্গি জেদ শেষ পর্যন্ত জিতে গেছে। ওরা এখন সেই মুহূর্তটার অপেক্ষা করছে—পলান কিংবা ওর চ্যালারা আশাপুরের কোনও নিরীহ মানুষের ওপরে একবার টরচার করে দেখুক। ওরা এখন তৈরি। রোশনদা ওদের চোখ খুলে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবু তখন মাইকে বলছিলেন, 'আজ ঠিক বিকেল চারটেয় আমরা সবাই এই স্কুল-মাঠে আবার জড়ো হব। আপনারা সবাই আসবেন। এইখান থেকে আমাদের শান্তি মিছিল বেরোবে। একঘণ্টা ধরে আমরা আশাপুরের নানান পথ পরিক্রমা করব। পলানের মতো দুষ্কৃতীরা আমাদের শান্তি মিছিল দেখে সাবধান হয়ে যাবে। ওরা আমাদের শান্তি নষ্ট করতে আর সাহস পাবে না।

'আপনাদের কাছে আবার অনুরোধ করছি, আপনারা সবাই আজ বিকেল চারটেয় এই মাঠে এসে জড়ো হন। দলে-দলে আমাদের শান্তি মিছিলে যোগ দিন।'

ডাক্তারবাবু এবার একটা হাত শূন্যে তুলে চিৎকার করে বললেন, 'আমাদের শান্তি কমিটি জিন্দাবাদ!'

স্টেজ থেকে, মাঠ থেকে, অনেকের চিৎকার একসঙ্গে শোনা গেল : 'জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!'

'আশাপুর শান্তি কমিটি জিন্দাবাদ!'

'জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!'

রোশন তখন পায়ে-পায়ে 'আশাপুর লজ'-এর কাছাকাছি। বহুদূর থেকে ভেসে আসা শব্দগুলোর একটা চাপা সংস্করণ রোশনের কানে পৌঁছে যাচ্ছিল। সেই শব্দগুলোর প্রতিধ্বনি তুলল ও। বিড়বিড় করে বলল, 'আশাপুর জিন্দাবাদ...।'

এমন সময় হঠাৎ করেই বৃষ্টি শুরু হল। সকাল থেকে আকাশে মেঘ আর বিদ্যুৎ-চমকের সাজসজ্জা ছিল। এখন ঝিরঝির করে জলের রেখা নেমে এল। মনে হচ্ছিল, একটা প্রকাণ্ড মাপের ঝারি নিয়ে আকাশ থেকে কেউ শান্তির জল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে রোশন সেই অদৃশ্য ঝারির দিকে একবার তাকাল। ওর সারা শরীরে ব্যথা, কোথাও-কোথাও কেটে গিয়ে জ্বালা করছে। তারই মধ্যে 'জিন্দাবাদ!' ধ্বনি যেন তৃপ্তি আর আনন্দের প্রলেপ লাগিয়ে দিচ্ছে। আশাপুর জেগে উঠেছে—আর সহজে ঘুমোবে না।

খিদে পেলেও রোশনের আর খেতে ইচ্ছে করছিল না। আজকের পুণ্য দিনে উপোস করলে ক্ষতি কী!

ও পায়ে-পায়ে চলে এল 'আশাপুর লজ'-এর দরজায়। পুরোনো জীর্ণ দরজার পাল্লা দুটো ভেজানো রয়েছে।

দোতলার দিকে তাকাল। দুটো জানলা খোলা রয়েছে।

ওর মনটা কোনওরকমে ওর ঘরে পৌঁছতে চাইছিল...তারপর বিছানা আর বালিশ ওকে টানছিল।

লজের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। দেখল, বিশ্বরূপদা নেই। নিশ্চয়ই এখনও স্কুল-মাঠে রয়েছেন, 'স্বাধীনতা'-র উৎসবে মেতে আছেন।

রোশন ধীরে-ধীরে পা ফেলে ওর দোতলার ঘরের দিকে এগোল।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই ফ্যান চালাল। তারপর ঘরের একমাত্র জানলাটা খুলে দিল। বাইরে মোলায়েম বৃষ্টি পড়ছে। স্কুল-মাঠ থেকে ভেসে আসছে মাইকের আওয়াজ।

জানলার কাছ থেকে সরে এল রোশন। কোনওরকমে জামা-জুতো ছেড়ে মেঝেতে রাখা জলের জগ থেকে ঢকঢক করে জল খেল। ঘরের কোণে গিয়ে হাতে অল্প জল ঢালল। তারপর সেই জল মুখে ছিটিয়ে ভেজা হাতের পাতা মুখের ওপরে বুলিয়ে নিল। আ—ঃ!

চোখ জ্বালা করছে, মাথার একটা পাশ দপদপ করছে। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল।

চোখ বুজতেই ও মা, বাবা আর কুশানকে দেখতে পেল। ওরা তিনজনে রোশনের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মা যেন কিছু একটা বলছে। ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না। মায়ের ঠোঁটের কোণে ছোট্ট হাসির ছোঁয়া।

মায়ের ঠোঁট নড়া দেখে কথাগুলো বুঝতে চাইল রোশন। কী বলছে মা? কপালে ভাঁজ ফেলে অবাক চোখে ও মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কখন যে চোখে ঘুম লেগে গেছে সেটা ও টেরই পেল না।

ওর ঘুম ভাঙল বাজ পড়ার শব্দে। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। আকাশে মেঘ আছে, তবে বৃষ্টি থেমে গেছে।

রোশন বিছানায় উঠে বসল। দু-চোখে হাত ঘষল। একটু আগে কি ও স্বপ্ন দেখছিল? কে যেন ডাকছে ওকে। বলছে, 'ওঠ! জেগে ওঠ! আশাপুর জেগে উঠেছে—!'

আবার তা হলে শুরু হোক পথ চলা।

রোশনের মনে হল, এবার পথ ওকে ডাকছে। বৃষ্টির ফোঁটা ওকে ডাকছে। আকাশের মেঘ ওকে ডাকছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রোশন। ওর কানে এল দূর থেকে ভেসে আসা কথাগুলো। অনেকের গলা একসঙ্গে একই ছন্দে ধ্বনিত হচ্ছে।

'আশাপুর জিন্দাবাদ!'

'জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!'

'সমাজবিরোধী দূর হঠো—!'

'দূর হঠো! দূর হঠো!'

'আশাপুর শান্তি কমিটি জিন্দাবাদ!'

'জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!'

বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়ির দিকে চোখ গেল রোশনের। সাড়ে চারটে। বোধহয় শান্তি কমিটি কোনও মিছিল বের করেছে।

চটপট তৈরি হয়ে নিল ও। জামা-জুতো পরে পিঠে তুলে নিল ব্যাকপ্যাক। এবার পথে নামতে হবে। পথেই হবে পথ চেনা।

রোশনের ভেতরে তৃপ্তির ছোট-ছোট তরঙ্গ ঢেউ তুলে খেলা করছিল। ও কেমন একটা ঘোরের মধ্যে সিঁড়ি নামতে লাগল।

সিমেন্ট চটা এবড়োখেবড়ো সিঁড়ির ধাপগুলোতে পা ফেলে নামার সময় ওর মনে হল 'ওদের' সঙ্গে রোশনের আর দেখা হবে না। ও খুব আলতো করে সিঁড়ির ধাপে পা ফেলতে লাগল। চাইল যে, এক কণা হলেও মায়ার ছোঁয়া 'ওরা' যেন টের পায়।

একতলায় এসে দেখল বিশ্বরূপ জোয়ারদার তখনও ফেরেনি। বোধহয় এখনও স্কুল-মাঠের ওখানে রয়েছেন, কিংবা হয়তো শান্তি মিছিলে পা মিলিয়েছেন।

রোশন পকেটে হাত ঢোকাল। একটা ছোট সাদা খাম বের করে নিল। তার মুখটা আঠা দিয়ে সাঁটা। এর ভেতরে কিছু টাকা রয়েছে—বিশ্বরূপদার লজের পনেরো দিনের ভাড়া।

একজন বোর্ডার বেঞ্চিতে বসে সকালের বাসী খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলেন। তাঁকে লক্ষ করে রোশন বলল, 'বিশ্বরূপদার টেবিলের ড্রয়ারে এই খামটা রাখলাম। উনি ফিরলে একটু বলে দেবেন?'

বোর্ডার ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বোঝালেন, হ্যাঁ, তিনি বলে দেবেন।

রোশন বিশ্বরূপদার টেবিলের কাছে গেল, ড্রয়ার খুলে খামটা রেখে দিল।

তারপর ওর চোখ গেল দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দেওয়া সাইকেলটার দিকে। বাবুনদার কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া সাইকেল। ওটার এ মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স দেওয়া আছে—শুধু সাইকেলটাই যা ফেরত দিতে হবে।

সাইকেলটার কাছে গিয়ে পকেট থেকে চাবি বের করল। লক খুলে ওটা নিয়ে সোজা 'আশাপুর লজ'-এর বাইরে। গত পাঁচ-ছ' মাস ধরে চালিয়ে-চালিয়ে এই মেশিনটার ওপরে কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। ওটার কলকবজার সঙ্গে রোশনের বেশ ভালোরকম পরিচয় হয়ে গেছে। কিন্তু উপায় নেই। একদিন না একদিন পান্থজনকে পা বাড়াতেই হয়।

বাবুনদার দোকানে সাইকেল জমা করে দিল রোশন। বাবুনদা দোকানে ছিলেন না। ভালোই হল। তিনি থাকলে হয়তো রোশনকে অনেক প্রশ্ন করতেন, বিব্রত করতেন।

দোকানের একটি ছেলে—রোশনের মুখ-চেনা—সাইকেলটা রোশনের কাছ থেকে জমা নিল। টাকা যে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করা আছে, সেটা ছেলেটা জানত।

ও শুধু জিগ্যেস করল, 'দাদা, আর লাগবে না?'

'না—।' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল রোশন, এবং বাবুনদার দোকান ছেড়ে হাঁটা দিল। ওর চোখ জ্বালা করছিল।

ও এখন আশাপুরকে দেখতে-দেখতে এলোমেলো হেঁটে হাইরোডের দিকে যাবে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে গেছে—কোথাও-কোথাও সরে গেছে। সেই ফাঁক দিয়ে নীলচে আকাশ দেখা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, শরৎ আর বেশি দূরে নেই।

রাস্তা বৃষ্টির জলে ভেজা। কোথাও-কোথাও রাস্তার গর্তে জল জমে রয়েছে। তারই পাশ দিয়ে, ওপর দিয়ে, গাড়ি, মোটরবাইক, সাইকেল রিকশা ছুটে চলেছে।

কোথাও-কোথাও রাস্তার পাশে ছোট-বড় গাছ। বৃষ্টির জলে ধুয়ে তাদের পাতাগুলো চকচকে সবুজ। মাথা তুলতেই চোখ পড়ছে ওভারহেড লাইন। সেই তারে বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে দুটো ভিজে কাক।

রোশন সবকিছু দেখছিল, অন্তর থেকে শুষে নিচ্ছিল। আর পথহারানো এক টুরিস্টের মতো আশাপুরের রাস্তায় হাঁটছিল। আশাপুরকে নতুন চোখে দেখছিল।

এটা ওর চোখে পড়ল যে, রাস্তার পাশে জায়গায়-জায়গায় মানুষের জটলা। তারা বেশ আগ্রহ নিয়ে উত্তেজিতভাবে কীসব যেন আলোচনা করছে।

কী নিয়ে আলোচনা চলছে সেটা রোশন বেশ ভালোই আন্দাজ করতে পারল।

ভিজে রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে ও একসময় চলে এল বিবেকানন্দের মূর্তির কাছে। বুড়িমাসি লোহার রেলিং-এর গায়ে লেপটে বসে আছে। সামনে পেতে রাখা ময়লা কাঁথাটা বৃষ্টির জলে ভেজা। বুড়িমাসির গায়ের শাড়িটাও।

বুড়িমাসি ইনিয়েবিনিয়ে গাইছে :

*'আমার জীবন গেল, জনম গেল*
*শান্তি পাইলাম না।*
*শান্তির তরে ভ্রান্তি নিয়ে হলেম খ্যাপা—*
*তবু মন শান্তি পাইল না।'*



আকাশে শেষ বিকেলের আলো ফুটেছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে।

রোশন আস্তে-আস্তে পা ফেলে বুড়িমাসির কাছে গেল। পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে বুড়িমাসির কাঁথার ওপরে ফেলল। বুড়িমাসি সেটা টেরও পেল না। আপন খেয়ালে গান গেয়ে চলল।

রোশন চুপচাপ সরে এল। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল।

হাঁটতে-হাঁটতে একসময় ফাঁকা জায়গায় চলে এল। রাস্তার দু-পাশে গাছপালা, চাষের খেত, ছোট-বড় পুকুর। অনেকটা দূরে হাইরোড চোখে পড়ছে। একটা সবুজ রঙের বাস ছুটে গেল হাইরোড দিয়ে।

রোশন সামনের দিকে তাকিয়ে যত হাঁটছিল আশাপুর ততই পিছনে সরে যাচ্ছিল।

যদি কাউকে ভালোবেসে কেউ গভীর মায়ায় জড়িয়ে পড়ে, তা হলে সেই সময়ে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে তারা একে অপরকে সারাজীবন ভুলতে পারে না। রোশন আর আশাপুরের ব্যাপারটাও বোধহয় তাই।

দূরে, হাইরোডের ওপারে, লাল সূর্যকে দেখতে পেল। অস্ত যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে। কিন্তু রোশনের হঠাৎ মনে হল, ওটা সূর্যাস্ত নয়—সূর্যোদয়। সেই 'সূর্যোদয়'-এর দিকে এগিয়ে চলল ও।

হঠাৎই দুটো কচি গলার চিৎকারে চমকে উঠল।

'আশাপুর জিন্দাবাদ! আশাপুর জিন্দাবাদ!'

মুখ ফিরিয়ে তাকাল রোশন।

বাঁ-দিকে, বেশ খানিকটা দূরে, দুটো সবুজ খেতের মাঝের সরু পথ ধরে ছুটে চলেছে দুটো বাচ্চা ছেলে। ওদের হাতে একটা করে ছোট ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। সরু কাঠির মাথায় আঠা দিয়ে লাগানো কাগজের রঙিন পতাকা। যে-পতাকা স্কুল-মাঠের প্রোগ্রামে রোশনরা বিলি করেছে।

হাসিখুশি মুখে ওরা ছুটছে আর কচি গলায় জিগির তুলছে। ওদের পতাকা হাওয়ায় উড়ছে।

রোশনের বুকটা ভরে গেল। বাচ্চা দুটোকে দেখতে-দেখতে ও হাই রোডে উঠে এল। একবার তাকাল লাল সূর্যের দিকে। তারপর হাইরোড বরাবর তাকাতেই দূরে একটা বাস দেখতে পেল।

এই বাসটা এলেই রোশন উঠে পড়বে। তা সে-বাসটা যেদিকেই যাক না কেন। পিছনে পড়ে থাকবেন চায়ের দোকানের যোগেনদা, সুধীরডাক্তারবাবু, অবনীমাস্টারমশাই, চিন্তামণি মাঝি, কিশোরীমোহন সামন্ত, বুড়িমাসি—আরও অনেকে। পড়ে থাকবে বিবেকানন্দের মূর্তি, জগন্ময়ীর কালীমন্দির, স্কুল-মাঠ—আরও অনেক কিছু।

আর পড়ে থাকবে আশাপুর।

রোশন বাসটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

